নিবেদিত নিবেদিতা

ডঃ দীপক চন্দ্র

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :

সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৫৮,

মুদ্রক :

স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

রূপা শেঠ

প্রীতিভাজনেষু —

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায় ১/২
বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
যদি রাধা না হ'তো
কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন
লঙ্কেশ রাবণ
জননী কৈকেয়ী
রামের অজ্ঞাতবাস
কাশ্যপেয়
মহাবিশ্বে মধুকৈটভ
তোমারই নাম কর্ণ
পিতামহ ভীষ্ম
রাজা রাম
এবং অশ্বত্থামা
সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী
কৃষ্ণস্তু ভগবান,
উর্বশী জননী
দুষ্মন্তের আংটি
মহাভারতের শকুনি
আমি তোমাদেরই সীতা
দ্রৌপদী চিরন্তনী
কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ
দ্বৈপায়নে দুর্যোধন
মন বৃন্দাবন
সম্রাজ্ঞী কুন্তী
উপেক্ষিতা শূর্পনখা
শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম্
বিভীষণ
অচেনা ভরত
নিবেদিত মার্গারেট

গল্পের বই

গল্পের দুপুর
অমৃতকুম্ভ
যোজনগন্ধা সত্যবতী
পৌরাণিক প্রেমকথা

সমালোচনা

বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা
মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

সম্পাদনা

হরিবংশ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণ
মনোজ বসুর রচনাবলী (৪ খণ্ড)
মনোজ বসুর কবিতা

দৃষ্টিকোণ

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের ভারত আগমনের শতবর্ষ পূর্ণ হল ১৯৯৮-তে। তাঁর ঐতিহাসিক পদার্পণের শুভক্ষণটি স্মরণীয় করে রাখার ইচ্ছেয় শত বছরের সূচনায় আয়ার্ল্যান্ড দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর উদ্দেশ্যেই তাঁর সমস্যাসঙ্কুল সংঘাতমুখর জীবনকাহিনী নিয়ে ফিকশনধর্মী জীবনী-উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলাম। মার্গারেট যে দেশকালের মধ্যে বড় হয়েছেন, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে একজন মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চারপাশের মানুষ, ঘটনা, আত্মীয়, বন্ধু ও পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করতে হয়। সেই জীবনবৃত্তান্ত এই উপন্যাসকে ফিকশনধর্মী করে তুলেছে। এটা সাধারণ জীবনীগ্রন্থ নয়, লড়াকু মানুষের উপন্যাসধর্মী জীবনবৃত্তান্ত।

বলাবাহুল্য, গত বছর ২৮শে জানুয়ারিতে প্রথম পর্ব ''নিবেদিত মার্গারেট'' প্রকাশিত হয়। শতবর্ষের শুভারম্ভের দিনেই মার্গারেটের ভারত আগমনকে অভিনন্দিত করি 'নিবেদিত মার্গারেট' দিয়ে। তাঁর আগমনের শততম বৎসর পূর্ণ হল এই বছরে। সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পর্ব 'নিবেদিত নিবেদিতা' প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল ১৮৯৮-এর জানুয়ারি থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত। ভারতের উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য যে-দিন লন্ডনের টিলবারি ডক থেকে মোম্বাসা জাহাজে উঠলেন সে'দিন থেকে বেলুড়ে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হওয়ার দিন পর্যন্ত মোট ৮৪ দিনের ঘটনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এটি কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়। জীবনের গল্প। জীবনের ধারাবাহিকতা আছে, কিন্তু সন-তারিখ মিলিয়ে নয়। জীবনের ফিকশন সৃষ্টি করতে যখন যেমন দরকার হয়েছে সেইভাবে আগে-পরে করে নিতে হয়েছে।

মার্গারেট ইংলন্ড থেকে এলেন আর নিবেদিতা হয়ে গেলেন, মোটেই তা নয়। তবে তিনি *নিবেদিত* হয়েছিলেন। প্রথম পর্বে নিবেদিত জীবনের ঘটনা। অর্থাৎ *নিবেদিতা* হওয়ার আগের জীবন। ইংলন্ডে বিবেকানন্দের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে ভারতে এসেছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে মার্গারেটের ভারত আগমনের বৃত্তান্ত।

বিবেকানন্দের সান্নিধ্য ও সাহচর্য এবং তাঁর পাশে থেকে নিজের কর্মক্ষেত্র গড়ে নেওয়ার বাসনা নিয়ে কার্যত মার্গারেট ভারতে এলেন। এর মধ্যে ছিল মার্গারেটের সুগভীর প্রেম। সেই অয়ন পথটি জেনে-বুঝেই বিবেকানন্দ সপ্রেমে তাকে ভারতের

কাজের জন্য আহ্বান করেছিলেন। তাঁর আহ্বানের ভেতর মুক্ত দৃপ্ত মহাপ্রেমের হাতছানি ছিল। প্রেমপ্রদীপ্ত মহাজীবনের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে মার্গারেট ভারতে রওনা হয়েছিলেন বললে ভুল বলা হবে না।

দ্বিতীয়পর্বে "নিবেদিত নিবেদিতা"-য় আত্মানুসন্ধানের পথ ধরেই মার্গারেট ভারতে এলেন। তার মূলে ছিল এক অব্যক্ত প্রেম।" স্বামীজির বুকেও ছিল তার ফল্গুধারা। পাছে ফোয়ারার মত ফিন্‌কি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে তাই এক কঠোর সংযমের ঘেরাটোপের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। সেখানে মার্গারেটের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ভালোবাসার জোরেই সুদূর ইংলন্ড থেকে মার্গারেটকে ডাকতে পেরেছিলেন। মার্গারেটের মধ্যেও ছিল ভালোবাসার জোর। সেই জোরেই অন্য বিদেশিনীদের থেকে তিনি ছিলেন আলাদা। মার্গারেট নিজের পথ নিজে তৈরি করেছেন। কোনো বাধা মানেননি তিনি। বোধ হয় মার্গারেটের জীবনদেবতাই মার্গারেটকে তাঁর অভিলষিত পথে নিজের মত করে টেনে নিয়ে গেছেন। মার্গারেট যা করেছে বিবেকানন্দের মন পাওয়ার জন্য করেছে। তাঁকে জয় করাই ছিল মার্গারেটের লক্ষ্য। তাই বোধ হয় বিবেকানন্দ নিজেকে তার কাছ থেকে সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখতেন। মার্গারেট ছিল তাঁর ভয় ও দুর্ভাবনা। এক ধরনের বিরূপতা, বিতৃষ্ণা তাঁর আচরণে প্রকাশ পেত। নিজেকেই কষ্ট দিতেন। সেই ভয়ংকর কষ্টের কোনো দোসর ছিল না তাঁর। মার্গারেটেরও এক অশান্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটত। তাঁদের উভয়ের সব দ্বন্দ্ব ছিল নিজের সঙ্গে নিজের। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূত্র ধরেই মার্গারেটের ভারত-অন্বেষা এবং জীবন অন্বেষণ। বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজের অগোচরে মার্গারেট একটু একটু করে নিবেদিতা হয়ে উঠেছিল। মনেপ্রাণে সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং একজন যথার্থ হিন্দু না হওয়া পর্যন্ত স্বামীজি অপেক্ষা করেছেন। স্বামীজি জানতেন মার্গারেট যত উপেক্ষা ঔদাসীন্য অবহেলা পাবে ততই তাঁর মনের মত হয়ে ওঠার জন্য এবং তাঁকে জয় করার উন্মাদনায় নিজেকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এক অন্য মানবীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে, ত্যাগ স্বীকার করে তবেই নিবেদিতপ্রাণ মিস্ নোবলের উত্তরণ হল নিবেদিতায়। তার মধ্যে প্রেমের আনন্দ ছিল মার্গারেটের। পবিত্র প্রেমকে মার্গারেট গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করেছে অর্ঘ্যরূপে। প্রেম হল প্রাণের পূর্ণ এবং সুস্থ প্রকাশ। প্রকাশ উদ্বেল জীবনীশক্তির। প্রেমই র্মাগারেটের ব্যক্তিত্বকে এক নতুনমাত্রা দিয়েছে। সেই মুক্তদৃপ্ত মহাপ্রেমের অঙ্গীকারই মার্গারেটকে নিবেদিতায় রূপান্তরিত করল।

বিবেকানন্দ এবং মার্গারেটের না-বলা প্রেমের অভিব্যক্তির নবনির্মাণ এই গ্রন্থের মূল্যবান প্রাপ্তি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, মানুষের যা কিছু ত্যাগ এবং নিবেদন তা তার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার জন্য। একেকজনের ভালোবাসা মানুষের প্রতি একেকরকম শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় এবং ভক্তিতে মহিমময় হয়ে ওঠে। প্রেম ছাড়া তা কখনই হতে পারে না। বোধ হয়, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মত ব্যক্তিরাই পারে এমন শান্ত, স্নিগ্ধ ভালোবাসতে। এই প্রেমে দাহ নেই কোনো, নিবেদনে শান্তি ও সুখ আছে। আছে বিশ্বস্ততা। সেই আরাত্রিক পবিত্র অপার্থিব প্রেমের তীব্র ভালোবাসা তাদের পরস্পরের প্রতি অনুগত ও বাধ্য রেখেছিল। এই প্রেমের কোনো ছবি গাঢ় রঙে আঁকা নেই কোথাও। আমার বইতে কল্পনার রঙে সে-ছবি আঁকা হলেও প্রকৃত ঘটনা সত্যকে কোথাও অতিক্রম করার চেষ্টা নেই। বরং বলা যায়, জীবনীকারদের বর্ণনাগুলি রেখা ও রঙের ব্যবহারে যেরূপ হতে পারত তারই সম্ভাব্য সাদা-কালো, রঙিন ছবি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তুলবে। সংলাপে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যকে ব্যবহার করেছি। গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকাদের দ্বারা সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

শুভায় ভবতু

কলকাতা ৭০০ ০৩০

ড. দীপক চন্দ্র

এক
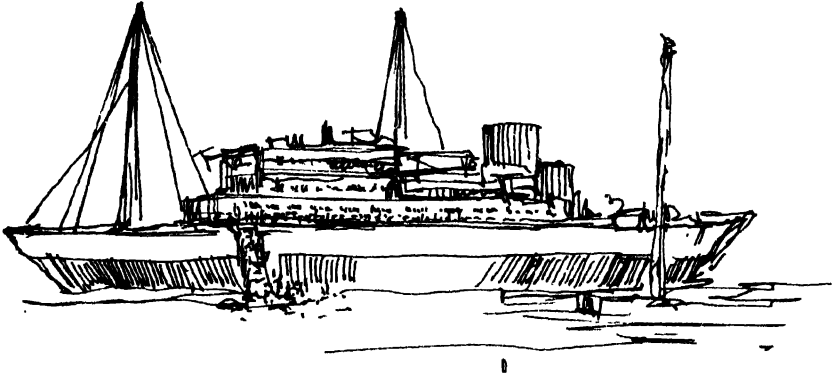
টিলবারি ডকে যখন ওরা পৌঁছল, বৃষ্টি থেমে গেছে তখন। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নীলের চিহ্নমাত্র নেই। মহিষকালো দিগন্তের নিচে বিশাল পর্বতমালার মত সমুদ্রের উত্তুঙ্গ নীল তরঙ্গরাশি যেন স্থির হয়ে আছে। ঢেউয়ের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কুয়াশার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা তরঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে রজতশুভ্র ফেনপুঞ্জরেখা সমুদ্রের কণ্ঠহার হয়ে ঢেউয়ের দোলায় দুলছিল। আর তাতেই সমুদ্র রূপসী হয়ে উঠল। ভীষণ ভাল লাগছিল তাকে। নির্নিমেষ চোখে সেই দিকে চেয়েছিল মার্গারেট। ডাগর নীল চোখ দুটি নীল সাগরের বুকে ভাসিয়ে দিয়ে সে সাগর দেখছিল।

টিলাবারি ডকে মার্গারেটকে বিদায় জানাতে এসেছিল মা ইসাবেল, ভগিনী মেরি নোবল এবং ভাই রিচার্ড, শিল্পীবন্ধু ও সহকর্মী এবেনজার কুক এবং শুভানুধ্যায়ী বন্ধু অকটেভিয়াস বীটি। এদের কারো সঙ্গেই মার্গারেট কথা বলছিল না। সকলে নিজের নিজের বিচ্ছেদের বেদনায় স্তব্ধ এবং বিষণ্ণ। মাথার মধ্যে প্রত্যেকের একটা অদ্ভুত বোবাভাব। কেবল মার মনই ব্যাকুল হল। মেরীকে কোলের কাছে ডেকে নিয়ে মার্গারেটকে দেখিয়ে বলল, দ্যাখ, কী ভীষণ রূপান্তর ঘটে গেছে ওর মধ্যে। ও আর আমাদের নয়। আমাদের কোনো কথাই ভাবছে না। ওর মন পড়ে আছে ভারতে। একটা অজ্ঞাত দেশে যাচ্ছে, সেখানকার সম্পর্কে কিছু জানে না। তবু সেজন্য কোনো ভয় কিংবা উৎকণ্ঠা নেই ওর মনে। কেবল আমিই ভেবে মরছি।

মেরি মাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, এখন ওসব কথা ভেবে দুঃখ করে

লাভ নেই। যেখানে যাচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক অনুকূল কি না জানি না। কিন্তু অবস্থা যেমনই হোক, ভাগ্যে যাই থাকুক ও সবার চোখে বড় হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি।

ওদের আর কোনো কথা হল না। বোধ হয়, কথা বলার মত কারো মনের অবস্থা ছিল না। বিষণ্ণ চোখ দুটো দূরে বহুদূরে কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নীরব হয়ে রইল।

জাহাজে ওঠার ডাক পড়ল যাত্রীদের। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কিউতে দাঁড়ানোর জন্য মার্গারেট তার জিনিসপত্তর নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মিসেস নোবল বুকের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত রাখল। বলল : ভাল থাকিস মা। আমাদের ভুলে যাস্ না। খোঁজখবর করিস। পৌঁছে চিঠি দিবি। কথাগুলো বলতে বলতে তার চোখ ভরে জল নামল।

সেই মুহূর্তে মার্গারেটের শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। মা'র চোখের জল মুছে দিয়ে একটু হাসল। বিষণ্ণ হাসি। বলল : আমার মনটা দুর্বল করে দিও না। তোমার মত ক'জন মা পারে, নিজের সন্তানকে অন্য দেশের কল্যাণের জন্য বিলিয়ে দিতে! তোমার ত্যাগের আলো পড়ে আমার মনটাও বড় ত্যাগের জন্য তৈরি হয়েছে। আমার সব জোর তোমার কাছ থেকে পাওয়া। তুমি যে আমার জীবনের কতদিক কতভাবে ভরিয়ে তুলেছ তুমি জান না।

মেরীর মুখের ওপর মুখখানা রেখে মার্গারেট বলল : ভারতবর্ষ আমাকে ডাকছে। আরো তো বিদেশিনী আছে তাদের কাউকে নয়, আমাকেই ভারতের কাজে প্রয়োজন। ভারতের সন্ন্যাসীর এত বড় প্রত্যয়টা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এত বড় কাজের অধিকার পেয়ে যদি নিজেকে উৎসর্গ করতে না পারি, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন? চলি বোন, মন খারাপ করিস না। রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল : তুই তো ছেলে, কাতরতা মানায় না তোকে। মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাতে হয় ছেলেদের। বাই। তারপর, এবেনজার কুকের হাত ধরে বলল : মেরি আর আপনি মিলে স্কুলটা বাঁচিয়ে রাখবেন। ওর মধ্যেই মার্গারেটকে কাছে পাবেন সর্বক্ষণ।

এবেনজার ওর নরম মসৃণ হাতের পাতায় আলতো চুম্বন দিয়ে বলল : তাই হবে।

বীটির দিকে তাকিয়ে মোহমাখা হাসি হাসল। শুধু বলল : বাই-- সকলের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিল মার্গারেট। ডেকে ওঠার খাড়াই সিঁড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক উন্মাদ আনন্দের ঢেউয়ে তার বুক তোলপাড় করে উঠল। ভারতে যাওয়ার স্বপ্ন সত্য হল অবশেষে। বাধা খুব একটা ছিল না, কিন্তু সমস্যা ছিল অনেক। এক আশ্চর্য দৈববলে তাও দূর হল। সবচেয়ে বড় বন্ধন ছিল মায়ের অনুমতি। মার্গারেটেরও ভয় ছিল, শেষ পর্যন্ত ঐ অনুমতির অভাবেই আটকে যাবে তার ভারতযাত্রা। কিন্তু কী আশ্চর্য! ভারতের ডাক যখন সত্যি এল, কত সহজে তাকে মেনে নিল ইসাবেল। এজন্য জননীর মন সিক্ত করার জন্য কিছু করতে হয়নি তাকে।

ভারতের সন্ন্যাসীর কথাগুলো সে শুধু পড়ে শোনাল-- মার্গারেট তুমি এস। তোমার মত নারীর, তোমার মত কন্যার প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের কত গভীর তা আমি ভাষায় প্রমাণ করতে পারব না। স্বামীজির প্রত্যয়ভরা বিশ্বাসের মধ্যে এমন একটা গভীর আন্তরিকতা ছিল যে মা 'না' বলে তাকে নিরাশ করতে পারল না! যীশুর ছবির দিকে মুখ করে বলল : প্রভু সবই তুমি স্থির করে রেখেছ। তা-হলে, আমার অনুমতি নেয়ার খেলা করছ কেন? এই যদি তোমার ইচ্ছে হয় তবে আমি বাধা দেবার কে? তোমার পায়ে ওকে সঁপে দিলাম। তুমি ওর দেখভাল কর।

সিঁড়ি ভেঙে ডেকে ওঠার সময় বারংবার মনে হচ্ছিল ; সে অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। ভারতের সন্ন্যাসী তার মধ্যে এমন কি খুঁজে পেল যে অনন্ত দাবি আর প্রত্যাশা নিয়ে মন উজাড় করে লিখল-- মার্গারেট তুমি এস। তোমার মত নারীর প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের কত গভীর তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব। অমনি একটা উপচানো আনন্দে ও অসহনীয় সুখে তাকে ভেতরটা টইটম্বুর হয়ে গেল। যাবেই বা না কেন? এমন গভীর ভালবাসা, বিশ্বাস আর প্রত্যয় নিয়ে কোনো পুরুষ যখন নারীকে ডাকে তখন ঘরের পলকা বন্ধনগুলো তার শিথিল হয়ে যায়। মনের মানুষের টানই বড় হয়ে ওঠে তার কাছে। তাকে অদেয় থাকে না কিছু। এরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে সে একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল মার্গারেট। মাথার ওপর মুক্ত আকাশ আর দিগন্ত জুড়ে শুধু জল আর জল। জলের বুকে যে ঢেউয়ের আলোড়ন চলেছে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মার্গারেট তা টের পেল। মনের মধ্যে তারও ঢেউয়ের দোলা। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সে ঢেউ ছুটে এসে তার মনের তটভূমির ওপর আছড়ে পড়ল। চারদিক থেকে মুক্ত বাতাস হু-হু করে ছুটে আসছিল। লয় করে দিচ্ছিল তার সত্তা। বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ লক্ষ লক্ষ শঙ্খের কলরোল হয়ে বাজছিল তার কানে। ভাবতে ভাল লাগছিল, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে একজন মানুষ উন্মুখ হয়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। আকুল প্রতীক্ষায় তাঁর দিন কাটছে। পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে সে শুনতে পাচ্ছিল রাজার কণ্ঠস্বর। মার্গারেট, আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব। পুরুষের জবানের নড়বড় হয় না। মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। রাজার সহযোগিনী হওয়ার স্বপ্নটা তাহলে সত্যি হতে চলেছে। কল্পনায় দেখল ভুবনমোহন রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে রাজা আসবে তাকে নিতে। শুধু কোলকাতা বন্দরে গিয়ে পৌঁছনোর অপেক্ষা।

বেশ কয়েকবার ভোঁ দিয়ে জাহাজটা চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখ থেকে বন্দরের চিহ্ন মুছে গেল। ইংলন্ডের তটরেখা ঢাকা পড়ে গেল কুয়াশার গর্ভে। দেখতে দেখতে নীল সমুদ্রের বুকে অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল। সব বাস্তবতা নিমজ্জিত হল এক রহস্যময় অন্ধকারে।

জাহাজ যাত্রার অভিজ্ঞতা মার্গারেটের নতুন নয়। এর আগেও সে অনেকবার ছুটি কাটাতে জাহাজে করে লন্ডন থেকে আয়ার্ল্যান্ডে যেত। রাতটা জাহাজে কাটিয়ে পরের দিনই আয়ার্ল্যান্ডে পৌঁছে যেত। কিন্তু এবারের জাহাজ যাত্রা দু'একদিনের ব্যাপারে ছিল না। অনেকগুলো দিন একটানা জাহাজে কাটানোর পরে স্বপ্নের ভারতবর্ষের তটভূমির সাক্ষাৎ মিলবে। কমপক্ষে একমাস মোম্বাসা জাহাজই তার বাসস্থান। ভাসমান চলমান একটা বাসভূমি। কেবিন-ঘরটাই তার দুনিয়া। জানলা খুললেই সমুদ্র। যত পার সমুদ্র দেখ, সমুদ্রের সঙ্গে জমিয়ে ভাব কর। সমুদ্র ছাড়া দেখার কিছু নেই। সমুদ্রই একমাত্র জীবন্ত প্রাণ। কত ধরনের অচেনা ঢেউ প্রতিমুহূর্ত দিগন্তের বুক থেকে উঠে আসছে। আকাশপ্রমাণ ঢেউগুলো গতিময় রেলগাড়ির মত রে রে করে ছুটে আসছে মোম্বাসা জাহাজের দিকে। দৈত্যের শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন মনে হয় এই বুঝি জাহাজটা নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল। জলের দুনিয়ায় জাহাজের অনধিকার প্রবেশ মানঁল না সমুদ্র। তাই, ঢেউয়ের আক্রমণ অব্যাহত রইল। কখনো কখনো দু'একটা ঢেউ ডেকের ওপর লাফিয়ে উঠে প্লাবিত করল তাকে। মোম্বাসার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সাগরের সব অত্যাচার সহ্য করে ঢেউগুলো সে দাপিয়ে চলল। এভাবে চলবে কতদিন। সমুদ্রের ওপরেই দিন ফুরোবে, রাত্রি নামবে।

বিশাল বিশাল ঢেউয়ের দোলায় টালমাটাল হয়ে যাত্রীরা নাকাল হল। দুটো রাত ভালোয় ভালোয় কাটার পরেই মার্গারেট অসুস্থ হয়ে পড়ল। সব সময় গা বমি ভাব, মাথা ঘোরা, মুখে অরুচি তাকে বিছানা নিতে বাধ্য করল। চোখ খুললেই বন বন করে সব ঘোরে। একটা অর্ধচৈতন্য অবস্থার মধ্যে চোখ বুজে থাকে। মায়ের কথা খুব মনে হতে লাগল। মনে হল তার বুকের ভেতর দাঁড়িয়ে অনেক-অনেকদূর থেকে মা হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। নিজের অজান্তে দু'চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ে।

জাহাজে কোনো কাজ নেই। সারাক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকা। না হলে বই পড় অথবা সমুদ্র দেখ। আর নিজের মতো করে ভাবা একটু। নিজের সঙ্গে অনন্ত সময় ধরে কথা বলার এত বড় সুযোগ এর আগে আসেনি জীবনে। সময় কাটাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে হতে লাগল ; পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের কপালে সুখ লেখা থাকে না। সারা জীবন দুঃখ কষ্টকে তারা যেচে সেধে বরণ করে। কেন করে কে জানে? অথচ সব মানুষই সুখী মানুষ হতে চায়। টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি সবই ছিল পিতা স্যামুয়েলের। তবু মনে হল, মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠা হয়নি তাঁর। দুঃখ-যন্ত্রণার অনুভূতি না থাকলে মানুষ অন্যের জন্য কিছু করতে পারে না। কষ্ট না করলে, ত্যাগ না করলে যেমন গান গাইতে, কবিতা লিখতে পারে না তেমনি দুঃখ লাভ ব্যতীত ভগবানকে পাওয়া হয় না। শুধু সেজন্য আরাম, বিলাস, বৈভব ত্যাগ করে ঈশ্বরের দীন সেবকরূপেই জীবনযাপন করতে লাগলেন। আদর্শবিলাসী বাবাকে সার্থক করা, তাঁর ইচ্ছেকে পূরণ করা ছিল মায়ের একমাত্র আনন্দ। নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মদানে মা ছিল অন্য এক চরিত্রের মানুষ। তার মনের

রহস্যের নাগাল পায়নি সে কোনোদিন। অবশ্য, এসব কথা এমন গভীর করে ভাবার অবকাশ হয়নি জীবনে। আজ সেই অনাবিষ্কৃত মাকে মনের গভীরে সে এক নতুন উদ্যমে খুঁজতে লাগল। তার সব উদ্যম, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের সঙ্গে মা এত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে যে তাকে পৃথক করে বিচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। মায়ের স্বভাব ও চরিত্রের সঙ্গে তার অনেক জায়গায় মিল আছে। থাকাটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল।

মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে একটু রোদ তেরচাভাবে কেবিনের মেঝেতে পড়েছে। সমুদ্রের নোনাগন্ধ নিয়ে ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া ছোট কেবিনটায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। খোলা জানলা দিয়ে বোবার মত চেয়ে রইল মার্গারেট। জাহাজটা ভীষণ দুলছিল। বিদ্যুৎ চমকের মত একটা জিজ্ঞাসা তার মায়ের সমস্ত অপ্রাপ্তি এবং দাবিহীন জীবনের ওপর এক ঝলক আলো ফেলে উজ্জ্বল করে দিল। এই প্রথম অনুভব করল, প্রত্যেক নারীর আসল জায়গা বোধ হয় তার ঘর। সে শুধু ঘর সামলাবে, সন্তান মানুষ করবে, স্বামীর দেখাশুনা করবে আর পুরুষ তার স্বপ্নের নীড়কে ঠিক রাখতে বাইরে ঝড়-ঝাপটার সঙ্গে যুঝবে। সব দাম্পত্য সম্পর্ক বোধ হয় এরকমই হয়ে থাকে। স্ত্রী তাকে যত্ন করবে, তাকে না খাইয়ে নিজে খাবে না। দেরি করে ফিরলেও তার প্রতীক্ষায় থাকবে না খেয়ে; একসঙ্গে খাবে বলে। এজন্য বাবার বকুনি শুনত না। বলত, তোমাকে না খাইয়ে ভাল লাগে না আমার একা খেতে। ভাললাগা আর ভালবাসার এই মায়া মোহের বাঁশি বাজিয়ে মা তার ফুরিয়ে যাওয়া সংসারে এক নতুন প্রাণ দিয়েছিল।

মার্গারেট দেখেছিল, বাবার নিজের জায়গা বলতে তাঁর লেখার টেবিল, পড়াশুনার ঘর এবং চার্চের উপাসনাগৃহ, যেখানে থাকলে সবচেয়ে আনন্দে থাকতেন। তাঁর সেই চাওয়াকে পূর্ণ করতে মা নিজেকে নিবেদন করেছিল। ঘর সংসার, সুখ-আরাম-সাচ্ছল্যের বাসনা তাঁর কাজে বাধা হোক স্ত্রী হয়ে ইসাবেল তা চায়নি। যদিও সব মেয়ে চায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম বিলাসে জীবন কাটাতে। ইসাবেল বোধহয় নারীকুলে ব্যতিক্রম। স্বামীর আনন্দ ও সুখই তার সুখ। সে যা পেয়েছে সেটুকুতেই সন্তুষ্ট। দুঃখকে আনন্দ করার ভার তার হাতে।

মার্গারেট ছোট থেকে দেখেছে মা নিজের জন্য কিছু চায় না। কিন্তু কি ভালবাসা, কি ত্যাগ কি অজস্র সেবা দিয়ে বাবাকে ঘিরে রাখত। বাবার ব্যর্থ জীবনে কিছুমাত্র সাফল্যের দাবি যদি থাকে তার পিছনে মায়ের ত্যাগ নিশ্চয় অনেক। মায়ের জীবন অনেক বড় ত্যাগে সুন্দর। স্বার্থহীন দানে পূর্ণ।

অনেককাল আগের এক ঘটনা অকস্মাৎ মনে পড়ল। যক্ষারোগাক্রান্ত স্যামুয়েলের কাশিটা খুব বেড়েছে। কাশের সঙ্গে রক্ত মিশে আছে। কখনও কখনও দমকা কাশিতে নাভি থেকে বমি উঠে আসছে। রক্তবমি। দিন যে ফুরিয়ে আসছে সেটা সবাই বুঝতে পারছে। জীবনের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা শুধু। স্যামুয়েল তখন মৃত্যুর

কজ্জায়। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। ঘর-সংসার সব মিছে হয়ে গেছে মায়ের কাছে। একদণ্ডের জন্য তাকে কাছ ছাড়া করছে না মা। সন্তানের মত সব সময় আগলে আছে। রাতের পর রাত জেগে কাটাচ্ছে মা। একটুও কষ্ট নেই, বিরক্তি নেই। মায়ের ত্যাগ ও সেবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বাবা ক্ষীণ গলায় আস্তে আস্তে বলত : উজাড় করে তুমি শুধু দিয়ে গেলে, নিলে না কিছুই। শুধু ঋণীই রয়ে গেলাম।

ইসাবেল তাকে বাধা দেওয়ার জন্য মৃদুস্বরে ধমকাল। বলল : চুপ কর। আমার কাছে তোমার ঋণ কিসের? এমন কথা বলবে না। দয়া করে একটু চুপ কর।

চুপ করে থাকতে পারছি কৈ? অপরাধবোধে আমার ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। মৃত্যুর আগে আমার ভুলের স্বীকারোক্তি করতে দাও। আমার জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে একেবারে যোগিনী সেজেছ। কী লাভ হল তাতে? সারাজীবন আমি শুধু তোমাকে কষ্ট দিলাম। এক অজ্ঞাত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে টেনে এনে তোমাকে ও তোমার ছেলেমেয়েদের জীবন বিপন্ন করলাম। সেদিন জেদ করে আয়ার্ল্যান্ডের চালু ব্যবসা যদি বেচে না দিতাম তাহলে এতবড় ক্ষতি তোমাদের হত না।

ইসাবেল চোখভরা জল নিয়ে অসহায়ভাবে তার বুকের ওপর ঝুঁকে বলল : ঐসব পুরনো কথার ভার বুকে চাপিয়ে মনকে আর্ত করে তুলছ কেন? তুমি তো কোনো ভুল করনি। স্বপ্নের নীড় তৈরি করে আনন্দের সংসারে সকলকে আনন্দে রাখতে চাওয়ার মধ্যে তোমার আন্তরিকতা ছিল। সংসারে তুমি কোনোদিন ফাঁকির বাঁশি বাজাওনি। তাহলে তোমার দুঃখ কিসে? এই মুহূর্তে তুমি যদি ভেঙেপড়, প্রতিকূল অবস্থার হাতে পরাজিত হও তাহলে মনে করব ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াইয়ে শয়তানের জিত্ হল।

ইসাবেল, এসব কথায় মন ভরে না। বরং, এক তীব্র অপরাধবোধের বৃশ্চিক জ্বালায় আমার ভেতরটা জ্বলতে থাকে। শুধুই মনে হয়, তুমি যদি একটু শক্ত হতে, আমাকে বাধা দিতে ভবিষ্যতের কথা বলে আপত্তি করতে তাহলে তোমাদের এই কষ্ট হত না।

কষ্ট ভাবলেই কষ্ট। সব সংসারেই অভাব আছে। আমি তো তোমাদের কোনো অভাবে রাখিনি। অভাব দারিদ্র্যের হাওয়া তোমার গায়ে লাগতে দিইনি।

নিজেকে এভাবে মানিয়ে নিলে কেন? বিদ্রোহ করলে তো পারতে? তোমার আত্মনিপীড়নের ক্ষমতা আমাকে তোমার কাছে ছোট করে দিয়েছে।

বোকা। আত্মপীড়নটা দেখলে কোথায়? একে যদি আত্মপীড়ন বল, তাহলে তোমার কাছেই শিখেছি। আমার রিচমন্ড আমার গুরু। আমার মনের সব জোর তার কাছে পেয়েছি।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার ভুলের প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজেকে তুমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছ।

পাগল। ছেলেমানুষ। কর না। এসব কথা বললে আমি কত কষ্ট পাই, জান। তোমার কষ্টটাই শুধু দেখছ, আমার দুঃখটা একটু বোঝ। আমি তোমার মানস প্রতিমা। আয়ার্ল্যান্ড থেকে যখন আমরা ইংলন্ডে এলাম, স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে বললে ইসাবেল, বিধাতার হাতে গড়া সবচেয়ে মহৎ যে জীব মানুষ, সে শুধু টাকা রোজগার করে, ভাল খাওয়া ভাল পরার কথা ভেবে ফুরিয়ে যাচ্ছে এই সংসারে। এ সংসারকে তার দেওয়ার যে অনেক আছে একথা ভাবতে ভুলে যাচ্ছে। বড় ত্যাগ, বড় দুঃখ বরণ ছাড়া বড় কিছু পাওয়া যায় না। জীবনতৃষ্ণার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছে। ঈশ্বরকে ডাকার সময় কৈ? এদের ওপর রাগ করা সাজে না, এদের জন্য শুধু করুণা হয়। বাইরের আনন্দ-স্ফূর্তি, সুখ ও আনন্দের হৈ-চৈ কোলাহলের মধ্যে জীবনের মাপা সময়টা কাটিয়ে দিতে এত ব্যস্ত যে, ভিতরের ডাক তাদের শোনা হয় না। ওদের কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয়। এই ভোগজর্জর, প্রেমহীন পৃথিবীতে কারো বুকে যদি প্রেম, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, দরদ, ভক্তি, শ্রদ্ধা থাকে তা শুধু মেয়েদের বুকেই আছে। কেবল তারাই পারে এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে। কিন্তু তারাও ভোগ-সুখের পিছনে দৌড়চ্ছে, ঐশ্বর্যের কাঙালপনা বাড়ছে তাদের। এদের কারো কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাশা করার কিছু নেই। পার্থিব চাওয়া চাইতে চাইতে তারাও সুন্দর প্রেমকে আবিল করে ফেলছে। বড় দুঃসময়ের মধ্যে আমরা বাস করছি। রিচমন্ড তোমার স্বপ্নের সেই মেয়ে এই বিশ্বে কোথাও আছে কি না জানি না। তবে, মেয়ে বলেই হয় তো ভাবি, আমিই সে। মেয়েমানুষকে তোমার মত করে কোনো পুরুষ আবিষ্কার করেনি। বিশ্বাস, ভালবাসা, শ্রদ্ধা দিয়ে মনের অভ্যন্তরে তাকে সৃষ্টি করতে হয়। স্রষ্টা রিচমন্ডেরা এ দুনিয়ায় খুব কম জন্মায়— বলতে বলতে তার সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল এক বিহ্বলতা।

স্যামুয়েল রিচমন্ড পরম মমতায় তার হাতখানা টেনে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। বলল: আপনাকে এই জানা আমার ফুরোবে না, এই জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

আড়াল থেকে মার্গারেট সব দেখছিল। হঠাৎই মার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। অমনি তাকে দু'হাতে টেনে নিয়ে রিচমন্ডের বিছানার পাশে একটা কাঠের টুলে জোর করে বসিয়ে দিল। বলল : নিজের কানে সব শুনেছিস। লুকোচুরি কিছু নেই। তোর বাবার সমস্যা আমি বা আমার সংসার নয়। মানুষের সংকট। লোকটা চিরদিন মানুষের ভাল চেয়েছে। মানুষ সুখী হোক, স্বার্থহীন দানে সুন্দর হোক, ধর্মে মহান হোক শুধু এই কামনা করেছে। যে মানুষ তার মহৎপ্রেম ও আনন্দ নিয়ে সুখ দুঃখ তুচ্ছ করে, তাপিত মানুষের কান্না হাহাকার, যন্ত্রণা, বেদনা, হৃদয় ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে মহৎ কিছু করায় সংকল্প করে তার ব্যর্থতা স্ত্রী হয়ে কী চাওয়া যায়? স্বার্থপরের মত যদি নিজের কথা ভাবতাম, সংবেদনের অভাবে ওর মনটা জীর্ণ হয়ে যেত। আমার দুর্বলতাকে ও যদি দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে সান্ত্বনা পায় তো পাক।

একুশ বছর আগে মায়ের মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর মনের মণিকোঠায় লুকোনো সেই

অনাস্বাদিত- বোধ তার বুকে এত বেশি কবে লুকোনো ছিল, জানা ছিল না। হঠাৎ করে সহস্র হাতে ছুবি মারল তার গোপন উৎসে। অমনি রক্তের মত ফিনকি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আর এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল মার্গারেট। কিছুক্ষণের জন্য এক অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা।

ক'দিন ধরে বিছানায় শুয়ে আছে মার্গারেট। আশ্চর্য এক একাকিত্বের মধ্যে সে অন্য কাউকে নয়, মাকেই খুঁজছিল। মার জন্য মনটা তার সত্যি ব্যাকুল হয়েছিল। সেই ব্যাকুলতাই যেন মা ও মেয়েব মধ্যে এক নতুন যোগসূত্র তৈরি করল। প্রতিদিন দেখাশোনার মধ্যে অনুভব কবা হয়নি মায়ের কত ধরনের কত প্রভাব এবং স্বভাব তার মন আলো করে আছে। মা'র অনেক কিছু সে পেয়েছে। জীবনের বেশ কিছু ঘটনার সঙ্গে একটা অদৃশ্য মিলও রয়ে গেছে। বাবার স্বপ্ন সফল করতে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই মা, আয়ার্ল্যান্ড থেকে ইংলন্ডে পাড়ি দিয়েছিল। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং কষ্ট ও সংগ্রামের জীবন বরণ করতে মা একটুও ভয় পায়নি। বাবাই ছিল মা'র জীবনেব ধ্রুবতারা। পথ হাবানো পথিককে চিরকাল পথ দেখায় ধ্রুবতারা। তাই কোনো সংশয় ছিল না মা'র মনে। মা'র সঙ্গে তার জীবনের এক আশ্চর্য মিল আছে। বাবাব মতই ভারতের সন্ন্যাসী তাব জীবনের ধ্রুবতারা। স্যামুয়েলের মতই তিনিও মানুষের ভাল চান। মানুষ ধর্মে উদার হোক, মনুষ্যত্বে সুন্দব হোক, স্বার্থহীন দানে মহান হোক, এই বাণী নিয়ে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে এসেছেন। তাঁর বুকে স্বদেশেব প্রতি কী গভীর অনুরাগ , দরদ, মমতা, আর ভালবাসা। ভারতের দুঃখী, দরিদ্র, হত লাঞ্ছিত মানুষেব দুর্দশা-- তাদের যন্ত্রণা, বেদনা, হতাশা, ব্যর্থতা আকুল কবে তাঁকে। স্যামুয়েলের মতই মানুষেব সেবায় তিনিও স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ, মানবসেবার মহান সংকল্প মার্গারেটের মনকে তার অজান্তে এবং নিঃশব্দে তাঁর দিকেই যে চুম্বকেব মত টানছিল এটা জানা ছিল না। কেবিনে রোগশয্যায় শুয়ে একথা উপলব্ধি করার এই প্রথম অবসর হল তার। ভারতের সন্ন্যাসীর মধ্যে সে খুঁজে পেল পিতার স্বপ্নের আকাশ। সে আকাশে ধ্রুবতারার মত জ্বল জ্বল করছে ভারতের সন্ন্যাসী। মনে হল, এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। কোথায় যেন একটা আশ্চর্য সূত্রে বাঁধা আছে তারা। তাই খুব অল্প পরিচয়ে অল্পদিনে দু'জন দু'জনকে চিনে নিতে পাবল। চেনার মধ্যে কোনো ভুল ছিল না বলে সন্ন্যাসী অকপটে তাকে কাছে ডাকতে পারল। আর মুক্ত মনে সেও সাড়া দিল। সন্ন্যাসীকে ঘিরে তার কত স্বপ্ন, কত কল্পনা। সেই সাধ পূরণ করতে সে চলেছে এক নতুন জীবন অভিসারে। এভাবে কথাটা মনে হওয়ার জন্য নিজের মনে হাসল সে। লাজুক অপ্রতিভ হাসি।

নিরুচ্চারে নিজের মনে মার্গারেট উচ্চারণ করল : হাঁ, অভিসার! অভিসার ছাড়া কি? কার সঙ্গে তার অভিসার? প্রশ্নের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করল পরান সখা বন্ধু হে আমার। তাই তো, অজানা দেশে একা যাওয়ার জন্য বুকে ভয়, কিংবা

মনে কোনো সংশয় নেই। রাজাই তার সাহস, তার প্রেরণা এবং শক্তি। রাজার জন্য সে সব করতে পারে। কোনো কষ্টই তার কষ্ট নয়। মমতা দিয়ে রাজা তার সব অভাব ভরে দেবে। রাজার সান্নিধ্যের সুখও সুখ। মার্গারেটের অবাক লাগে একদিন বিরূপতা দিয়ে যার সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল আজ সমস্ত মনটাই তার জন্য উদ্বেল হয়। মানুষের মনটা বড় অদ্ভুত। মনের মনটা বড় জটিল। তার অধোগতি ঊর্ধ্বগতি, তার বিবর্তন পরিবর্তন এমন নিঃশব্দে মনের অভ্যন্তরে ঘটে যে তার মালিকও টের পায় না।

শীতের বিষণ্ণ বিকেলে জাহাজটি ফুলে ওঠা বিশাল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ চালে ভেসে চলেছে। সমুদ্র উত্তাল নয়। সমুদ্রের মাঝ বরাবর অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা। মুগ্ধ বিভোর মার্গারেট সেই নিস্তব্ধতাকে অনুভব করে। মাঝে মাঝে সি-গাল এবং অন্য নাম না জানা পাখির ডাক ভেসে আসে। আর আছে শান্ত সমুদ্রের জলে মৃদুমন্দ শব্দ। যেন তা এই নিস্তব্ধতাকেই গভীর করে তোলে। শান্ত সুন্দর নীল আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে বসেই জীবনের অনেক গভীর রহস্যময়তাকে স্পর্শ করা যায়। জাহাজে শয্যাশায়ী না হলে বোধ হয় মনের ভিতরকার আসল সত্যিটুকু জানা হত না। অথচ, একেই সে বুকের গভীরে প্রতিনিয়ত খুঁজছিল। শান্ত সমুদ্র, নীল ও গভীর আকাশ আর অনন্ত সময়প্রবাহ যেন একসঙ্গে মিশে তার মনের মোহনায় পৌঁছল। নতুন এক অনাবিষ্কৃত সত্যকে আবিষ্কার করার নির্মল আনন্দ তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফোটাল। শান্ত নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন এক ব্যাকুলতা সৃষ্টি হল তার মনের অভ্যন্তরে।

কেবিনের জানলা দিয়ে আনমনা হয়ে সমুদ্র দেখতে লাগল। হু হু করে হাওয়া কত সমুদ্র ছুঁয়ে এসে তার কানে কত কি যেন ফিস ফিস করে বলে গেল। মার্গারেট কান খাড়া করে বাতাসের নিভৃত কথা শুনতে লাগল। প্রিয় মানুষকে নিয়ে ভাবার সুখই আলাদা। তুমি তো তার জন্য বহুদূব এসে গেছ মার্গারেট। পিছনের কোনো টানই তোমাকে ধরে রাখতে পারেনি। রাজাই তোমার সবচেয়ে বন্ধন। মহাপৃথিবীর দিকে বিশ্বপথিকের যে অবারিত পথ চলে গিয়েছে সে পথের তুমিও একজন পথিক। তোমাকে বেঁধে রাখে কে? তুমি ছাড়া বিশ্বপথিক রাজার এই বিশ্ব দুনিয়ায় সুখের আর কে ভাগীদার আছে? তুমি তার সুখ, আনন্দ, প্রত্যাশা। তোমার নিঃস্বার্থ মানবপ্রীতি, আর্ত মানুষের প্রতি মমতা, সমবেদনা, সেবা, মানুষের সুখের জন্য, শান্তির জন্য সফলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার শক্তি, সাহস, মনোবল নিয়ে রাজার যত গর্ব। তোমাকে ঘিরে তার মনে কত স্বপ্ন-সাধ। কেবল তুমিই রাজার হৃদয়ের স্বপ্নের রানী, তার মায়াবন বিহারিণী হরিণী।

সমুদ্রের উদ্দাম বাতাস যেন তার কানের কাছে সেই কথাই গভীর করে বলে গেল। অজান্তে বুকের অভ্যন্তর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একটু দিশাহারা বোধ করে। কেমন একটা অপরাধবোধে ভেতরটা টনটন করে। মনের গভীরে একান্ত

করে চাওয়াটা এভাবে বেরিয়ে পড়া সহজ, বাস্তবে অসম্ভব হওয়ারও কারণ নেই, তবু একজন সন্ন্যাসী সম্পর্কে মনকে এভাবে দুর্বল করতে নেই। তাতে সন্ন্যাসীকেই ছোট করা হয়। নিজেকে ছোট করলেও করতে পারে কিন্তু রাজার মত মহান সন্ন্যাসীকে ছোট করতে পারবে না কখনও। রাজা তাকে ভালবাসে কিন্তু সাধারণ ভালবাসার মত নয়, একটু অন্যরকম। নহ মাতা নহ কন্যা, নহ বধূর মতও নয়, আবার বন্ধু বা ভৃত্যের মতও নয়। একেবারে তার নিজের মত করে, যার সঙ্গে কোনো কিছু তুলনা হয় না। রাজার প্রত্যয় এবং চ্যালেঞ্জের প্রতিমূর্তি সে। তার সাফল্য মানে রাজার সাফল্য। রাজা যন্ত্রী সে যন্ত্র। তবু অনুশোচনাকে ছাপিয়ে যায় সান্ত্বনার আপ্তবাক্য। শান্ত মন খারাপ করা আর্তি বুকে নিয়ে এক গভীর অপরাধবোধে চেয়ে থাকে নীল সমুদ্রের দিকে।

কটা দিন একা একা জাহাজের কেবিনে বন্দী থাকার পর মার্গারেট এখন রোজ ডেকে এসে বসে। বেশ কয়েকজন পুরুষ ও নারী যাত্রীর সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল। খুব অল্পেই তাদের নজর কেড়ে নিল। তাদের সঙ্গে গল্পে বসলে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টের পায় না। যত দিন যেতে লাগল ততই তার সম্পর্কে যাত্রীবন্ধুদের কৌতূহল বাড়তে লাগল।

একদিন এক ইংরেজ মহিলা যাত্রী বললেন : মার্গারেট তুমি ভারতে যাচ্ছ কেন? একজন সন্ন্যাসী তো ভারতবর্ষের সব নন। দেশের তো আরো মানুষ আছে। তাঁর একার কথা অন্যে শুনবে কেন? শুধু তার বক্তৃতা শুনে এভাবে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে তুমি ঠিক করনি। সেখানে তুমি আত্মীয় বান্ধবহীন। ভীষণ একা। একজন বিদেশিনী হয়ে তুমি কি-বা করতে পার? তোমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তা-ছাড়া ভারতের ঘরোয়া সমস্যায় তোমার মাতব্বরি সেদেশের লোক মানবে কেন? তারাই বা তোমাকে কাজের অধিকার দেবে কেন? তুমি বড় আবেগপ্রবণ। তোমার জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে।

মহিলার কথা শুনে মার্গারেট একটু ভয় পায়। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারিনি। বিপরীত ভাবনার ধাক্কাটা সামলাতে অনেকক্ষণ সময় লাগে তার। তারপর নীচের দিকে চেয়ে চিন্তিতভাবে বলল : আমার গুরু এসব কথা বহুবার বলে সাবধান করেছে। আমিও অনেক ভেবেছি। ঝোঁকের মাথায় কিছু করিনি। আপনি বলুন কোন কাজে সমস্যা নেই। সমস্যাহীন জীবন হয়? আমি সারা জীবন সমস্যার মধ্যে কাটিয়েছি। অনেক হাসি-দুঃখ, ভয়-আনন্দে উপত্যকা পেরিয়ে তবে একটা জায়গায় এসে পৌঁছিয়েছি। সমস্যার কথা ভেবে তাই আর ভয় পাই না। সমস্যা আছে জেনেই, মানুষ আলাদা করে ভাবাব সময় দেয়, নিজের মস্তিষ্ক এবং মনটাকে কাজে লাগায়। ম্যাডাম, আমি চিরদিন একটু অন্যরকম। নিজের পাওয়া, না পাওয়া নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। সবাই যা করে আমার তা করতে কখনই ইচ্ছে করে না। হিসেব নিলে দেখা যাবে ভেবেচিন্তে জীবনে কিছুই করিনি। কেবল এই ব্যাপারটা যা ঠাণ্ডা মাথায় করেছি।

মহিলা বললেন : বয়সে তুমি অনেক ছোট, তবু তোমাকে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করছে। তোমার ভিতরকার মহাপ্রাণকে যে গুরু জাগিয়েছে তাঁকে আমি প্রণাম করি। সকলকে ত্যাগ করার বিপুল শক্তি যার ভেতর আছে, তাকে হারাবে কে? সত্যের আহ্বান তোমার অন্তরকে জ্যোতির্ময় করেছে। তোমার মধ্যে আমি এক নতুন যুগের যীশুকে দেখলাম। তবু তোমাকে একটা প্রশ্ন কবতে খুব ইচ্ছে করছে। যে জীবনের স্বপ্ন তুমি দেখছ, তার স্বরূপ কি, পরিণতি কি তুমি জান না। এজন্য কি ধরনের সংঘাত করতে হবে তাও তোমার অজ্ঞাত। লক্ষ্য, পথ সবই নতুন, অজানা। যাঁকে গুরু বলে তুমি মেনে নিয়েছ, বাস্তবে তিনি কতখানি তোমার পাশে দাঁড়াতে সমর্থ তার অগ্নিপরীক্ষা হয়নি ; বোধহয় তিনিও জানেন না-- কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে।

মার্গারেটের অধরে হাসি ফুটল। বলল : আমার গুরুর কথা, কাজের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামিও না। মনকে কেবল জিজ্ঞাসা কর, তুমি নিঃস্বার্থ কি না? তা যদি হও কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ কর না, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্তব্য করে যাও। সর্ব কর্মফল ঈশ্বরের ওপর অর্পণ করে তুমি নিরাসক্ত হও। শুধু তোমার বিশ্বাসকে নিষ্ঠাকে কর্মে পরিণত কর তাহলে। সাফল্য অনিবার্য। এসব বিশ্বাসের কথা, উপলব্ধির কথা-- তর্ক করে এ সত্য বোঝা যায় না।

মহিলার স্বামী হঠাৎ বললেন : মিস নোবল একদিনের কথাবার্তা থেকে জেনেছি আপনি খৃস্টান ধর্মযাজকের মেয়ে, খৃস্টান ধর্মের পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন, তবু ইংরেজ পদাশ্রিত একটি নেটিভ দেশের মানুষের কাছে খৃস্টধর্ম প্রচারের বদলে সে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আপনাব অকুণ্ঠ অনুরাগ আমার একটুও ভাল লাগে না। ওদের আছে কি?

মার্গারেট থম ধরা বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : বলেন কি? ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ যদি আমাদের থাকত তাহলে ধর্মপ্রচারের কাঙালপনা থাকত না। দেশে দেশে ধর্ম ফেরি করে বেড়ানোর মধ্যে কোথাও ধর্ম নেই। ধর্ম হল উপলব্ধি। মতবাদ ধর্মের আত্মাকে সৃষ্টি করে না। আত্মায় ধর্মের উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধিই ঈশ্বরের উপলব্ধি, সর্ব ধর্মের মূল কথা যখন ঈশ্বর উপলব্ধি তখন নানা ধর্মমত-বাহ্য বৈষম্য ও জটিলতা সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে দূরত্ব রচনা করছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনো ধর্মমতের বিরোধ নেই। সব ধর্মকে সে গ্রহণ করেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে। ভারতবর্ষ বলছে ধর্ম হচ্ছে মুক্ত মনের উদার উপলব্ধি। যা কিছু আমার মাঝে সত্য, তাই তিনি। তাঁব মাঝে যা সত্য তাই আমি। বিশ্বের সব মানুষের কাছে তাঁর আর্জি : মানুষ তুমি ধর্মে সুন্দর হও। এত বড় বোধ তো একদিনে হয় না। বহু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয়। বিশ্বাত্মায় লীন হয়ে গিয়ে সে পরম সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করা যায় এ হল সেই জীবন দর্শন। এই বোধ জন্মালে ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হয়, আধিপত্য স্থাপনের উন্মাদ বাসনা

থাকে না। নিজের সঙ্গেও কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

মহিলা যাত্রীটি অসহিষ্ণু হয়ে বলল : একজন খ্রীস্টান ধর্মযাজকের মেয়ে হয়ে নিজের ধর্মের একজন কঠোর সমালোচক হওয়া তোমাকে মানায় না। আমার মনে হয় তুমি যা বলছ ভেবে বলছ না। ভারতের সন্ন্যাসী তোমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে। তোমার সাধ্য নেই সম্মোহনের ঘোর কেটে বেরিয়ে আসা।

ম্যাডাম, আমি একদিন গোঁড়া খ্রীস্টান ছিলাম। স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই আমার গোঁড়ামিতে ভাঙন ধরে। স্বামীজি সেই ভাঙনকে সম্পূর্ণ করে নতুন এক ভাবধারায় আমাকে মাতিয়েছেন। খ্রীস্টানী ব্যাপারটা এত বাহ্যিকভাবে আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধানে বাঁধা এবং ভণ্ডামিতে ভরে গেছে যে তার মধ্যে যীশুকে খুঁজে পাই না। যীশুর ওপর আমার অনন্ত শ্রদ্ধা। যিনি যাতনা, শোক ও দুঃখের মধ্যেও সুখী। তিনিই সত্য। তবু মরে প্রমাণ করতে হল তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মৃত্যুর বহু বৎসর পরে মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়ে হলেন মানুষের অবতারী। দুর্ভাগ্য, ধর্মযাজকেরা তাঁর নামটাকে গ্রহণ করলেন কিন্তু তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাসের মর্মে প্রবেশ করলেন না। তাঁর মানবপ্রেম আজও মূল্যহীন হয়ে থাকল। বিধি-বিধানের আষ্টেপাশে বাঁধল মানুষকে।

পুরুষ যাত্রীটি বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে বলল : ম্যাডাম্ মাপ করবেন। ভুলটা শোধরানোর জন্য মনে করে দিচ্ছি-- মৃত্যুর বহু বর্ষ আগে জরডনের জলে অবগাহন করে শুচিস্নাত হয়ে যীশু যখন সাধু জনের কাছে দীক্ষার জন্য দাঁড়ালেন তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। মহাশূন্য থেকে একটি কপোত তার কাঁধে এসে বসল। আকাশ থেকে দৈববাণী হল : তুমি আমার পুত্র, আমার পরম প্রিয়।

মার্গারেট মর্মভেদী দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে তাকাল। বলল : মানুষ তাহলে পরম পিতার পুত্রকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে তাঁকে অপমানিত করে নির্দয়ভাবে হত্যা করল কেন? সেই অমানবিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড এমনই কঠিন যে তাদের হৃদয়ে একটু দয়ামায়া ছিল না। অথচ তিনি হলেন পরম পিতার পুত্র। তবু কি মানুষ শুনল তাঁর কথা? দৈববাণীর মর্ম বুঝল কোথায়? যদি বুঝত তাহলে মানবপুত্রকে অসহায়ের মত বলতে হত না-- হা ভগবান, তুমি কেন আমায় ছেড়ে চলে গেলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যীশুর মৃত্যুর পরেও বহুবছর কেটে গেছে। মানুষের বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধার গায়ে দৈববাণীর লেবেল দিয়ে মুক্তিদাতা অবতার বানিয়েছে তারা। এটা শুধু যীশুর জীবনে নয়, সব ধর্মস্থাপকদের জন্মবৃত্তান্তকে একটা অলৌকিক রহস্যে আবৃত করাটা একটা সাধারণ লক্ষণ। যাই হোক যীশুর ব্যাপারে এসবের কোনো দরকার ছিল না। জীবিত অবস্থাতেই মনুষের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরপুত্রের মৃত্যু হয়নি। মানুষের মনের অভ্যন্তরে তিনি নিত্যপূজা পেয়ে এক নতুন ঈশ্বর হয়ে উঠছেন। সেই পূজার অর্ঘ্য হয়ে খ্রীস্টধর্ম নামে এক নতুন ধর্মমত গড়ে উঠল যীশুর মৃত্যুর বহুবৎসর পরে।

তর্কটা হঠাৎ থেমে গেল। বেশ একটা নীরবতা নেমে এল।

জাহাজের একজন ক্রু বসেছিল মার্গারেটের সামনে। সে ছিল আইরিশ। ওর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল। মার্গারেটের এই ভক্তটি হঠাৎই থেমে যাওয়া ব্যাপারটাকে চাঙ্গা করতে বলল : ম্যাডাম বড় অদ্ভুত কথা বল তুমি। মাথা ধরানো ঐসব কথাবার্তা আমার মত জাহাজের খালাসীর মগজে ঢোকে? মাঝে মাঝে তোমার যে কী হয়? কী যে সব চিন্তা কর তুমি? এইসব কথা যখন বল তোমাকে বড় দুর্বোধ্য লাগে। বড় অচেনা মনে হয়। আর তো ক'দিন বাদে মাদ্রাজ বন্দরে পৌঁছবে। ঐসব ভারি ভারি কথা মনে থাকবে না। মনে রাখার মত কিছু গল্প শোনাও।

মার্গারেট হাসল। চকচক করা চোখে চেয়ে বলল : তোমার মনের কথা আমি বুঝি। আসলে, অভ্যাস আর সংস্কারের ভারে চাপা পড়ে যাওয়া সত্যটাকে উদ্ধার করার কথা আমরা ভাবি না। অভ্যাসকে বন্ধন ভাবি। বেশির ভাগ মানুষের কাছেই জীবন একটা বন্দীদশা। নতুন করে নতুনভাবে বাঁচার জন্য ভাবাভাবি করতে হয়— সে সময় তাদের নেই। এভাবেই ঈশ্বরের নাম করে জীবন কাটানোই তাদের কাছে মুক্তি। সত্যিই তো মানুষের ভাবাভাবির সময় আছে কি? নেই। কিন্তু আমার ভাবতে ভাল লাগে। এজন্য আমাকে নাস্তিক কিংবা বিদ্রোহী মনে করারও কারণ নেই। আমি যা বলছি তা নতুন নয়, সে শুধু প্রাচীন এবং সনাতন কথা। চিরন্তন সত্য কথা। তাই মানুষের চিন্তার গভীরতমপ্রদেশ আলোড়িত করে বলে আরো অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। একদিন আমারও এমন হয়েছিল। অবিশ্বাসী মন নিয়ে এক খ্রীস্টান ধর্মযাজকের মেয়ে অকুতোভয়ে ইউরোপ, আমেরিকায় চিত্ত বিজয়ী বীর ভারতের সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে কতভাবে আক্রমণ করেছিল। সংশয়ের কী ভয়ংকর যন্ত্রণা নিয়ে মাথা কুটেছি আমার মনের অন্ধকার কারায়-- সে খবর রাখে না কেউ। যা সত্য তা চেপে রাখার জিনিস নয়। দিনের আলোয় পেঁচার মত মুখ লুকোয় না সে, সবাই তাকে যাচাই করে নিতে পারে।

জাহাজের ক্রু বলল : ম্যাডাম, আমার মত নীরেট তোমার ওসব কথার অর্থ বুঝবে না। বরং কী করে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হয় তার গল্প বল। এক বিশ্বাস থেকে আর এক বিশ্বাসে উত্তরণের জন্য তুমি কি করেছিলে?

সমুদ্র তোলপাড় করা বিশাল বিশাল ঢেউয়ের দিকে নির্নিমেষ চেয়েছিল মার্গারেট। দিগন্তরেখার কাছে শেষ সূর্যের আলো পড়েছে যেখানে, সে অবধি ছড়ানো ওর দুই চোখ। কেমন যেন সমাহিত হয়ে গেছিল নিজের মধ্যে। গুরুকে নিয়ে তারও মনের অভ্যন্তরে অনুরূপ এক তোলপাড় শুরু হয়েছিল একদিন। মার্গারেট বলল : জান জন, লন্ডনে থাকাকালে গুরুর বক্তৃতা খুবই মন দিয়ে শুনেছি। কথাগুলো আদৌ নতুন নয়। ওল্ড ওয়াইন ইন্ এ নিউ বটল। কথাটা চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম-- আপনি যা বললেন তা নতুন কিছু নয়। এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই, আমিও জানি। অনুরূপ কথা পূর্বে শুনেছি এবং নিজেও ভেবে থাকতে পারি।

প্রাচ্যের সন্ন্যাসী আমার কথা শুনে স্মিত হাসলেন। প্রজ্ঞার হাসি। বললেন : আমিও নতুন কিছু বলিনি। সে শুধু প্রাচীন এবং সনাতন কথা, চিরন্তন সত্য কথা--এর কোনো রূপান্তর হয় না। তাই তো কথাগুলো খুব সহজে বুকে গেঁথে যায়। মনভরা ভাললাগার ঢেউ তোলে বুকে। চিরন্তন সত্যের সব জোর এখানে। আলোকে আলো বলে চেনাতে হয় না। আলো- অন্ধকারের পার্থক্য একজন শিশুও বোঝে। তবু চিরন্তন সত্যের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে আষ্টে-পৃষ্ঠে মানুষ নিজেকে বাঁধে। কোনটা আত্মার বন্ধন আর কোনটা আত্মার মুক্তির মন্ত্র সে কথাটা বোঝাতেই সুদূর প্রাচ্যভূমি থেকে এসেছি।

জাহাজের ক্রুটি বলল : আত্মার মুক্তির মন্ত্রটা কি একটু বুঝিয়ে দাও ম্যাডাম।

মার্গারেট ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বলল : মানুষের যা কিছু মহান, যা কিছু উদার, সুন্দর তাকে আরও সুন্দর করার ওপর গড়ে উঠেছে এর বনিয়াদ। স্বাধীন হয়ে কাজ করার তৃপ্তি একজন ক্রীতদাসের থাকে না। তাকে শেকলে বেঁধে কাজ করানো হয়। সে কাজে তার আনন্দ নেই, নিষ্ঠা নেই। নিজের মত করে কাজ করাব অধিকার পেলে তবেই আনন্দ। আত্মার সুখ ও তৃপ্তি। এই বোধটা আমাদের সকলের মধ্যে আছে, কিন্তু স্বামীজির মুখে শোনার পর থেকে গভীর করে অনুভব করতে পারি। প্রতিদিনের কাজকর্ম, দুঃখ যন্ত্রণা, সূক্ষ্ম-আনন্দের মধ্যে ঐ বোধটা স্বামীজি প্রাণের ভালবাসা দিয়ে জাগিয়ে তুলবে বুকের ভিতরে। তাঁর সব ব্যথাব মধ্যে প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসা ভালবাসাটা দেখতে পেলাম। ওঁর মত অমন করে আপনার বলে কাছে টানার মানুষ খুব কম দেখেছি।

এই টানেই ভারতে যাওয়ার জন্য পাগল হয়েছ?

মার্গারেট একটু থমকে গিয়ে বলল : তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। কারণ টানটা উভয় দিকেই প্রবল। এখন কে কিভাবে নেবে তার বিচার যার যার আদর্শের মাপকাঠিতে হবে। এ সম্পর্কে একটা সুন্দর গল্প বলেছিলেন আমার গুরু। সন্ন্যাসী এবং সংসারীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে মীমাংসার জন্য রাজার কাছে গেল তারা। প্রমাণের জন্য রাজা উভয়কে নিয়ে দেশ পরিভ্রমণে বার হলেন। যেতে যেতে এক রাজ্যে প্রবেশ করল। সে দেশের রাজকন্যার স্বয়ম্বর হচ্ছে শুনে রাজা তাদের নিয়ে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত। বহু প্রার্থী জড় হয়েছে। সবাই রাজপুত্র। তার মধ্যে একপাশে ছদ্মবেশে রাজা, সংসারী ও সন্ন্যাসীকে নিয়ে বসল। রাজকন্যা মালা হাতে পাত্র খুঁজছে। সবাই উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য, কাউকে রাজকুমারীর পছন্দ হল না। অবশেষে দর্শকদের আসনে সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে তার পছন্দ হল। রাজকন্যা আচম্বিতে তার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিল।

সন্ন্যাসী খুশি হওয়ার বদলে ফুঁসে উঠল। বলল : একী করলে। সন্ন্যাসীর আবার বিয়ে? তুমি পাগল হয়েছ? ঈশ্বর এ কোন্ কঠিন পরীক্ষায় ফেললে?

রাজা ভাবল, সর্বত্যাগী এই মানুষটির চাল-চুলো নেই, অর্থ-সম্পদ কিছু নেই বলে বিয়েতে ভয় পাচ্ছে। রাজা তাকে বললেন, শোনো যুবক, রাজকন্যা বরমাল্য ফিরিয়ে নিতে পারে না। বিধিমতে তুমি ওর স্বামী হলে এখন থেকে। আমি তোমাকে রাজকন্যার সঙ্গে সম্পদ, ঐশ্বর্য যৌতুক দেব। তোমার ভয় কি?

তরুণ সন্ন্যাসী বিরক্ত হযে মালাটা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর সব মায়াবন্ধন, রাজার রক্তচক্ষু তুচ্ছ করে রাজসভা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। কিন্তু তাতে সে নিস্তার পেল না। রাজকন্যার দৃষ্টি পড়েছে তার ওপর। মনও দিয়েছে উজাড় করে। অনুরাগ তার প্রেমে পবিণত হয়েছে। প্রেম রাজকন্যাকে সর্বস্বত্যাগে উদ্বুদ্ধ করল। তাই সন্ন্যাসীর পিছন পিছন সে দৌড়ল। বাজকুমারী তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল ঐ সুদর্শন, সৌম্যসন্ন্যাসীকে ধর, ও আমার স্বামী। ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। ও যদি বিয়ে না করে আত্মহত্যা করে লজ্জা, অপমান ভুলব। এ হুমকিতে সন্ন্যাসী ভুলল না। রাজকুমারীর বন্ধন এড়াতে সন্ন্যাসী লোকালয় ত্যাগ করে বনে ঢুকল। প্রেম পাগলিনী রাজকুমারীও তার সঙ্গে বনে প্রবেশ করল। গহন বনের অন্তরালে সন্ন্যাসী হারিয়ে গেল। রাজকুমারী পাগলের মত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার দেখা পেল না। শ্রান্ত, ক্লান্ত অবসন্ন রাজকুমারী অভিমানে অপমানে অসহায়ভাবে গাছতলায় বসে কাঁদতে লাগল।

বনভূমিতে সন্ধ্যা নামল। চারদিক থেকে অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে ক্রমে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজকুমারীর এমনই করুণ অবস্থা যে বন থেকে নির্গত হওয়ার মত শক্তিটুকু তার নেই। সেইসময় রাজা এবং সংসারী যারা আনুপূর্বিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছিল সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাজকুমারীর কাছে এল। অসহায়ের মত তাকে কাঁদতে দেখে রাজা বলল : তোমার কী হয়েছে মেয়ে?

বন থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এখন আমার কি হবে? বলল রাজকুমারী।

অন্ধকারেব ভিতর থেকে সন্ন্যাসী নির্মোহ গলায় উত্তর দিল, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। এখান থেকে বেরোনো অসম্ভব। কাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

রাজকুমারী নিজের মনে বলল : সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণ বলে কিছু নেই। ওর জন্য সব ত্যাগ করে বন পর্যন্ত ছুটে এলাম, তবুও আমার হল না। সন্ন্যাসীরা হারানোর ভয়ে সব সময় কাতব। আমি যে একটা মেয়ে, গহন বনে একা রাত কাটাব একথা ভেবেও সে নিরস্ত হল না। এমন দায়িত্বশূন্য, পাষণ্ড মানুষকে নিয়ে সংসার করা যায়?

অন্ধকারে কাউকে চেনা যাচ্ছিল না, রাজা বললেন-- তা তো বুঝলাম, কিন্তু রাত কাটাবে কোথায়?

ঈশ্বর যেখানে বাখবেন সেখানে।

তা-হলে এই বৃক্ষের নিচে বসে আমাদের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে।

ওরা চারজন একত্রে কাছাকাছি বসল। ঠাণ্ডা ছিল একটু। রাজকুমারী ঠকঠক করে

কাঁপছিল। বলল : বড্ড শীত। একটু আগুন হলে ভাল হত। খড়-কুটো জোগাড় করে একটু আগুন করা কি যায়?

অন্ধকারের ভিতর থেকে সন্ন্যাসী বলল : এই দুর্গম বনে আগুন পাব কোথায়? চকমকি পাথরও নেই সঙ্গে।

সেই গাছের ওপর এক পক্ষী পরিবারের বাসা ছিল। গাছের নিচে ওদের দেখে তাদের খুব কষ্ট হল। পাখি তার স্ত্রীকে বলল : অতিথি নারায়ণ। আমাদের ঘরে ওরা আজ আশ্রিত। ওরা শীতে কাঁপছে। আগুনে ওদের গা সেঁকে নেওয়ার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।

তখনই তার স্ত্রী উড়ে গিয়ে ঠোঁটে করে একটুকরো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ওদের সামনে ফেলে দিল। তাই নিয়ে ওরা আগুন জ্বালল। শীতটা দূর হল। স্ত্রী পাখিটি বলল : ওরা ক্ষুধার্ত। কি খেতে দিই বলত?

পুরুষ পাখিটি বলল : আমরা গৃহী। কিন্তু আমাদের সঞ্চয় বলে কিছু নেই। তবু অতিথি সৎকারের জন্য কিছু একটা করতে তো হবে। নইলে সংসারী প্রাণী হলাম কি সে?

তাহলে করবে কি। স্ত্রী পাখি জিজ্ঞেস করল।

পুরুষ পাখি বলল : আত্মাহুতি দেব। কথাটা বলেই সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতিথিরা ওকে বাঁচানোর খুব চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। স্ত্রী পাখি ভাবল, সেও মহাপ্রাণ স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ওদের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করবে। কথাটা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল। ওদের দুটি শাবক পিতা-মাতার আত্মোৎসর্গের দৃশ্য দেখল। নিজের মধ্যে তারা বলাবলি করল, বাবা মা তাদের জীবন দিয়ে অতিথি সৎকার করেছে। কিন্তু ওতে চারজনের খাওয়া হবে না। অতএব পিতামাতার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য আমরাও আত্মাহুতি দেব। বলে, আগুনে ঝাঁপ দিল।

অতিথিরা ওদের মাংস ভক্ষণ করল না। শুধু পরের হিতের জন্য তাদের মহান আত্মোৎসর্গের কাণ্ডকারখানা দেখল। উপোস করেই তারা রাতটা কাটিয়ে দিল। ভোর হলে রাজা বলল, প্রত্যেকে তার কর্তব্য করবে নিঃস্বার্থভাবে। ফললাভের প্রত্যাশা না করে শুধু হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করবে। নিজ নিজ অধিকারে কেউ কারো থেকে ছোট নয়।

সন্ন্যাসী প্রত্যুত্তরে বলল : যদি আপনি সংসারে থাকতে চান জঙ্গলে ঐ পাখিদের মত প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকুন।

সংসারী বলল : সংসার ত্যাগী হলে, সন্ন্যাসীর মত কামিনী কাঞ্চন এবং বিষয়ে নিস্পৃহ হন।

রাজকুমারী বলল : আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করছি। কোনো ধর্মই অন্যের ধর্মপালনের অধিকার থেকে ছোট নয়, আবার আরেকজনের করণীয়ও নয়।

তাহলে সন্ন্যাসীরও বোঝা উচিত কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, কামনাই বন্ধনের কারণ। কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করে যদি কর্ম করা যায় তাহলে ভয় কিংবা বন্ধনের শঙ্কা থাকে না। বাসনা কামনাকে খর্ব করার একমাত্র উপায় হল মনকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রেম হল ঈশ্বর। কর্ম হল সিদ্ধিলাভের উপায়।

রাজা বলল : চমৎকার। প্রেম প্রণোদিত হয়ে পরের জন্য কাজ কর, কাজই মুক্তি। পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু করতে পারলে মনে আনন্দ হয়। ঐ আনন্দে ও পরমতৃপ্তিতে স্নাত হয়ে পাখি পরিবার আত্মহুতি দিল। পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ কর। উৎসর্গের পরম সুখ হল আনন্দ।

গল্প বলা শেষ হলে জাহাজের ক্রু বন্ধুটি মার্গারেটের বিভোর দুই চোখের ওপর চোখ রেখে বলল : বুঝেছি, তুমি সেই আনন্দের টানে ভারতবর্ষে চলেছ।

মহিলা যাত্রী এবং তার স্বামী মার্গারেটের গল্পটা নিবিষ্টমনে শুনছিল। গল্প শেষ হলে মহিলার গলায় দ্রবীভূত স্বর কেমন যেন পাতিহাঁসের মত ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেল। বলল : নিজের দেশে বসে নিজের ধর্মের মানুষের জন্যে তো সেবামূলক কাজ করতে তো পারতে। এজন্য ভারতবর্ষে যাওয়ার খুব দরকার ছিল কি? তোমার দেশ, তোমার ধর্মের প্রতিও তো কর্তব্য আছে।

দ্বিধাভরা উজ্জ্বল চোখে মার্গারেট ওদের দিকে তাকিয়ে বলল : সাধনার জন্য ক্ষেত্র চাই। সব সাধনা সব জায়গায় হয় না। আমার সাধনক্ষেত্র বোধহয় ভারতভূমি। আমার ঈশ্বর আমার গুরু ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে দু'বাহু বাড়ায়ে আমাকে ডাকছেন। বোধহয় এর সঙ্গে ভাবপ্রকাশের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। ভারতবর্ষ হল সেই উপযুক্ত জায়গা। আমার মনের মুক্তি তার আকাশে-বাতাসে, বনে-বনান্তরে। বেশিরভাগ মানুষ একঘেয়ে অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না বলেই জীবনটা একটা বন্দীদশা তার কাছে। আমার কোনো বন্ধন নেই। সব বাঁধন ছিঁড়ে গেছে এক পলকে। চোখ বুজলে আমি দেখতে পাব ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে আমার জন্য। তাদের ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নারীও যে অমৃতের পুত্রী এ সত্যকে জীবনের প্রতি কর্মে ফুটিয়ে তোলার ব্রত আমার। একটা নতুন ধরনের কাজ। আমার জীবনের এক অভিনব চ্যালেঞ্জ।

বলতে বলতে মার্গারেটের দু'চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মহিলা এবং তার স্বামীর চোখেমুখে একটু বিব্রত ভাব খেলে গেল। তাদের অস্বস্তিকে সহজ করে দেওয়ার জন্য বলল : এখুনি খাওয়ার ঘণ্টা পড়বে। আমার জন্য ভেবে আর কি করবেন—যা হবার তা হয়ে গেছে এ জন্মের মত। ভাবাভাবির সময় বোধহয় আর নেই। যাদের কাজ নেই, তারাই ভাবুক। আমার জীবনে পুবের সূর্যোদয়ের রঙ লেগেছে ; পশ্চিমে ফিরি কি করে?

জাহাজের ক্রু বন্ধুটি বলল : ম্যাডাম তুমি বড় ভারি ভারি কথা বল। একটু হাল্কা

কথা বল। মজার কথা বল। তুমি কিন্তু ভাল গল্প বল। তোমার গল্প শুনতে শুনতে আমার খুব হিংসে হচ্ছিল।

লজ্জার হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল মার্গারেট।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

মার্গারেটকে ডেকের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিছন থেকে জন নামে জাহাজের আইরিশ ক্রুটি ডাকল : মিস নোবল! জাহাজে তোমার খুব একঘেয়ে লাগে তাই না?

মার্গারেট লাজুক হেসে বলল : জন, এখানে অবকাশটা বড় দীর্ঘ আর একঘেয়ে। নিজেকে বড় বন্দী মনে হয়। তোমরা কাজের মধ্যে থাক। প্রতিদিন এক একরকম পরিবেশ তৈরি করে নাও। তারপর জীবন উপভোগের জন্য যেসব ব্যাপারগুলো থাকা দরকার মোটামুটি তোমরা তা পেয়ে যাও। একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে থাকতে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছ। কিন্তু আমার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। কোথাও বেরোবে মনে করলে উপায় নেই। কোনো পরিকল্পনা নেই, কোনো উদ্বেগ নেই ; কোনো কর্তব্য নেই, দায়িত্ব নেই। যখন মন যা চায় তাই করা যায়। ইচ্ছে করলে ডেকে বসে গল্প করতে পারি, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রেলিং-এ ভর দিয়ে সমুদ্র দেখতে পারি। বিছানায় শুয়ে বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখতে পারি, পড়তে পারি। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। সময় নষ্ট হল বলে হা হুতাশ করার নেই। সেদিক দিয়ে মজায় আছি। দিনটাকে অমৃতের পাত্র করে তোলার দায়িত্ব আমার।

মিস তোমার কথাগুলো শুনতে ভীষণ ভাল লাগে। এখন তুমি কোন্ অমৃত পান করছ?

সূর্যাস্ত হচ্ছে। সূর্য কোথাও নেই। কিন্তু গোটা আকাশ জুড়ে এক দিব্য আলো রয়েছে। দেবতার আশীর্বাদের অমৃতধারা হয়ে যেন ঝরে পড়ছে সমুদ্রবক্ষে। মনে হচ্ছে, স্বর্ণ হোলি খেলায় মেতে ওঠেছে আকাশ আর সমুদ্র। সূর্য নেই তবু তার অকৃপণ আলোয় দ্যুতিময় করে রেখেছে পৃথিবী।

জনের অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল : অন্ধকার নামছে। একটু একটু করে সব আলোটুকু নিঃশেষে শুযে নেবে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাবে সব।

মার্গারেট বলল : ধ্রুবতারা অতন্দ্র হয়ে পথ দেখাবে। এর মানেটা কিছু বুঝলে?

জন ঘাড় নেড়ে জানাল, সে বোঝে না। মার্গারেট বলল : সূর্যের আলো যখন থাকে মানুষ তখন ঈশ্বরকে দেখে না। যখন আলো থাকে না তখন সে ঈশ্বরকে খোঁজে। ঐ ঈশ্বর ধ্রুবতারা হয়ে তার হৃদয় আকাশে বিরাজ করে। অর্থাৎ, যখন সে

ঈশ্বরকে দেখে তখন তার কাছে জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়। ঈশ্বর অন্তরের মধ্যে গুপ্ত থেকে ধ্রুবতারার মত পথ দেখায়।

জন চুপ করে রইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : তোমার সঙ্গে চুপ করে সমুদ্র দেখতে ভাল লাগে। নৈঃশব্দও তখন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। ভীষণ ভাল লাগে। কিন্তু উপায় নেই। ডিউটিতে যেতে হবে।

মার্গারেট বলল : যাও ভাই।

জন চলে যেতে মার্গারেট ডেকে একেবারে একা হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে তার পরিধানের ধূসর রঙের লংকোট ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না। রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সমুদ্র। রাত মানেই স্তব্ধতা। জীবনের যতি। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের ঘুম নেই। থেমে পড়ার ব্যাপারটাও তার নেই। অবিরাম চলেছে সে। কোথায় চলেছে, কেন চলেছে জানে না। মহাপৃথিবীর দিকে যে অবারিত পথ গিয়েছে সেই পথে তার অভিসার। অনন্ত প্রেম নিয়ে অভিসারিকাব মত মহাসমুদ্রও চলেছে নির্ভয়ে। পথের ভয়-ভাবনা তার নেই। নিজের যাত্রাপথের সে একজন নিঃসঙ্গ নির্ভীক অভিযাত্রী।

এরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি ও ভাবনায় মার্গারেটের মনটা আবিষ্ট হয়ে গেল। ঢেউয়ের বুকে মুখ রেখে সমুদ্র যেন ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউয়ের সঙ্গে অবিরল কথা বলছিল। সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসা বতাস যেন তার বুকের কলধ্বনি বয়ে আনল তার কানে। মার্গারেট, হিন্দুধর্ম হল একটা দার্শনিক উপলব্ধি। কোনো এক কালে শেষ হয়ে যায়নি। বহুকাল ধরে একটু একটু করে সনাতন বোধ ও বিশ্বাসের ওপর তার বনেদ গড়ে উঠেছে। এগুলি অনন্তকাল ধরে আছে এবং থাকবেও। সব ধর্মের সারকথা আছে হিন্দুধর্মে : হিন্দুধর্ম অনেকটা সমুদ্রের মত। বিবিধ দিক থেকে বহু স্রোত এসে মিলছে। সমুদ্র সকলকেই গ্রহণ করছে। হিন্দুধর্মও তেমনি সব ধর্মকে সমাদর করে, সম্মান করে। কিন্তু কাউকে গ্রাস করে না। আবার কারো সঙ্গে তার বিরোধও নেই। হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা পৃথিবীর অন্যকোনো ধর্মমতে নেই। বিশ্বমানবতার ধর্ম হল হিন্দুধর্ম। ভারতের মুনি-ঋষিরা মনে করেন, সকলের মধ্যে ঈশ্বরত্ব বর্তমান। ঈশ্বরত্বেই মানুষের সমত্ব। কারণ, মানুষই জীবন্ত ঈশ্বর। হিন্দুধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্মমত মানুষকে এত মহিমান্বিত করেনি। হিন্দুধর্ম বলেছে, ঈশ্বর আছে সর্বভূপে, সব কিছুর মধ্যে। এমন কি জাহাজের ঐ মাস্তুলের মধ্যেও তিনি আছেন। তবে, এরকম বিশ্বাসের জোর চাই। ভক্ত প্রহ্লাদ স্তম্ভ ভেঙে ধ্যানের দেবতাকে দেখাতে পেরেছিল। বিশ্বাসই আসল কথা। এই বিশ্বাসের জোরে একজন ভক্ত স্বচ্ছন্দে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। এই শক্তিই ঐশ্বরিক শক্তি। মনের অভ্যন্তরে তাকে জাগ্রত করতে হয়।

অনুভবের জগতে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া চলেছে মার্গারেটের। মনের অভ্যন্তরে সে নিজেকে খুঁজছিল। নিজের অজান্তে অপরূপ এক ধ্যানের দেবতার মুখ ভেসে উঠল সমুদ্রবক্ষে। সে মূর্তি গুরু বিবেকানন্দের। এক ব্যাকুল আর্তি জাগাল বুকের গভীরে। সমস্ত সত্তার ভেতর সূর্যের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল বিবেকানন্দের জ্যোতির্ময়

মূর্তি। আশ্চর্য এক আত্মপ্রসাদে আবিষ্ট হয়ে গেল তার মন। সভার ভেতর দূরাগত মন্ত্রধ্বনির মত ধ্বনিত হতে লাগল আচার্যের কণ্ঠস্বর। তত্ত্বমসি-- তুমিও সে। এই ভাবনায় মন অহোরাত্র পূর্ণ করে রাখ, এই ভাবনাকে ধ্যান কর যতক্ষণ না বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করছ চারদিকের সব কিছু গলে গলে যাচ্ছে, এমন কি শরীরকেও আর দেখা যাচ্ছে না। কেবল তুমি বর্তমান! তোমা হতে সব উৎপত্তি। তুমিই তার একমাত্র চেতনা, একমাত্র অস্তিত্ব। এই আত্মানুভূতি হলে তবেই বলা যায় আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। তখনই বিশ্ব আমির জন্ম হল মনের অভ্যন্তরে। যাঁকে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর বলা হয় তিনি তোমার মানস সৃষ্টি। এই পরম সত্যের অনুধ্যান কর, আলোচনা কর-- সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করে মানুষের পৃথিবীকে সুন্দর কর মার্গারেট। প্রত্যাশা এবং প্রতিদানের দাবি না রেখে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই পরম ধর্ম। সব ধর্মেই প্রেমপ্রদীপ্ত স্বার্থশূন্য আত্মোৎসর্গকে ভগবৎ প্রেমের উচ্চ আদর্শের মর্যাদা দিয়েছে। ক্রিশ্চান ধর্মেও তার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও মার্গারেট আপাদমস্তক ওভারকোটে নিজেকে আবৃত করে ডেকে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক কথাই তার মনে হচ্ছিল। শুধু কি আদর্শের টানে, আত্মোৎসর্গের তাড়ানায় ভারতবর্ষে যাচ্ছে সে? নিজের মনেই মার্গারেট মাথা নাড়ল। যার অর্থ 'না'। শুধু আদর্শের টানে এতদূর ছুটে আসে না? আসে কি? একটা গোপন লুকোনো টান কোথাও থাকে। সেই টানটা হাতছানি দিয়ে চুপিচুপি ডেকে আনে। একজন বিশেষ মানুষের ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ, তাঁর আহ্বানের শক্তি, ভাললাগার টান, মন আলো করা শ্রদ্ধা তাকে ভারতবর্ষে টেনে এনেছে। স্বামীজির মত এক আশ্চর্যসুন্দর মানুষের পাশে থেকে কাজ করার সুখই আলাদা। ঐ সুখ যে মনে বাস করে সে কেমন? জাহাজে ওঠার দিন থেকে এই প্রশ্ন তার মনে যাওয়া আসা করছে কিন্তু এতদিন ধরে তার উত্তর পায়নি। আজ তার উত্তরটা যেন আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হল সে আনন্দসাগবে ভাসছে। ঐ সুখ ও আনন্দে আকাশ, সমুদ্র পরিব্যাপ্ত জ্যোৎস্নার মত হয়ে গেছে ; অনেকটা ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে। ভারতের সন্ন্যাসীর সরল, নিষ্পাপ, আলোয় ধোয়া মুখ সে কল্পনায় দেখছিল। ভক্তের মত দু'হাত জোড় করে মনের প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেন আকুল কণ্ঠে বলল : তোমার গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।

তবু ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে মার্গারেটের বুকের ভিতরটা কাঁপছে। একটা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন পরিবেশ, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, আচার-প্রথা সবই আলাদা। এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া একটা কঠিন সমস্যা। সেই অগ্নিপরীক্ষায় সফল করে তোলার জন্য রাজা আগে থেকে তাকে শুধু সতর্ক করেনি, সংগ্রামের জন্য মনটাকেও প্রস্তুত করার সংকেত দিয়েছে। ভারতবর্ষে কাজ করার জন্য তাকেও অনেক মূল্য দিতে হবে-- দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা, দাসমনোবৃত্তি, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, বিধর্মীদের প্রতি

তীব্র-ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা-- এদেশের জীবনের ওপর এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ। এই অভিশাপ মুক্তির জন্য দরকার শক্তিময়ী এক নারী। সে নারী হবে সারদাদেবীর মত পরম মমতাময়ী। মায়ের মন আর দরদ পারে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপের শাপমুক্তি ঘটাতে।

সারদাদেবীর জীবনের একটা গল্প মনে পড়ল। স্বামী সারদানন্দর কাছে শুনেছিল। দক্ষিণেশ্বরে সারদামণি তখন থাকেন। রোজ তাঁর কাছে একজন বয়স্ক মহিলা আসত। বয়সকালে মহিলার পদস্খলন ঘটেছিল। গাঁয়ের ব্যাপার, সকলেই তা জানত। সমাজের লোক তাকে মন্দ চোখে দেখত। নানাকথা বলত। সারদাদেবীও সব শুনেছেন। তবু মহিলাকে তাঁর কাছে আসতে যেতে দিতেন। পাছে তার মনে ব্যথা লাগে, তাই ঘূণাক্ষরে প্রশ্ন করে বিব্রত করেননি তাকে। বরং মহিলাই একদিন সব খুলে বলল। সারদাদেবীর পায়ের ওপর মাথা রেখে বলল : তুমি আমার মা। আমাকে ত্যাগ কর না। তোমার পায়ে একটু আশ্রয় দিও মা।

সারদাদেবী পরম মমতায় তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল : এতকাল এসব কথা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কত কষ্ট পেয়েছিস বলত? এখন আর কষ্ট আছে? মার মত আপনজন হয় না। মা কখনও সন্তানকে ফেলতে পারে? সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন কুসন্তান যদিও হয়, কুমাতা কভু নয়।

বাতাসেরও কান আছে। কথাটা রামকৃষ্ণের কানে গেল একদিন। নিভৃতে সারদাকে ডেকে বললেন : ঐ মন্দ মেয়েটা তোমার কাছে আসে যায়। কেন গা? ও মেয়েটা ভাল নয় গো। ওর চরিত্র ভালো নয়। তুমি ওকে আসতে নিষেধ কর।

স্বামীর কথা শুনে সারদা বেশ একটু অবাক হয়ে তাঁর চোখের ওপর চোখ রেখে ওঁর চেনা আশ্চর্য মানুষটি বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন : ওই মেয়ের সব কথা আমি জানি। মায়ের কাছে সন্তানের কোনো লজ্জা নেই। তাই ও কোনো কিছু গোপন করেনি। সব বলেছে। আমি যে মা। ভালো-মন্দ ছেলে মেয়ে নিয়ে আমার সংসার। আমার ছেলে-মেয়েরা গায়ে ধুলো কাদা মেখে এসেছে বলে ঘেন্না করে দূরে সরিয়ে তো দিতে পারি না। বকাবকি করে ধুলো কাদা ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হয়। তাতে মায়ের গৌরব কমে না। মায়ের আদর ভালবাসা পেয়ে সে আরো পবিত্র হয়ে ওঠে। ওই মেয়ে তো পবিত্র থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে যারা ভালো থাকতে দিল না তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে যদি আমার দোষ না হয় তাহলে ওর বেলায় হবে কেন? আচ্ছা, তুমি বল যে ধর্মপথে চলতে চায়, ভাল হতে চায়, মা হয়ে তাকে অধর্মের পাঁকে ফেলে দিতে পারি আমি? বাবারা পারে, মায়েরা পারে না। বাবারা মায়ের মনের কথা বোঝে না। তাই, তুমি বললেও আমি ওকে আসতে যেতে নিষেধ করতে পারব না।

রামকৃষ্ণ হতভম্ব। সারদার মধ্যে এ কোন নারীশক্তিকে দেখছেন? অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে তাঁর। ফ্যালফ্যাল

করে সারদাকে দেখেন। ভক্ত যেমন পূজাঞ্জলি নিয়ে ভগবানের বিগ্রহের সামনে আকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে তেমনি এক মুগ্ধতা নিয়ে সারদাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর বিস্মিত বিহ্বল মূর্তির দিকে তাকিয়ে সারদামণি বললেন : তুমি শুধু আমার ঠাকুর? সকলের নও?

রামকৃষ্ণ এরকম এক প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় বোধ করেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন : না গো, তুমি ভুল করনি। ভুল আমারই। হ্যাঁ-গো তুমি আমায় আজ খুব শিক্ষে দিলে গো।

স্বামীজি তাকে ঠিকই উপদেশ দিয়েছেন-- মায়ের মমতা নিয়ে কুসংস্কারের ভূত দূর করা কঠিন কাজ নয়। জাতপাতের ব্যাপারেও অনুরূপ আর একটা অনবদ্য গল্প মনে পড়ল মার্গারেটের।

রামকৃষ্ণ নিজে যত বড় সাধকই হন আর উদার হন না কেন তাঁর মনে ছোঁয়াছুঁয়ির একটা ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে খাবারের ব্যাপারে স্পর্শদোষের একটা বাতিক ছিল। তাই দুপুরের আহারের পর্বটা নিজের হাতে করে নিতেন। রাতের ভোজনটা শ্রীশ্রী জগদম্বার প্রসাদী লুচি খেয়েই সারতেন। কিন্তু ঐ আহারে তাঁর সুখ ছিল না। মায়ের প্রসাদ দেওয়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন। প্রসাদ হাতে নিয়ে মায়ের দিকে হাপুস-হুপুস নয়নে তাকিয়ে বলতেন— মাগো কৈবর্তের অন্ন খাইয়ে শেষে আমার জাতও নিলি।

পাষাণী মা বোধ হয় তাঁর ঐ অনুযোগ শুনে এবার তাঁর চৈতন্যদয়ের জন্য এক মহাপরীক্ষায় ফেলল ঠাকুরকে। সারদাদেবী সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন। ঠাকুরের খাবারটা রোজই নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে গুছিয়ে দেন। ঠাকুরও চেটেপুটে বেশ পরিতৃপ্ত হয়ে খেতেন একদিন এক মহিলা সাবদামণিকে বললেন : মা-গো আমার একটা ইচ্ছের কথা শুনবে?

সারদাদেবী মৃদু হেসে বললেন : শোনো মেয়ের কথা! মাকে ইচ্ছের কথা শোনাতে বুঝি ভনিতা করতে হয়? বেশ তো, কী বলতে চাস, বল না।

সারদাদেবীর দিকে তাকিয়ে লাজুকের মত আঁচলের খুঁটোটা আঙুলে জড়তে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ ধরে দ্বিধা আর সংকোচে ইতস্তত করতে লাগল। অবশেষে বলল : মা গো, ঠাকুরের খাবারের থালাটা আমি যদি নিয়ে যাই, উনি কি গ্রহণ করবেন?

সারদার অধরে সারল্যের হাসি। বললেন : পাগলি মেয়ের কথা শোন। বেশ তো একদিন দিয়েই দ্যাখ না ঠাকুরকে!

মহিলা উচ্চকিত ভয়ে সংকুচিত হয়ে বলল : না মা, আমার খুব ভয় করছে। ছোট ঘরের খারাপ মেয়ের ছোঁয়া যদি না খান তাহলে সারাদিন ওঁর আর খাওয়া হবে না।

সারদাদেবী ওর মনের সংশয়, ভয় ও অবিশ্বাস দূর কবার জন্য ঠাকুরের খাওয়ার থালাটা ওর হাতে দিয়ে বলল : ওঁর খাওয়াটা তুই বরং নিয়ে যা। আমি তোর সঙ্গে

আছি।

বসার আসন পেতে দিল ঠাকুরকে। গ্লাস ভরে জল দিল। তারপর ঠাকুরের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে থালাখানা রাখল। পূজো নৈবেদ্য সাজানোর মত করে গভীর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ব্যঞ্জনগুলো তাঁর থালার পাশে অর্ধগোলাকৃতি করে সাজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেল। সারদাদেবী দেখলেন একটা শুদ্ধ আত্মনিবেদনের বিনম্র আকুতি ফুটে উঠল তার সেবায়। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করার সময় ঠাকুরের অনন্ত মহিমার পায়ে নিজেকে নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। ঢিপ্ ঢিপ্ করে মাটিতে মাথা ঠুকে সে যখন উঠে গেল তার দু'চোখের কোণে জলের ধারা চিক চিক করছে!

মুখ ব্যাজার করে ঠাকুর থালা নিয়ে বসে রইলেন। সাবদাদেবী তাঁর কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসছেন! মেয়েটি চলে গেলে ঠাকুর বললেন : হ্যাঁ-গা তুমি তো জান, কৈবর্তের অন্ন খাই বলে নিজেকে কত গালমন্দ করি। তবু ঐ খারাপ স্বভাবের ছোট জাতের মেয়েটাকে দিয়ে দুপুরের খাবারটা পাঠালে? ওর ছোঁয়ায় বাপু, আমি খেতে পারব না।

মায়ের অধরে কৌতুকের হাসি! তালপাতার পাখা নাড়তে নাড়তে বললেন : আমি যে মা। আমি কী করতে পারি বল? কেউ যদি সন্তানের দাবি নিয়ে মা বলে ডাকে, তা-হলে সাড়া না দিয়ে আমি থাকতে পারি? ঠাকুর তো আমার একার নয়, সবার। ঠাকুরকে খাওয়াবে বলে মায়ের হাত থেকে যদি কোনো মেয়ে থালা কেড়ে নেয়, মা হয়ে তাকে না বলে ফিরিয়ে দিতে পারি? ওর কোথায় ব্যথা, কোথায় দুঃখ এবং কী করলে আনন্দ পায়, মা হযে যদি সেই কথাটা না বুঝি তা-হলে মা হলাম কিসে? ওর সাধ পূরণের জন্য আজ তুমি খেয়ে নাও।

সুবোধ বালকের মত মাথা নেড়ে ঠাকুর বলল : তা নয় নিচ্ছি, কিন্তু আর কোনোদিন যদি ও খাবার বয়ে আনে তাহলে কিন্তু ছোঁব না।

সারদাদেবী এক গাল হেসে বলল : তা কখনও হয়। এতবড় কঠিন প্রতিজ্ঞে আমি করতে পারব না বাপু। আমায় মা বলে চাইলে, আমি তো থাকতে পারব না। মা হওয়া কী মুখের কথা!

তারপর সারদাদেবী ঠাকুরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। সূর্য থাকে আকাশে, জল থাকে নিচুতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয় ওগো সূর্য তুমি আমাকে ওপরে তুলে নাও? সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে উপরে তুলে নেয়। তুমি তো পতিতপাবন। এটুকু পার না? আমাকে পরীক্ষা করা কি তোমার শেষ হয়নি? আর কত বাজাবে?

ঠাকুর নির্বাক। মাথায় হেঁট করে সুবোধ বালকেব মত অন্ন ভোজনে মন দিলো।

মার্গারেটের আশ্চর্য লাগে কত কোমল ব্যক্তিত্ব দিয়ে কত সহজে মানুষকে বশীভূত করেছেন সারদামণি। নিজের মত করে তাদের গড়েপিটে নিয়েছেন তিনি। মায়ের সান্নিধ্যে সন্তানদের নবজন্ম হয়েছে। কারণ সারদাদেবী ছিলেন শুধুই মা। তাঁর

জাত ছিল না। সবাই মায়ের সন্তান। হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু ছিল না তাঁর। বিচার না করে মা সকলকে কোল দিয়েছেন। সারদানন্দজীর কাছে শুনেছিল জয়রামবাটীর কাছে একটি মুসলমান পল্লী ছিল শিরোমণিপুর। তুঁত এবং রেশমের চাষের জন্য গ্রামের খ্যাতি ছিল খুব। বিলিতি রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রেশম শিল্প ধ্বংস হয়। রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হল চাষীদের। বাধ্য হয়ে চুরি, ডাকাতির পথে গেল তারা। আইনের চোখে এরা আসামী। লোকে এদের ঘৃণা করে, খেত-খামারে কাজ পর্যন্ত দেয় না। গৃহস্থের বাড়িতে কাজ চাইতে গেলে আতঙ্কে দরজা বন্ধ করে দেয় তারা। এক দুঃসহ অবস্থা হল তাদের।

কিন্তু সারদাদেবীর কাছে সবার দরজা খোলা ছিল। একদিন আমজাদ নামে এক জেল খাটা ডাকাত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাগানের দুটো কলা নিয়ে মায়ের দরজায় এসে দাঁড়াল। বিনীতভাবে বলল : মা গো তোমার অধম সন্তান ঠাকুরের সেবার জন্য বাগানের দুটো কলা এনেছে। তুমি নেবে মা! মুসলমানের ছোঁয়া তো। এমনভাবে বলল, যেন অপরাধ রাখার জায়গা নেই তার।

তার কথা শুনে সারদার মনটা কেঁদে উঠল। বাছা, ভাল মনে তুমি দুটো ফল এনেছ ঠাকুরকে ভোগ দেবে বলে আমি ফিরিয়ে দেব কেন?

মা গো আমি যে মুসলমান।

তার কথা শেষ হওয়ার আগে একজন মায়ের ভক্ত বলল : মা, ও দস্যু। চোর। ডাকাতি করে বেড়ায়। ওর ছোঁয়ায় ঠাকুরকে দেবে?

সারদাদেবী হাসি হাসি মুখে ওর কথা শেষ হওয়ার আগে বলল : ও আমায় মা বলে ডেকেছে। ও মুসলমানও নয়, চোর-ডাকাতও নয়-- আমার ছেলে। ছেলে ভালমন্দ যাই হোক, মা কি তাকে ফেলতে পারে? নাড়ী ছেঁড়া ধনকে কী করে অস্বীকার করি বল। বলে, ওর হাত থেকে কলার ঝুড়িটা নিজের হাতে নিলেন।

তারপর তাকে বসিয়ে গুড়-মুড়ি খাওয়ালেন। যে তাকে গুড়-মুড়ি দিচ্ছিল পাছে ছোঁয়া লাগে তাই দূর থেকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল।

সারদা রেগে গিয়ে বললেন : কী দেয়ার ছিরি রে বাপু। অমন করে মানুষকে দিতে আছে? অশ্রদ্ধা করে দিলে খেয়ে সুখ হয়?

মেয়েটি বলল : ও যে মুসলমান!

সারদাদেবী বললেন : ওকে আমি জানি। তুই যদি দিতে না পারিস আমি দিচ্ছি। বলে, মা তার হাত থেকে মুড়ির ধামা আর গুড়ের বাটি কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়ালেন। আঁচল দিয়ে ওর ঘামটা মুছে নিলেন। আমজাদ খাবে কি? মায়ের স্নেহ-মমতা পেয়ে তার চোখ ছলছল করে উঠল। এত যত্ন এত আদর তার নিজের মায়ের কাছে পায়নি। মা ওর কথা টের পেয়ে বললেন : বোকা ছেলে। অমন করে চোখ ভরা জল নিয়ে দেখার কি আছে? আমি যে মা।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল লোকটি নিজের এঁটো পাড়তে গেলে সারদা তার হাতখানা ধরে ফেললেন। উঁহু মা থাকতে তুমি করবে কেন বাবা? এতো মায়ের কাজ। বলে নিজের হাতে এঁটো পরিষ্কার করতে লাগলেন। মেয়েটি তখন বলল : এ তুমি কি করছ? হিন্দু বামুনের ঘরে মেয়ে হয়ে মুসলমান দাগী আসামীর এঁটো ঘাঁটছ? তোমার কি মাথা খারাপ হল।

সারদাদেবী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন : মা ছেলের সম্পর্কের মধ্যে তুই কথা বলার কে? শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন আমার ছেলে আমজাদও আমার তেমন ছেলে। আমার ছেলেদের হিন্দু মুসলমান নেই। তারা শুধুই ছেলে।

মার্গারেটের বুকের ভেতরটা আবেগে কম্পিত হল। ভারতের সন্ন্যাসীর কথাই ঠিক। সারদাদেবীর মত মায়েরাই পারে কুসংস্কার এবং জাতপাতের অভিশাপ থেকে এদেশকে মুক্ত করতে। তাই রাজা তাকে আহ্বান করে বলেছে, পুরুষ নয়, সিংহিনীর মত শক্তিময়ী একটি নারী চাই। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানব প্রেম, সংকল্পের দৃঢ়তা, সবচেয়ে বড় কথা তোমার কেল্টিক রক্তের তেজ-এইসব আছে বলে এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই। মার্গারেটের বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে অস্থির করল। রাজার এই অনুভূতিকে কি বলবে? শুধু দৃষ্টিপাতমাত্র তার সম্পর্কে এত বড় প্রত্যয় জাগল কী করে? শুধু তাই নয়, একটা দাবিও জন্মেছে ভারতের সন্নাসীর। নইলে মন উজাড় করে এমন অসংকোচে নিজেকে নিবেদন করতে পারতেন না। কয়েকবারের দেখাশোনায় এত অকপটে কেউ বলতে পারে যখনই ইচ্ছে হবে সুযোগ মিলবে, আমায় চিঠি লিখো। যা মনে আসে তাই লিখো, তোমার কোনো কথাই ভুল বুঝব না, অবুঝ হয়ে উড়িয়ে দেব না।

মার্গারেটের বুকের ভিতরটা আলোড়িত হল। এসব কথার মানে কি? মন দিয়ে যখন একান্ত করে কাউকে চাওয়া যায় কেবল তখনই এসব কথা বলতে ভাল লাগে। একটা অকপট আন্তরিকতায় মুড়ে দেওয়া তাঁর ভাললাগা। তার মধ্যে মিথ্যে নেই। তাঁর ভাললাগা সাধারণ মানুষের মত নয়। ভালবাসাটা তাঁর নিজের জন্য। হয়তো সেইটা তাঁর জন্য যত নয়, তার চেয়ে বেশি তাঁর দেশের জন্য। সেও-বা কম কিসে?

হঠাৎ তার তন্ময়তা ভেঙে খান খান করে দিয়ে জাহাজের ভোঁ বেজে উঠল। ঐ ভোঁ নিঃসীম মুক্তির উল্লাস হয়ে মার্গারেটের অন্তর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে নিখিলময় ছড়িয়ে পড়ল।

চব্বিশে জানুয়ারিতে স্বপ্নের ভারতবর্ষের মাটি স্পর্শ করল যাত্রীবাহী জাহাজ মোম্বাসা। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় সমুদ্রতীর ঝলমল করছে তখন। রোদের তেজ বেশ প্রখর। শীতকাল বলেই মার্গারেটের পক্ষে রোদের মধ্যে ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রোপকূল দেখা সম্ভব হচ্ছিল। বিবেকানন্দের ভারতবর্ষকে দেখবার জন্য বিশ দিন ধরে সে প্রতীক্ষা করে আছে। আকুল চোখ মেলে তীরের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু দেখার কোনো বস্তুই চোখে পড়ল না। পড়বে কি করে? তীর থেকে জাহাজ এত দূর দিয়ে যাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল একটা নীল ক্যানভাসের ওপর সবুজ রঙের মোটা তুলি রেখা দিয়ে শিল্পী যেন কিছু বোঝাতে চাইছে। দূর থেকে গাছপালার শ্রেণী যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম আকার-প্রকারহীন সবুজ রঙ কোথাও মোটা, কোথাও ক্ষীণ হয়ে দিগন্তের সঙ্গে লেপ্টে আছে। মার্গারেটকে বেশ কিছু হতাশ হতে দেখে জাহাজের ক্রু আইরিশ যুবক জন তার দূরবীনটা তাকে দিয়ে বলল : তোমার স্বপ্নের ভারতবর্ষকে দেখ।

মার্গারেট অবাক হয়ে দেখতে লাগল তটরেখায় সমুদ্রের ঢেউগুলো বালিতে দুষ্টু ছেলেদের মত জল ছিটিয়ে খেলা করছে। নানা রঙের পাখি তীরভূমির ওপর চলছে ফিরছে। তাদের ডানার ওপর রোদের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। তীরভূমি জুড়ে নারকেল গাছের সারি। ছোট ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল। কৃষ্ণচূড়ার গাছ ভরতি গাঢ় লাল রঙের ফুল অগ্নিশিখার মত লক্‌লকিয়ে দুলছে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট চালাঘর চোখে পড়ল দু'একটা। সেগুলো শুধু জীর্ণ নয়, সর্বত্র দারিদ্র্যের ছাপ প্রকট।

তীরে যারা মাছ ধরার জাল শুকোতে দিয়েছে তাদের পরনে নেংটির মত পরা একফালি বস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই। কালো কালো মেয়ে পুরুষ যাদের সে দূরবীনে দেখল প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। একটা গোটা দিন ধবে সে সমুদ্রতীরের জনপদ দেখল। জাহাজ যতক্ষণ না মাদ্রাজ বন্দরে নোঙর করল ততক্ষণ সে ভারত দর্শন করল। বহুকাল ধরে যে ভাবতবর্ষ ছিল তার কল্পনার এবং স্বপ্নের তাকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে প্রত্যক্ষ করল।

জাহাজের ঘন ঘন ভোঁ শব্দে তার তন্ময়তা ভঙ্গ হল। বন্দরের মুখে সমুদ্র শান্ত। জাহাজের গতিও মন্থর হল। এধার ওধারে আরো অনেক ছোট-বড় জাহাজ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ত্রিকোণ পাল তোলা লম্বা নৌকো, চ্যাপ্টা গড়নের ভারী মালবাহী নৌকোও নোঙর করেছিল। এদের পাশ কাটিয়ে মোম্বাসা জাহাজ জেটির সামনে এসে দাঁড়াল। তখন ভারতীয় সময় সকাল দশটা।

মার্গারেট দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। এই সে পুণ্যভূমি যেখানে তার গুরু একবছর আগে পাশ্চাত্য বিজয় করে পদার্পণ করেছিল। সেদিন বিশ্বজয়ী পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দকে দেখার জন্য তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য, হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য হাজারে হাজারে মানুষ এই বন্দব ছেয়ে ফেলেছিল। টানা একটা মাস জলের সমুদ্র পেরিয়ে এসে পডলেন এক বিশাল জনসমুদ্রে। সমগ্র মাদ্রাজ তাঁর অভ্যর্থনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজি জাহাজের ডেক থেকে নেমে এলেন জেটিতে। উষ্ণ অভিনন্দনের সেই দিনটার কথা ভাবতে মার্গারেটের প্রতি রোমকূপে শিহরন খেলে গেল।

কল্পনায় সে দেখছিল জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে নামছেন স্বামীজি। পরনে সেই কালো আলখাল্লার মত পোশাক, মাথায় কমলা রঙের পাগড়ি, কোমরে হলুদ রঙের কোমরবন্ধ। মনে হল স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে যেন রাজেন্দ্র ইন্দ্র নেমে আসছেন মর্তে। চতুর্দিক থেকে তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ হতে লাগল। জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে যেন হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করছে। বন্দর থেকেই স্বামীজিকে নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের হল। স্বামীজিকে বসান হল একটা ঘোড়ার গাড়িতে। কিছু দূর যাওয়ার পর খুলে দেওয়া হল ঘোড়াগুলোকে। জনতাই গাড়ি টানতে লাগলো। একটার পর একটা বিশাল সুসজ্জিত তোরণ পেরিয়ে স্বামীজির শোভাযাত্রা চলল। স্বামীজির জন্যই মাদ্রাজের উৎসাহী তরুণেরা এই তোরণগুলি করেছিল। তোরণের কাছে শোভাযাত্রাসহকারে স্বামীজি যেই পৌঁছেছেন, অমনি অনুরাগী ভক্তবৃন্দ হৃদয়ের ডালি সাজিয়ে পূজার থালায় ফুল-ফল দিয়ে স্বামীজিকে নিবেদন করেছে। কোথাও কোথাও মন্দিরের বিগ্রহের মত ফুল দিয়ে পুজো করেছে। দীপ নিয়ে তাঁর আরতি করেছে। চামর দুলিয়ে ব্যজন করেছে। স্বামীজি প্রশ্ন করেছেন এ তোমরা কি করেছ? আমি কে? আমি ঈশ্বর নই। কোনো দেবতা নই। এক নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী মাত্র। তাহলে এ পূজা

তোমরা কাকে করছ? তোমাদের হৃদয়ের এ অর্ঘ্য আমাকে মানায় না।

প্রত্যুত্তরে উৎফুল্ল জনতা উল্লসিত হয়ে হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনি দিয়ে বলেছে-- এ পূজা হিন্দুধর্মকে হিন্দুধর্মের পতাকাবাহী শ্রমণকে। হিন্দুধর্মকে বিশ্বধর্মের সিংহাসনে বসিয়ে যিনি বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন সেই যুদ্ধজয়ী সেনাপতিকে। আমাদের হৃদয়ের রাজাকে অভিনন্দন করছি। অমনি একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতির বিদ্যুৎ শিহরন মার্গারেটের শরীর মন ছুঁয়ে গেল। এক অদ্ভুত ভালো লাগার আবেশে নিরুচ্চারে নিজের মনে অভিভূত গলায় উচ্চারণ করল : রাজা! আমার রাজা!

অমনি সারা গা সির্ সির্ করে উঠল। লোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। আশ্চর্য, ঐ নামের মধ্যে কী যাদু আছে মার্গারেট জানে না। তবে ঐ নাম মনে হওয়া মাত্র প্রাণে আরাম, মনে আনন্দ এবং আত্মার এত শান্তি হয় যে দু'চোখ বুজে আসে। এর নামই কি প্রেম? এই প্রেমের নাম কি? একি গুরুর প্রতি তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা! মার্গারেট চোখ বুজে আছে। চোখ খুলতে ইচ্ছে করলো না। বরং চোখ বন্ধ করে থাকলে দেখতে পায় সবুজ শ্যামল একটা দেশ, গাছ-গাছালিতে সুশোভিত, ঊর্মিমুখর নদীর ধারে একটি মন্দির, মঠবাড়ি। মঠবাড়ির বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির এক পাশ দিয়ে উঠে গেছে লবঙ্গ লতিকার গাছ। থোক থোক ফুল ফুটে আছে পাতায় পাতায়। আর তার পাশেই একটা কক্ষ। ঘরের এক কোণে রাখা টেবিলের ওপর ঝুঁকে ভারতের সন্ন্যাসী নিবিষ্ট হয়ে লিখছে। পরনে গেরুয়া বসন, গায়ে কমলা রঙের উত্তরীয়। ওঁর কোঁকড়া চুলের ওপর ভোরের আলো থমকে আছে। তিনি আপন মনে লিখছেন আর গুন গুন করে গাইছেন:

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে

এই গান ইংলন্ডে তাঁর মুখে একবার শুনেছিল মার্গারেট। সেই সুরের রেশ লেগে আছে তার কানে। ঐ গানের সময়, মুহূর্তে সন্ন্যাসীর ভাবান্তর হত। অনন্ত মহিমার কাছে নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটত।

মার্গারেটের আশ্চর্য লাগে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। মহৎ, উদার পবিত্র অনুভূতির মধ্যে চেতনার মধ্যে, আত্মার মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করে-- অনলে অনিলে জলে, মধুপ্রবাহনী চলে, বলে মধুরং মধুরং। মার্গারেটের বুকের ভিতরে এক অদ্ভুত শিহরন ঢেউ খেলে গেল। সারা শরীরটা থর থর করে কাঁপল। মনে হল নিজের কাছে যেন সত্যভঙ্গ করছে সে। কিন্তু কি সে সত্য? প্রশ্নটা মার্গারেট নিজের কাছে করল। নিজের মনে মাথা নেড়ে বারংবার বলল : জানি না, জানি না।

বোধ হয়, এই গভীর অনাস্বাদিতবোধই তাকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলেছিল। এই মুহূর্তে মার্গারেট বুঝতে পারল বহুবিধ দায়দায়িত্বের দ্রুত সমাধান করে ইংলন্ড থেকে ভারতে যাওয়ার ইচ্ছে কেন এত প্রবল দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল তার।

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে গেল মানুষের চেঁচামেচি, হাঁকডাক, কোলাহল। ডেক

থেকে নামার সময় ঠেলাঠেলি ও দৌড়দৌড়ির এক অভূতপূর্ব দৃশ্য মার্গারেটের সব নজর কেড়ে নিল। বন্দরেও অপেক্ষামান বিরাট জনতা। অবতরণরত যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে কয়েকশ' হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে রুমাল নাড়ছিল। কেউ বা বিশেষ ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করার জন্য ফুলের মালা নিয়ে ভিড় ঠেলে জাহাজের সিঁড়ির দিকে অগসর হতে লাগল। মার্গারেট অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যেককে দেখছিল। কিন্তু তার জন্য কেউ আসেনি জাহাজঘাটে। এদের কাউকে সে চেনে না। একটা চেনা মুখও চোখে পড়ল না। তবু সেজন্য কোনো ক্ষোভ ছিল না তার। বরং আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে যে, অনাত্মীয় মানুষগুলো সঙ্গে যেন অনেককালের সম্পর্ক তার। বড় আপনার বোধ হয়।

যাত্রীদের একটা বড় অংশ মাদ্রাজ বন্দরে নামল। লোক একটু হাল্কা হলে, হাই হিল জুতোর খট্‌খট্ শব্দ করে মার্গারেটও ডেক থেকে জেটিতে নেমে এল। একবছর আগে স্বামীজিও এই জাহাজেই লন্ডন থেকে কলম্বো হয়ে এখানে এসেছিলেন। হয়তো যেখানে পা রেখেছে সে, সেখানে তিনিও পা রেখেছিলেন প্রথম। এর মাটিতে এখনও স্বামীজির চরণরেণু লেগে আছে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদেশ প্রত্যাগত গুরুকে সে দেখতে পাচ্ছিল। গুরুর পায়ের চিহ্ন খোঁজে মাটিতে। সে চিহ্ন বাস্তবে কোথাও ছিল না। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল জ্যোতির্ময় সেই মহান পুরুষের পদরেখা জেটির মেজেতে লুকোনো আছে। তাকে দেখার একটা বিশেষ চোখ ছিল যেন তার। এই অনুভূতি হঠাৎ বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর হয়ে তার হৃদয়ের ভেতরে সেতারের মধুর ঝংকারের মত বাজতে লাগল : তুমি যে আইরিশ, একজন ইংলন্ডবাসী কিংবা একজন স্ত্রীলোক, এগুলো আকস্মিক ঘটনা। আসলে চিরকালই তুমি ভগবানের সন্তান। দেবতার ক্ষমতা আছে তোমার। দিনরাত নিজেকে প্রশ্ন কর, কে তুমি? নিজের স্বরূপ কখনও ভুলে যেও না। জীবনের গ্রন্থ যখন উন্মোচিত হয়, আসল মজা শুরু হয় তখন। সম্মোহিতের মত পুণ্যভূমি ছুঁয়ে সে গুরুর কল্পিত পাদপদ্মের চিহ্নে চুম্বন করল। তারপর স্বপ্নের ভারতভূমির ধুলো টিপের মত পরল কপালে।

ব্যস্ত যাত্রীরা যেতে যেতে একজন শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশিনীকে পূজারিণীর মত মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে ভারতের মাটি প্রণাম করতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকমুহূর্ত অবাক হয়ে সবিস্ময়ে নিজেদের প্রশ্ন করল : কে এই রমণী?

প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতেই গুডউইনের সঙ্গে মার্গারেটের চোখাচোখি হয়ে গেল। এখানে তার কোনো চেনা পরিচিত মানুষের সঙ্গে এভাবে আচমকা দেখা হবে ভাবেইনি। এখানে সবই অচেনা। অজানা জায়গায় তার মত সামান্য এক বিদেশিনীকে অভ্যর্থনা করতে আসবে কে? তাকে চেনেই বা কে? গুডউইনকে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গিয়ে সে হাতে স্বর্গ পেল যেন। ভীষণ ভালো লাগল। উপচানো আনন্দে সহসা আত্মহারা হয়ে গেল। একটা ছোট্ট আনন্দের বিদ্যুৎ মার্গারেটের শরীর মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল। উৎফুল্ল হয়ে বলল গুডউইন, তুমি আমাকে অভিনন্দন

জানাতে আসবে ভাবতেই পারিনি। তোমার দেখা পেয়ে কী ভালো যে লাগছে। তা তুমি এখানে কেন? স্বামীজি কোথায়?

গুডউইন তার উচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দিয়ে বলল : একটু আস্তে ম্যাডাম। হড়বড় করে একসঙ্গে এতকথা বললে জবাব দেই কি করে? দাঁড়াও একটু দম নিই আগে।

গুডউইনের কথা শুনে মার্গারেটের ওষ্ঠে হাসি ফুটে উঠল। গুডউইনও হাসল। বলল: ব্রহ্মবাদিন পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সাহায্য করতে স্বামীজির নির্দেশে মাদ্রাজে আছি। বলতে পার তিনিই পাঠিয়েছেন এখানে। তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো মার্গারেট?

ওর কথা শুনে মার্গারেট তো অবাক! কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওর দিকে কৃতজ্ঞ চোখে। গুডউইন বেশ বুঝতে পারছিল ঐ দু'চোখ ব্যাকুল হয়ে কাউকে খুঁজছিল যেন। জেটিতে কোথাও তার দেখা না পেয়ে সে যে একটু হতাশ হয়েছিল তার অভিব্যক্তি দেখেই বুঝল গুডউইন।

স্বামীজিকে মার্গারেটের আশ্চর্য মানুষ মনে হয়। সব দিকেই তাঁর লক্ষ্য। একা একজন মেয়েমানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসছে বলে তার জন্য কত উৎকণ্ঠা তাঁর। বেশ একটু আত্মগর্ব হল মার্গারেটের। নিজেকে শুনিয়ে মনে মনে বলল : যে মেয়ে তার জন্য জীবন দিতে পারে তার জন্য এই উদ্বেগটুকু তো সে প্রত্যাশা করে। মনের এই টানটুকুর জন্য তো সব ফেলে আসা। কলকাতার বন্দরে পা রাখার আগে এটুকু পাওয়া খুব দরকার ছিল। মনের খুশি চাপতে না পেরে গুডউইনকে বলল : আমি জানতাম উনি কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই। তিনি তো গভীর করে জানেন আমার কি দরকার, নইলে মনে হত আমি এক মিথ্যে স্বপ্নের পিছনে দৌড়েছি।

গুডউইন বলল : জান মার্গারেট, যারা জীবনে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তারাই শুধু জানে, কোনো কোনো ঘটনা বাইরে থেকে যা দেখায় তাই তার যথার্থ রূপ নয়। বাইরের আচরণে তাঁকে কঠোর মনে হলেও তাঁর মত কোমলপ্রাণ দরদী মনের কর্তব্যপরায়ণ মহান মানুষ জীবনে আমি খুব কম দেখিছি।

মার্গারেট বলল : তোমার চেয়ে বেশি সে কথা জানে কে? স্বামীজি আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে যখন বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, তখন তুমিই প্রথম মানুষ যার মনে হয়েছিল এতবড় আধ্যাত্মিক সম্পদ লিখে রাখা দরকার। স্বামীজির আর্থিক অক্ষমতার কথা জেনে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর বক্তৃতাগুলি তোমার শর্ট হ্যান্ডের সাংকেতিক রেখায় ধরে রাখলে। সংসারে তুমিই একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। তোমার আয়ে সংসার চলে। তবু বিশ্বের কল্যাণের কথা ভেবেই নিজের রুজি-রোজগার ছেড়ে স্বামীজির বক্তৃতাগুলিকে অক্ষর বন্দী করে রাখলে। স্বামীজির রচনাভাণ্ডার তোমার জন্যই অক্ষয় হয়ে রইল। তোমার এই নিঃস্বার্থ আত্মদান এবং মহান শ্রদ্ধার কোনো তুলনাই হয় না।

মার্গারেট স্বামীজির মধ্যে আমি ভালোবাসার মানুষ খুঁজে পেয়েছি। আমার

সংসারের লোকজনের কষ্ট হবে ভেবে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বাড়িতে টাকা পাঠাতেন। জান, মার্গারেট টাকার জন্য কত জায়গায় ঘুরলাম তবু কি অভাব ঘুচল? অল্পবয়স থেকে রোজগারের চেষ্টায় ঘুরছি চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত। কত জায়গায় ঘুরলাম, কত লোকের সঙ্গে মিশলাম—সবাই কাজ করিয়ে নেয়, দাম চুকিয়ে দেয়-- ব্যস্ সব চুকে গেল। সম্পর্কের কোনো ব্যাপারই নেই। বুকের মাধুরী মিশিয়ে দুটি কথাও বলে না কেউ। ভালোবাসাও দেয় না। প্রাণহীন আমেরিকায় স্বামীজিই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তি যিনি আমার মনের সব শূন্যতা এবং অপ্রাপ্তি ঘুচিয়ে দিতে পারলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কতকালের চেনা। হৃদয় জুড়িয়ে গেল। মন ভরে উঠল। এমন আপন করে টেনে নিতে পৃথিবীতে আর একটি লোকও পাইনি। ঐ টানেই সব ছেড়ে চলে এলেম ভারতে।

মার্গারেট মন দিয়ে ওর কথাগুলো শুনল। ইংলন্ড আমেরিকার মানুষ যে ভালোবাসার জন্য সত্যি কাঙাল। ভেতরে ভেতরে তারা কত রিক্ত এবং একা স্বামীজি না এলে বোধ হয় এমন গভীর করে অনুভব করা হত না। স্বামীজি তাদের ব্যথার জায়গায় পরম মমতার প্রলেপ দিয়ে সব কষ্টের উপশম করে দিয়েছেন। অজান্তেই তার চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা নামল। বলল : তুমিও কম আশ্চর্য নও গুডউইন। একজন বিদেশী সন্ন্যাসীর জন্য কোনোরকম পারিশ্রমিক না নিয়ে তুমি যা করেছ, ক'জন তা করে?

উহুঁ, ও কথা বল না। ওঁর তুলনায় কতটুকু আমি দিয়েছি। আমি যা করেছি নিজের জন্য, আর উনি যা করছেন তা বিশ্ববাসীর জন্য। ওঁর মত মহাপ্রাণ করুণা করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর চলার পথে সঙ্গী করে নিয়েছেন, আমাকে কাজের অধিকার দিয়েছেন। ভাই বলে, বন্ধু বলে কাছে টেনে নিয়েছেন এত ভালোবাসা ক'জন পায়? আমার সৌভাগ্য ভারত প্রত্যাবর্তনের আমি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলাম। এখনও পর্যন্ত তাঁর সব কিছুর অন্যতম সঙ্গী হয়ে আছি। ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমার এমন ভালোবাসা দিয়েছেন! উনি সব সময় বলেন : গুডউইন আমি শুধু মানুষ চাই। টাকা বা ক্ষমতা আমি চাই না-- শুধু মানুষ চাই। বিরাট, শক্তিশালী মানুষ চাই। তাহলে বুঝতেই পারছ আমরা ঐশ্বর্যবানকেই ভালোবেসেছি। স্বামীজিই আমার প্রভু, আমার জীবন্ত ঈশ্বর। কল্পনা কর স্বয়ং ঈশ্বর, আমরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁকে পুজো করা ছাড়া উচ্চতর আর কোনো কাজ আছে? তাঁর চরণতল ছাড়া মহত্তর আর কোনো ঠাঁই আছে কামনা করবার?

গুডউইনের কথা শুনতে শুনতে মার্গারেট অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। কল্পনায় সে দেখছিল মঠবাড়িতে একা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে স্বামীজি গঙ্গার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে কারো প্রতীক্ষা করছেন যেন-- পরনে তাঁর সাদা সিল্কের গাউন, আর কপালের ওপর সামনের দিকে তুলে দিয়ে ফাঁপানো টান টান করে বাঁধা বাদামি রঙের সোনালী চুল।

তিন

মোম্বাসা যাত্রীবাহী জাহাজ কলকাতা বন্দরে কবে পৌঁছবে রোজই তার খোঁজ-খবর করেন বিবেকানন্দ। ঐ জাহাজে রয়েছে তাঁর স্বপ্নচারিণী। ভারতের নারী সমাজের জন্য একজন আসল সিংহিনী। সেই সিংহিনী স্বেচ্ছায় ধরা দিতে আসছে ভারতে। অধীর আগ্রহে বিবেকানন্দ তার প্রতীক্ষা করে আছেন। মার্গারেটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় যেকথা কোনোদিন বলতে পারেননি, চিঠিপত্রে গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে তার অনেক কথাই বলেছেন। সেসব কথার অর্থ মার্গারেট কিভাবে নেবে, তিনি জানেন না। কিন্তু ঐ কথাগুলি অকপটে বলতে পারার জন্য তাঁর জীবন যথার্থ তৃপ্ত হয়েছিল, তিনি শান্তি পেয়েছিলেন।

মার্গারেটের আগমনের দিন তাই যত নিকটবর্তী হয় ততই তাঁর মধ্যে একধরনের চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়। বাইরে থেকে তাঁর মনের অশান্ত অস্থিরতা এবং উদ্বেগকে কেউ আঁচ পর্যন্ত করতে পারে না। স্বামীজি তাঁর ভাবনার একজন নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। তাই একাই সব কিছু ভাবতে হয় তাঁকে। কারণ মার্গারেট ছাড়া আরো যে দু'জন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা আমেরিকা থেকে কয়েকদিনের মধ্যে এসে পড়বে, তাঁরা সবাই তাঁকে চেনে ও জানে। তাঁর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তারা ভারতবর্ষে আসছে। তাঁর ওপরেই তাদের নির্ভরতা। নিজের দেশ, সমাজ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে একটা প্রত্যাশা নিয়ে এদেশে আসছে। বিদেশ বিভুঁইতে তারা নিঃসঙ্গ। পরিচিত ব্যক্তি বলতে কেউ নেই। চেনা মানুষ এবং বন্ধু বলতে তিনিই

আছেন শুধু। তাঁকে ভরসা করে, বিশ্বাস করে, সুদূর ইউরোপ থেকে বহু ক্লেশ এবং কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা আসছে। তাদের এই আগমন তাঁর কাছে যে কত বড় জয় এবং সাফল্য তা তিনিই জানেন।

বিদেশিনীরা আসছে কাজ করতে। তারা যদি কাজের পরিবেশ না পায় তাহলে আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে তাঁদের। এদেশের কাজে তাদের ঠিকমত লাগানোর বহুবিধ বাস্তব অসুবিধা ও সমস্যাই তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। যে শক্তি, সাহস, উদ্দীপনা, আগ্রহ এবং স্বপ্ন নিয়ে তারা বঙ্গদেশে আসছে তাকে যথাযথ পরিচালনা করা এবং উদ্যোগের সদ্ব্যবহার করার ওপরেই নির্ভর করছে এদের আগমনের সাফল্য। এই সাফল্যের পথ ধরেই আসবে এদেশের সমাজ সংস্কৃতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে রূপান্তর। কিন্তু এদের কর্মের পথ যে মসৃণ নয় স্বামীজি ভালো করে জানেন। অনেক বাধা-বিপত্তির ছায়ানিবিড় এলাকা পায়ে পায়ে মাড়িয়ে নির্ভয়ে অকম্পিতচিত্তে এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখিয়ে তবেই সাফল্যের পাহাড় চূড়োয় পৌঁছবে। কিন্তু সেজন্য অনেক ধৈর্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতার দরকার। তা কি এঁরা পারবেন দেখাতে? এজন্য বিদেশিনীদের অনেক অপমান, ঘৃণা, বিদ্রূপ সহ্য করতে হবে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত দেশের কাজ করার জন্য অনেক মূল্য হয়তো তাঁদের দিতে হবে। এত মূল্য তারা দেবে কেন? এই সংশয় স্বামীজির মনেব অভ্যন্তরে এক জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব সূচনা করে। নিরতিশয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য তাঁকে ভিতরে ভিতবে অস্থির কবছিল।

কিন্তু মার্গারেট সম্পর্কে সত্যিই বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ আছে কি? সহসা প্রশ্নটা নিজেকে কবলেন বিবেকানন্দ। এই মহিলাব সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর একটা গভীর মিল আছে। মার্গারেটের মত তিনিও ছিলেন সংশয়বাদী। যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাস, মূর্তিপূজাব নাম শুনলে তাঁর রাগ হত, ভুরু কুঁচকে যেত। সারা শরীরের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হত। মার্গারেটের অন্তর্জীবনের কথা তাঁর অবশ্য জানা নেই, তবে ডেকার্তের অহংবাদ, হিউমের নাস্তিক্যবাদ, ডারউইনের বিবর্তনবাদ মার্গারেটের উপলব্ধির জগৎটাকে বদলে দিয়েছিল। যুক্তি তর্ক দিয়ে জীবন ও মননের অমীমাংসিত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছিল সে। ঠিক এরকম একটা অবস্থা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তাঁর সত্তাব মধ্যে ছিল। সেন্ট জেমস রোডে লেডি ইসাবেলের বৈঠকখানা গৃহে মার্গারেটকে প্রথম দেখে গুরু রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের প্রথম দিনটি ভীষণভাবে মনে পড়েছিল। গুরুকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে। আর সে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে গঙ্গার পাড়ে রামকৃষ্ণের ঘরে হাজির হয়েছিল। যুবক নরেন তক্তপোষের ওপর সাদা চাদর পাতা বিছানার ওপর বসে আছে ন্যালা খ্যাপা এক আধপাগলা মানুষ। পরনে তাঁর নরুন পাড়ে ধুতি, খালি গায়ে একটা উড়ুনি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, শীর্ণ দেহ। তাঁকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে বসে আছে বেশ কিছু ভক্ত। তাঁকে দেখে নরেন তো অবাক। এ কেমন সাধু। লোকে

না বললে একজন অভাবী সাধারণ মানুষ মনে হবে। প্রথম দর্শনে মানুষটিকে মনে ধরল না। বরং অবাক লাগল এই মানুষটির আছে কি, যা দেখে এত মানুষ পাগল হয়! অপছন্দ এবং বিস্ময় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘরে ঢুকল নরেন। বন্ধুরা তাকে গায়ক বলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিল। বলল : এ হলো সিমলের নরেন দত্ত। আপনাকে দর্শন করতে এসেছে। খুব ভাল গান গায়।

রামকৃষ্ণের দুই চোখে খুশির বন্যা। বিগলিত হেসে বললেন : বেশ বেশ। তা-হলে তো এখনই নরেনের গান শুনতে হয়। তা বাবা একটা গান শোনাও। আরে লজ্জা কি? গান তো শুধু গাওয়ার জন্য নয় শোনানোর জন্য। ফুল তো শুধু নিজের জন্য ফোটে না, -- অন্যকে আনন্দ দিতে, দেবতার পুজোর অর্ঘ্য হতে যে ফুল না পারে তার ফুল জন্মই বৃথা। তুমি বাপু মায়ের গান গাও। মার কাছেই ছেলের কোনো লজ্জা নেই।

নরেনের বাক্‌শক্তি রহিত হল। ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। চোখের পলক পড়ে না। সহসা কণ্ঠ থেকে নির্গত হল বাণী ও সুরের নির্ঝর।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?

দুচোখ বুজে প্রাণমন ঢেলে দরদ দিয়ে গাইল নরেন। তার নিজের চোখের কোণেই জলের ধারা।

গান শেষ হলে, নরেন চোখ খুলে দেখল : রামকৃষ্ণের চক্ষু স্থির। শরীর নিস্পন্দ। গান শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে গিয়েছেন তিনি। তন্ময়তার ভাবটা কাটতেও সময় লাগল। তারপর ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। তক্তপোষ থেকে নেমে এসে সহসা নরেনেব হাত দু'খানা ধরে বলল : ও নরেন, তোর গলায় সুর আছে। তুই পারবি। মানুষের হৃদয় জয় করার শক্তি মা তোকে দিয়েছে। তোকে আমার চেনা হয়ে গেছে।

নরেন বোকা বোকা মত চেয়ে রইল। অনেকদিন পরে প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বুকের ভেতরটা যেমন উচ্ছ্বসিত হয় তেমনটাই আকুল হয়ে উঠল তাঁর ভেতরটা। বললেন : হ্যাঁরে এতদিন পরে কি আসতে হয়? কতদিন ধরে তোর পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছি আর তুই পালিয়ে বেড়াচ্ছিস।

সাধুর কথা শুনে নরেন তো হতবাক। নরেনের কিছু বলার আগেই বললেন : মুখখানা তোর শুকিয়ে গেছে। খুব তেষ্টা পেয়েছে নারে? আমার সঙ্গে আয়।

সম্মতির অপেক্ষা না করেই হাত ধরে নরেনকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে নিজের হাতে জল গড়িয়ে দিয়ে কিছু মিছরি আর সন্দেশ দিয়ে বললেন : এটুকু খেয়ে নে। অনেকটা পথ যাবি। পেটে খেলে পিঠে সয়।

নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে সে পথ হাঁটতে লাগল। মানুষটা

বড় অদ্ভুত। মায়ের দরদ, মমতা তাঁর বুকে। সে যখন সিমলার বাড়িতে পৌঁছুল তখন মনে হল, সারা শরীরে রামকৃষ্ণের ঘোর লেগে আছে। তারপর থেকে ঐ ঘোর লাগা ভাবটা তাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলল যে মানুষটাকে কিছুতে ভুলে থাকতে পারে না। মনে মনে সেও সংকল্প করে, কিছুতে ঐ সাধকের কুহকে পড়বে না। ওঁর মায়ায় ধরা দেবে না। নিজের সঙ্গে অহরহ লড়াই করে। আর আশ্চর্য হয়, অন্য বন্ধুরাও তো ছিল, তবু তারা থাকতে তাকে নিয়ে ঠাকুরের এত ব্যাকুলতা কেন? সে তো তাঁকে বিশ্বাস করে না। তাঁকে মানেও না। মনের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে এতটুকু শ্রদ্ধাও নেই। তবু সর্বক্ষণ মনে হয়, ঐ মানুষটা ছাড়া তার চলবে না একদণ্ড। ঐ মানুষটা চুম্বকের মত টানছে তাকে। আর সে তার আকর্ষণ থেকে প্রাণপণ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। কিন্তু মানুষটা তাকে কিছুতেই সরে থাকতে দেবে না। তার প্রতি ঠাকুরের তীব্র ভালোবাসা, বুকভরা ব্যাকুলতা যে কেন তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। তার কাছে কোনো দাবি নেই তার। এমন নিঃস্বার্থ প্রাণাবেগ, বুকের টান, মমতাকে সে উপেক্ষা করে কি করে? ভক্তদের কাছে তাকে দেখতে না পাওয়ার অধীরতা শুনতে শুনতে তাব কান ভরে যায়, নিজের নিষ্ঠুরতার জন্য অপরাধী মনে হয় নিজেকেই। তবু জেদ ধরে থাকে নরেন। একদিন ভক্তের ভগবানই এলেন তাদের সিমলার বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন : তোকে না দেখে আমি থাকতে পারি না। আমার বড় কষ্ট হয় রে। বুক মোচড়ায়। ঠিক তোর মত রে।

আশ্চর্য হয় নরেন। তাব বুকও যে মোচড়ায় এ খবর কেমন করে জানল মানুষটা। তবু নির্দয় হল সে। রুক্ষ মেজাজে বলল : এভাবে আমার কাছে আর আসবেন না। আপনার জাদুতে আমি ভুলছি না। ভুলব না কোনোদিন।

ওরে অমন করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে নেই। তোর বুকে ক্ষীর সমুদ্রের ধারা বইছে। ক্ষীর সমুদ্রের সহস্রদল কমল তুই। তুই না চাইলেও আমি তো চাই—

তোমার পাগলামি ছাড়। আমাকে নিয়ে তুমি যা করে বেড়াচ্ছ তাতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে আমার। কেশব সেনের সঙ্গে আমার কোনো তুলনা হয়? তোমার কোনো মাত্রাবোধ নেই। পাগল ছাড়া কেশব সেনের মুখের ওপর কেউ বলতে পারে তাঁর চেয়ে নরেনের অন্তরের শক্তি ষোলো গুণ বেশি। কেশববাবু মহানব্যক্তি বলে পাগলের কথায় কিছু মনে করেননি, কিন্তু লজ্জায় আমি ব্রাহ্ম সমাজে যেতে পারি না। বিশ্ববিখ্যাত, ধীসম্পন্ন, বরেণ্য ব্যক্তিকে তোমার পাগলামিতে বশ করতে পারলে অনেক ভালো হত। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ এবোধ নেই বলেই পাগল হীরেকে কাচ মনে করে ফেলে দিয়ে কাঁচকেই হীরে ভেবে আঁচলে বাঁধে।

নরেনের বেয়াদপিতে বন্ধু রাখাল তো রেগে আগুন। বলল : ঠাকুরকে মানিস না মানিস, সম্মান করতে দোষ কোথায়? উনি এসেছেন তোর কুশল শুনতে, তিরস্কার শুনতে নয়।

ঠাকুরের মুখে অনাবিল হাসি। বললেন : নরেন হল জালা, মস্তবড দীঘি, অন্যেরা

ওর পাশে ঘটি কলসি, চুনো পুঁটি। ওর কথায় রাগতে নেই। দীঘির জল সাগরের মত তর্জন গর্জন করতে পারে? নরেন আমার মহাসাগর। উত্তাল ঢেউই সাগরকে নদী নালা থেকে আলাদা করেছে।

নরেন হঠাৎ খুব দমে যায়। এই প্রথম অনুভব করল বিশ্বাস বস্তুটা সকলের কাছে এক নয়। ঠাকুর যে সকলের সামনে তাকে এত বড় করে দেখেন, পাঁচজনকে বলেন সে কি তার যোগ্য? অমন সাদাসিধে ভালাভোলা মানুষটি তার সম্পর্কে এসব কথা ভাবেন কেন? তার মধ্যে অন্যকোনো সত্তাকে সত্যিই কি তিনি দেখতে পান? হঠাৎই নরেন প্রশ্ন করল তাঁকে : আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?

ঠাকুরের তাৎক্ষণিক উত্তর। হাঁ দেখেছি। যেমন তোকে দেখছি। বোধ হয় এর চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি।

নরেন অবাক হয়ে যায়। এরকম দৃঢ় প্রত্যয়ে, স্বচ্ছন্দ গলায় ঈশ্বর দর্শনের কথা আগে কারো কাছে শোনেনি। নরেনের শিক্ষা, বিচারবুদ্ধি কিন্তু সেকথা মানতে রাজি নয়। ঈশ্বরকে চোখে দেখা যাবে কি করে? তিনি তো অদৃশ্য, তাহলে তো মেনে নিতে হয় ঈশ্বরের কোনো রূপ কিংবা আকৃতি আছে!

নরেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল : কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু ওতে কিছু প্রমাণ হয় না। এসব ভাবাবেগের কোনো মূল্য নেই।

রামকৃষ্ণের মুখে অনাবিল হাসি। বলল : মূল্য আছে। তুইও চাইলে মনের মধ্যে জগৎজননী মাকে এবং কৃষ্ণকে দেখতে পাবি।

নরেন জোর দিয়ে বলল : আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

হঠাৎ রামকৃষ্ণ এক কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর ডান পা তুলে দিলেন নরেনের কাঁধে। বিরক্ত হয়ে সেই পা দু'খানা ব্যায়াম করা বলিষ্ঠ হাত দিয়ে কাঁধ থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করল নরেন। বহুকাল আগের ঘটনা। তবু বিবেকানন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সমস্ত শক্তি জড় করেও নরেন শীর্ণ মানুষটির পা নাড়াতে পারল না। ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে সে কাঁপছিল। বনবন করে তার মাথা ঘুরছিল। মনে হল, সমস্ত ঘরটাই যেন ঘুরছে। চৈতন্য লোপ পাচ্ছে। সে হারিয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল : এ তুমি কী করছ? আমার বাবা মা ভাই-বোন আছে। বড় ছেলের কিছু কর্তব্য আছে। অমনি সেই ঘূর্ণন থেমে গেল।

সেদিনের সে অভিজ্ঞতা স্পষ্ট মনে আছে বিবেকানন্দের। চোখের সামনে কী যে দেখেছে কিছুই মনে নেই। তবে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। এখনও মাথার মধ্যে সেই দপ্‌দপানি অনুভব করতে পারে। একজন মানুষের স্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হয় কী করে। রামকৃষ্ণের স্পর্শে কেন অমন ঘোর লেগেছিল তার ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পায়নি।

যতদিন যেতে লাগল নরেন স্পষ্ট উপলব্ধি করল তার বিশ্বাসটা কে যেন ভেঙে গড়ছে। তার ভেতরে অন্য এক মানুষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। যে মানুষ ঈশ্বর

বিশ্বাস করে না, কোনো সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বও মানে না, রামকৃষ্ণ ঠাকুর তাকে ছুঁয়ে দিল অমনি সমস্ত শরীরের মধ্যে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল কি করে? নিজের মনেই বলল এ হল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার শিহরন। তাই তাঁর স্পর্শে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল সে। কত ভক্ত তো আসে, কৈ তাদের তো এমন করে বলেন না— তুই এতদিন পরে এলি? এমন করে ভুলে যেতে হয়? তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা ছিল আন্তরিক। তাই বোধ হয় ওঁর জন্য সেও আকুল হয়। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার টান বড় বেশি ঠিক মায়ের টানের মত। এই টান ক্রমে এত গভীর হল, রামকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারে না নরেন।

ঈশ্বরকে চোখে দেখেনি নরেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বররূপী সর্বশক্তিমান এক মহামানবকে খুঁজে পায়। তিনি পুরুষোত্তম। কত সাধারণভাবে থাকেন, কিন্তু কী অসাধারণত্ব তাঁর! রাম দত্ত ডাক্তার, সুরেন মিত্তির সাহেব কোম্পানির বড় পদে কাজ করে, বলরাম বসু জমিদার, গিরিশ ঘোষ বড় অভিনেতা ও নাট্যকার : মহেন্দ্র গুপ্ত গৃহী ভক্ত এঁরা সকলে তাঁর সংস্পর্শে বদলে গেছেন। তিনি কাউকে কিছু বলেননি, জোর করেননি, পথ দেখাননি, হাসিমুখে তাদের সব দোষগুণকে নীরবে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন, তিরস্কৃত হয়েছেন কিন্তু তিরস্কার করে তাকে আঘাত করেননি। গিরিশ ঘোষ সুরেন মিত্রের মত মদ্যপ এবং বেশ্যাসক্ত মানুষও আশ্চর্যভাবে পাল্টে গেছে। ঠাকুরের জন্য তাঁদের অন্তরে ব্যাকুলতা বেড়েছে। তিনিও তাদের প্রেমে মায়ায় আকুল হয়েছেন। কিসের টানে মানুষ এত আকুল হয়? ঈশ্বরে অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মনটা নাড়া খায়। চিরদিন সে ভেবে এসেছে জীবন চলে প্রকৃতির নিয়মে। ধর্ম, ঈশ্বর, জীবাত্মা, পরমাত্মা সব মিছে। মানুষের অসীম কল্পনা। কিন্তু যত দিন যায় ততই বুঝতে পারে সেও অন্যান্যদের মত ত্যাগ ও বৈরাগ্যে আসক্ত হচ্ছে। ঠাকুরের মধ্যে সে তার ইষ্টকে দেখছে। নির্জনে ঠাকুরকে বলে, তুমি আমার প্রাণের ঠাকুর। তুমি ঈশ্বর। ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না। সে একটা বিশ্বাস। কিন্তু তুমি জীবন্ত। তোমাকে দেখতে পাই। তোমাকে ভালোবাসা যায়, ছোঁয়া যায়, কথা বললে উত্তর পাওয়া যায়। কেবল তোমার মধ্যে লুকোনো রহস্যকে বুঝতে পারি না। তাই তো মনের মধ্যে খুঁজে বেড়াই তুমি কে ও কেমন? কোন শক্তিবলে বিশ্বের সব শাস্ত্রকে আত্মস্থ করে বসে আছ! তুমি নিজেই চতুর্বেদ। জীবন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ। জীবনে একখানা শাস্ত্রগ্রন্থের পাতাও ওল্টালে না। তবু কী আশ্চর্য ক্ষমতায় অনুভবের বৃত্তে উপলব্ধির গভীরে তাকে নবনবরূপ দিয়েছ। এই পৃথিবীটাকে ভাল করে চেনা-জানার জন্য একেবারে আটপৌরে কথায়, জীবনের ভাষায়, সাধারণ ঘটনা দিয়ে ধর্ম, শাস্ত্র. নীতিকথা মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দিচ্ছ।

নরেনের কথা শুনে ঠাকুর হেসে বললেন : ও মা, এ যে ভালোবাসার কথা গো। তোর মনে রঙ লেগেছে নরেন। তুই তা হলে আমাকে মানলি।

তোমার ভালোবাসার কাছে আমি হেরে গেছি। ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি সব যুক্তি

তর্কের বাইরে। তুমি আমার হৃদয়ের ঠাকুর। তোমার মনের ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে বড় দীন মনে হয়।

শেষের সেই দিনগুলো কী ভয়ংকর সাংঘাতিক ছিল। রোগশয্যায় শুয়ে ঠাকুর যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। আর সে তাঁর শিয়রের ধারে মুখের দিকে চেয়ে অসহায়েব মত বসে আছে। আস্তে আস্তে ঠাকুর তাঁর শীর্ণ হাতখানা তার গায়ে রেখে বললেন : বড় কষ্ট, তুই বরং একটা গান শোনা। তোর গান শুনলে, আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। হৃদয়ে কমল ফোটে। ঠাকুরের ক্লান্ত বিষাদক্লিষ্ট চোখ দুটির ওপর চোখ রেখে নরেন গাইল :

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী

স্বামীজি দেখতে পাচ্ছেন বিভোর হয়ে তিনি গুরুর খুব কাছে বসে গান গাইছেন। আর রামকৃষ্ণ স্থির হয়ে শুনছেন। চোখের কোণে জলের ফোঁটা।

মঠের একজন শিষ্যের ডাকে স্বামীজির তন্ময়তা ভঙ্গ হল। চমকে তাকালেন তার দিকে। ওঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টিটা শিষ্যের মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল। শিষ্য এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে খুঁজল কাউকে। স্বামীজির ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন একটা অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন অসংকোচে। শিষ্যটির বিব্রত দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে নিজে থেকে বললেন : জাহাজ ঘাটে যেতে হবে, তাই না? আমি তো তৈরি আছি। তোমার জন্যই বসে আছি।

তারপর ওঁরা একটা ঘোড়াগাড়ি করে দু'জন চললেন খিদিরপুর ডকের দিকে। পিচের রাস্তার ওপর অশ্বখুরের অবিরাম খটখট আওয়াজ তুলে ফিটন গাড়িটা হনহন করে চলল। শীতের ভোরের বাতাস তাঁর ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। তবু বড় বড় চোখ মেলে নিঃশেষ করে দেখতে লাগলেন রাস্তার দুপাশে চেনা সবুজ ঘন পাতায় ভবা গাছের সার। অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। দু'দিকেই ঝোপে ঝাড়ে লতায় পাতায় ঢাকা ছোট ছোট খড়ের ঘর। বারান্দায় আলো জ্বলছে। কাপড়ের চাদর গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় বসে গৃহবধূ ঠকঠক করে শীতে কাঁপছে বাতাসে পোড়া তেলের আর ফোড়নের গন্ধ। ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে দূরের কোনো বস্তু দেখা যাচ্ছিল না। তবু চোখ দুটিতে কেমন একটা বিভোর বিহ্বলতা ছিল। স্মৃতিভারাক্রান্ত হলে যেমন হয় সেরকম একটা ছায়া পড়েছে তাঁব মুখে।

ঘোড়াগাড়িতে যেতে যেতে স্বামীজি নিজের মনের অভ্যন্তরে আর কাউকে নয় মার্গারেটকে খুঁজছিলেন। তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করছিলেন কোথাও কোনো ভুল হল কি না? মার্গারেট এখন তাঁর কাছে বাস্তব সত্য। তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকে মনে হয়েছিল মহিলার মধ্যে আগুন আছে। সে আগুন সন্ধ্যাদীপশিখার মত স্নিগ্ধ ও মনোরম। ঘন অন্ধকারের মধ্যে আগুনের ফুলকি হয়ে ধূপের মত জ্বলে। ধূপের সৌরভের মত তার ব্যক্তিত্বেরও একটা সুগন্ধ আছে। সুগন্ধী প্রসাধনের মতই তার

মুগ্ধ করা ব্যক্তিত্বের স্মৃতিটুকু অনেককাল মন ভরে রাখে। সেরকম এক দিনের কথা স্বামীজির মনে পড়ল।

লেডি ইসাবেলের বাসগৃহে এক ঘরোয়া সম্মেলনে মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম দিনেই দুজন দু'জনকে চিনল। কিন্তু তাঁদের প্রকাশের কোনো ভাষা ছিল না। মার্গারেটের ঘোলা ঘোলা নীল দু'চোখের দিকে তাকিয়ে স্বামীজি তার মনের যন্ত্রণাকে টের পেলেন যেন। ঐ যন্ত্রণা তিনি চেনেন। সংশয়ী মনের যন্ত্রণা যে কী, সে তো তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। মার্গারেটকে দেখেই বুঝে ফেললেন, তার অন্তর যেন অন্ধকারায় মাথা ঠুকছে। আশার ক্ষীণ রেখাও কোথাও নেই। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যে কত শক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি ভাল করেই জানেন। এপথে প্রতি পদক্ষেপে কেবলই যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা তার নতুন হয়ে ওঠার ভূমিকা শুধু। আসলে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যারা সব কিছু গ্রহণ কবে তারা বড় কষ্টে থাকে। মার্গারেটের মনের যন্ত্রণা উপশম করতেই যেন ভাববাচ্যে বললেন : সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে জন্মানো ভালো, কিন্তু ওর মাঝে মরলেই সর্বনাশ। চাই মোহমুক্ত মন। সব বাঁধন ছিঁড়ে বৈরাগ্যের আলোয় উত্তরায়ণের যাত্রী যে, কী তার আনন্দ! আবার কাউকে কোথাও আঁকড়ে না ধরে বিশ্বজগৎকে যে ভালোবাসে কিংবা নির্বিরোধে ঈশ্বরের ইচ্ছের বাহন হয়ে কর্মের সাধনা যে করে তারও কী আনন্দ! জ্ঞান, কর্ম, ব্যক্তি এই ত্রিবিধ সাধনা-সনাতন। যুগে যুগে মানুষ এতেই দেবতাকে জেনেছে নিবিড় করে।

কথাগুলো মার্গারেট কতখানি বুঝল, সে জানে। কিন্তু তার হৃদয় আপ্লুত হল। মনের গভীরে বোধ হয় নিত্য অন্বেষণ ছিল তার। সংশয়মুক্ত হতে মার্গারেটকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। একদিন নিজের মনের জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়ে বলল: আচার্য, ঈশ্বর সাধনার সঙ্গে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মানুষের যা কিছু সুন্দর, মহান, উদার ও শ্রেষ্ঠ তার ওপরেই গড়ে উঠেছে মানুষের ধর্ম। এ ধর্মের সঙ্গে কোন ধর্মমতের বিরোধ থাকার কথা নয়। বিরোধ শুধু ধর্মবোধে সুন্দর হতে না পারার জন্য।

শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার কথা শুনে বিবেকানন্দের অবাক হওয়ার পালা। ধর্মে সুন্দর হওয়া কথাটা ছিল মার্গারেটের এক আশ্চর্য সংযোজন। এই অনুভূতি উপলব্ধির গভীরে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। খুশির ভাবটা মনে চেপে রাখতে পারলেন না স্বামীজি। অনুরাগীর কাছে নিজেকে উন্মোচন করলেন। জান মার্গারেট একদিন তোমার মত আমিও বুকে সংশয় অবিশ্বাসের আগুন নিয়ে জ্বলে মরেছি। নিজের বিচার-বুদ্ধি, বিশ্বাসগুলিকে কিছুতে উপড়ে ফেলতে পারিনি। নিজের সঙ্গে নিজের অহরহ লড়াইতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। এমন ভাষা ছিল না মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করি। মনের আগুন নিয়ে যেদিন ঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম সেদিন থেকে আমার আর কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা থাকল না। কি যে হল, মনের কথা, বুকের ভাষা বলে শেষ করতে পারি না। পাশ্চাত্যে আসা থেকে কেবলই মনে হয় দুনিয়ায়

আমি যেমন আমার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি, দুনিয়াও তেমনি আমার অপেক্ষায় তৈরি হয়ে বসেছিল যেন। ঠাকুর যদি না থাকতেন আমার জীবনে তা হলে তোমার মতই এ জীবন একটা স্কন্ধকাটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। তোমার মতই বিশ্বাস করতাম, একটা বড় কিছু আমার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে। মা যেমন অনেক গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে সন্তান জন্ম দেন তেমনি মনের অন্ধকার থেকে সত্যের আলোয় ফেরা বড় যন্ত্রণার। আমি দীর্ঘ ছ'বছর ধরে আমার গুরুদেবের সঙ্গে লড়াই করেছি, ফলে আমার পথের খুঁটিনাটি আমার নখদর্পণে, সুতরাং তুমি দুঃখ কর না যে, তোমাকে বোঝার জন্য কাউকে বিলক্ষণ কষ্ট পেতে হয়েছে। বরং তোমার কষ্টের মধ্যে আমি শুধু নিজেকেই দেখতাম। বড় চেনা তুমি আমার।

মার্গারেটের দুই চোখে সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটল। আত্মস্থভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল: একথা বলে আমাকে বাঁচালেন। আপনার সব কথা আমি মেনে নিতে পারি না, আবার ফেলতেও পারি না। একটা দোটানায় যখন কাটছে ঠিক তখন আপনার কথাগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমার মনের বীণায় অণুরণিত হত, কিন্তু তার মর্মার্থ ভেদ করি এমন শক্তি ছিল না। ভারতীয় দর্শন, শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ পড়ি। যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ—সেই বিশ্বের দেবতাই হবেন এই দেহ-দেউলের ঠাকুর। তিনিই আবার জীবের জীবন। এমনি করে পৌঁছই আপনার উপলব্ধিতে-- জড়বাদী যাকে বলে জড় আপনি তাকেই বলেন চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের মাধ্যমে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এইসব কিছু ছেয়ে আছেন যিনি তিনিই সেই। সোহহম্।

মৃদু হেসে স্বামীজি বললেন : সত্যি তুমি আমাকে অবাক করেছ। তোমার জানার মধ্যে কোনো ভুল নেই। মানুষের বুকে ভগবান থাকেন। আমার মধ্যেও তিনি যেমন আছেন-- তোমার মধ্যে আছেন। এতবড় একটা সত্যকে একদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার সব চপলতা ক্ষমা করে বললেন : হ্যাঁরে ভগবানকে স্বচক্ষে দেখেছি আমি। ঠিক এই যেমন তোকে দেখছি, তেমনি করে দেখেছি। তোর চাইতে আরও ভালো করে তাঁকে দেখেছি। যদি দেখতে চাস তোকেও দেখাতে পারি। কিন্তু আমি কিছুই দেখিনি। তবে মৃন্ময়ী মূর্তির সামনে দাঁড়াতে শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরন খেলে গেল। স্থূল কামনার বদলে মার কাছে শুদ্ধ জ্ঞান এবং শুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনা করলাম। সেই প্রথম মনে হল তিনিও আছেন আমার হৃদয়ে। পর্দার আড়াল থেকে সব দেখেন এবং মনের কথা জানতে পারেন। হয়তো তোমার মনের প্রার্থনা তিনি শুনেছেন, তাই এমন গভীর করে ভারতের মর্মবাণী অনুভব করেছ। ডাকার মত ডাকলে ঠিকই বিশ্বদেবতার কাছে পৌঁছনো যায়।

মার্গারেটের অন্তরটা হঠাৎ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল যেন। আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা ফুটল তার কণ্ঠস্বরে। সেই আকুল করা কণ্ঠস্বর বিবেকানন্দের বুকের বীণায় বাজতে লাগল : আচার্য, জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। আপনাকে লন্ডনে যদি না পেতাম

তাহলে জীবনটা একটা স্কন্ধকাটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। আমার অন্তরে যার জন্য প্রতীক্ষা ছিল, সে বোধ হয় আপনি।

মার্গারেটের কথা শুনে একটুও অবাক হলেন না বিবেকানন্দ। যা ছিল প্রত্যাশিত সত্য। তাকেই পাওয়া হল তাঁর। মার্গারেটের মনোভাবটা যে খাঁটি এবং তার অভিব্যক্তির মধ্যে যে কোথাও ফাঁকি নেই, আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ বিবেকানন্দ তা জানেন। কিন্তু ভারতে তার মত একজন বিদেশিনীর কাজ করার পরিবেশ নেই। সেখানে কতরকমের বাধা, অসম্মান প্রতিমুহূর্তে তাকে সহ্য করতে হবে সে সম্পর্কে মার্গারেটের কোনো ধারণা নেই। কিন্তু তার মত একজন নারী কর্মী এবং সংগঠককে ভারতের কাজে খুব দরকার। যে ইচ্ছা এবং ঔৎসুক্য তাকে ভারতে যেতে অনুপ্রাণিত করছে তাকে ভারতের উপযোগী করে নেবার ক্ষমতা শুধু তারই আছে। এই সিংহিনীকে বশ করার ক্ষমতা শুধু বিবেকানন্দের একার এই আত্মশ্লাঘায় তাঁর বুকখানা ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটল অধরে। নিজেব মনে নিরুচ্চারে বললেন : মার্গারেট, সব নারীই তাদের প্রায় সবটুকু হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালোবাসে। প্রতিদানও চায়। কিন্তু আমার সমস্ত আমিকে কেউ কোনোদিন পাবে না। প্রত্যাশাও করে না। যে আমি রামকৃষ্ণের, যে আমি বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'র জন্য নিবেদিত তাকে কেউ কোনোদিন ছুঁতেও পারবে না। আমার দেওয়াব ক্ষমতার বাইরেও অনেক 'আমি' টুকরো আছে আমার মধ্যে সে সবও পাবে না। যতটুকু দিতে পারি ততটুকুও না। প্রতিদানে কিছু চেও না, প্রত্যাশা কর না আমার কাছে। সন্ন্যাসীর কোনো ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই। তাকে আসক্ত হতেও নেই। নদীব মত অবলীলায় সে শুধু সাগরের দিকে যায়। তার পিছু টান নেই। তাব মুক্তি-আলোকে আলোকে, নব নব পূর্বাচলে।

ঘোড়া গাড়ি কবে যেতে যেতে বিবেকানন্দের খুব আশ্চর্য লাগল একবছর আগের ঘটনা তাকে এমন করে আপ্লুত কবল কেন? ঠিক এরকম এক সময় সঙ্গী শিষ্যের ডাকে তাঁর মগ্নতা ভাঙল। শুকনো গলায় বলল : স্বামীজি, জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। জাহাজঘাটের খুব কাছে এসে গেছি আমরা।

তার ডাকেই স্বপ্ন থেকে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করলেন বিবেকানন্দ। একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঘোরের মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করলেন : মার্গারেটেব চিন্তায় এরকম তন্ময় হওয়ার সত্যি কি কোনো কারণ ছিল? প্রশ্নটা জেটিতে যাওয়া পর্যন্ত মাথার মধ্যে পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল। নিরুচ্চারে নিজের সঙ্গে কৌতুক করাব জন্যই সহাস্যে নিজের মনেই বললেন : সন্ন্যাসীও তো মানুষ। তাবও কিছু কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে।

তবু সেজন্য চলল নিজের মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ। সত্যিই তো এতটা অভিভূত হলেন কী করে? মার্গারেটের কথা মনে হলে যদি এত আনন্দ হয়। তাকে দেখলে না জানি কত আনন্দ হবে? এই আনন্দ অনেকটা মুক্ত অরণ্য পাহাড় পর্বত এবং সমুদ্র

দেখার মত। পরের জন্য নিজেকে অকাতরে যে বিলিয়ে দিতে পারে তার কথা ভাবলে, দেখলে আনন্দ তো হয়ই।

আকাশ কালো করা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে মোম্বাসা জাহাজ রাজকীয়ভাবে মন্থর গতিতে জেটির দিকে এগিয়ে চলল। জাহাজের খোলে বন্দী মানুষগুলির আর তর সইছিল না। নামার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। মালপত্তর নিয়ে অর্ধেকের মত যাত্রী ডেকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মধ্যে জাহাজের খালাসীদের ব্যস্ততা, চেঁচামেচি, দৌড়োদৌড়ি লেগে রইল। যাত্রীদের সাবধান করার জন্য ঘন ঘন ভোঁ বাজছিল, জোরে জোরে।

সাধারণ যাত্রীদের মত মার্গারেটও উদ্বিগ্ন অসহায়তা এবং ব্যাকুলতা নিয়ে উৎসুক নয়নে জেটিতে অপেক্ষামান মানুষদের ভিড়ে তার একমাত্র চেনা মুখখানা ভীষণভাবে খুঁজছিল। প্রিয়জনেরা ডেকের যাত্রীদের নজর কেড়ে নেয়ার জন্য রুমাল নাড়ছিল, হাত নাড়ছিল। শেষে এমন অবস্থা হল প্রিয়জনের কাছে আগে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষামান অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। ওর মধ্যে স্বামীজি না থাকার জন্যই মার্গারেট খুব সহজে জেটির এক পাশে তাঁকে অপেক্ষামান দেখতে পেল। স্বস্তির শ্বাস পড়ল। স্বামীজির নজর কাড়ার জন্য উল্লাসে দু'হাত আকাশের দিকে তুলে একটা ম্যাগাজিন নাড়তে লাগল জোরে জোরে। আরো কয়েকজন ইংরেজ মহিলাও তার সঙ্গে হাত নাড়ছিল সমানে।

দূর থেকে বিন্দুবৎ মানুষদের মধ্যে স্বামীজিকে চোখে চোখে রাখা খুবই শক্ত ছিল। অথচ চেষ্টা করেও স্বামীজির নজর কেড়ে নিতে না পারায় মার্গারেট হতাশ হল। বেশ একটু অভিমানও হল। যাকে ভরসা করে ভারতে এল সেই মানুষটিরই তার প্রতি কোনো ঔৎসুক্য নেই। প্রাণহীন কর্তব্য করার জন্য তিনি শুধু বন্দরে এসেছেন। এটুকু না.করলেও চলত তাঁর। সে একাই সব বন্দোবস্ত করতে পারত। কারো জন্য কোনো কাজ আটকে থাকে না পৃথিবীতে। তবু মানুষ সান্নিধ্য, সাহচর্য প্রত্যাশা করে। মনের এই একান্ত চাওয়াটুকু কোনো কারণে পূরণ না হলে বড় শূন্য লাগে। তেমনি মন খারাপ করা এক বিষণ্ণতা নিয়ে মার্গারেট যন্ত্রের মত জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। তার নীল চোখ দুটি জেটি জুড়ে শুধু স্বামীজিকেই খুঁজছিল। কিন্তু জেটিতে কোথাও খুঁজে পেল না তাঁকে। তা-হলে কি তারই দেখার ভুল! যাকে স্বামীজি ভেবেছিল সেকি তবে অন্য কেউ? কিন্তু ভুবনভোলানো ঐ দীপ্ত দুটি চোখ তো ভুল হওয়ার নয়! ও চোখ তো সচরাচর চোখে পড়ার নয়। তা-হলে? নীরব এক অদৃশ্য লড়াই হতে লাগল তার মনের মধ্যে। এর মত কষ্ট একজনের মানুষের জীবনে খুব কমই থাকে। মনের কারণেই মানুষ বড় একলা আর হতভাগ্য জীব। তাই নিজের মধ্যেই এক সত্তার সঙ্গে তার অন্য এক সত্তার সংঘাত লেগে রয়েছে। বাইরে থেকে তা বোঝা

যায় না। মনের অভ্যন্তরে তার নিরন্তর টানাপোড়েন লেগেই আছে। প্রত্যেক মানুষেরই আছে। স্বামীজি বলেই কি মিষ্টি প্রীতির বাঁধনের পিছুটান থাকতে নেই তাঁদের? প্রশ্নটা নাভিমূল থেকে সহসা উঠে এল তার একেবারে জিবের ডগায়। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতে করতে সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়েছে এমন সময় ভিড়ের মধ্য থেকে অত্যন্ত চেনা গলায় মার্গারেট ডাক শুনতে পেল। থমকে দাঁড়িয়ে গেল মার্গারেট। সিঁড়ি থেকে একটু সরে দাঁড়াল। স্বরটা খুবই চেনা মনে হল। কিন্তু তার সামনে কোনো চেনা মানুষ দেখতে পেল না। তবে কি পুনরায় ভ্রমে পড়ল? কানের ভেতর যে স্বর অনুরণিত হতে লাগল তা হঠাৎ করে বুকের মধ্যে কি সব জমে থাকা জিনিস টিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। ঐ কণ্ঠস্বর তার ভুল হওয়ার কথা নয়। ভিড়ের মধ্যে ভাল করে নজর করে দেখল খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা এক মুখ দাড়ি নিয়ে একজন নেড়া মাথার সন্ন্যাসী লুঙির মত করে গেরুয়া রঙের কাপড় পরে একটা মোটা চাদর গায়ে জড়িয়ে, তার দিকে নিবিড় ঘন কালো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। চোখে তাঁর কৌতুক অধরে স্মিত হাসি।

চোখের পলক পড়ে না মার্গারেটের। এ কাকে দেখেছে সে? লন্ডনে যে ভারতের সন্ন্যাসীকে দেখেছিল তাঁর সঙ্গে জেটির মানুষটির কোনো মিল নেই। লন্ডনে যাঁকে দেখেছিল তাঁর মাথা ভর্তি চুল, পরিষ্কার কামানো মুখ, পাগড়ি পরলে যাঁকে মনে হত রাজার রাজা, ইট রঙের যাজকের মত পোশাক যাঁকে পরম পুরুষের মহিমায় মহিমান্বিত করত সেই আশ্চর্য সুন্দর রাজকীয় সৌন্দর্য জেটির সন্ন্যাসীর মধ্যে খুঁজে পেল না। ভীষণ হতাশ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে সে চেয়ে রইল। গভীর ঘন কালো, বিভোর চোখ দুটি আর তাঁর মেঘমন্দ্রের মত কণ্ঠস্বর, গায়ের রঙ, কাটা কাটা নাক মুখ ঠোঁট চিবুক দেখলেই বিবেকানন্দ বলে চেনা যায়। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে একি চেহারা হয়েছে তাঁর? উৎকণ্ঠায় মনটা ভারি হয়ে গেল।

এতক্ষণ ধরে যে রাগ, অভিমান, অভিযোগে বুক তোলপাড় করছিল। সব ভেসে গেল। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। আনন্দের কাঁপন থামে না বুকে। দুচোখে তার বিস্ময়, মুখে উদ্বেগ, আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা মাখামাখি হয়ে গেছে। অকারণে চোখ দুটি ছল ছল করে। কতদিন পরে রাজাকে দেখল। আকুল দু'চোখ মেলে প্রাণভরে দেখতে লাগল। পলক পড়ে না মোটে। স্বামীজির নিবিড় ঘন আঁখি তারা দুটি তার চোখের মধ্যে এনে এমন করে ফেলল যেন একটুও চোখ উপচে বাইরে পড়ে নষ্ট না হয়।

মার্গারেটের ঐ চাউনির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে উঠল বিবেকানন্দের। মার্গারেটের খুব ইচ্ছে হল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। ভিড়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য নতও হল। কিন্তু স্বামীজি দু'পা পিছু সরে গিয়ে বললেন : থাক হয়েছে। এখানে নয়। পরে প্রণাম করার অনেক সময় পাবে।

মার্গারেট প্রণামে বাধা পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতটা অপ্রস্তুত হওয়ার জন্য

সে তৈরি ছিল না। মুহূর্তে তার মুখখানা মলিন হয়ে গেল। অপরাধীর মত স্বামীজির দিকে তাকাল। তাঁর কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কেবল ছোট্ট করে জিগ্যেস করলেন: জাহাজে সি-সিক হয়নি তো।

এটুকু কথাতেই মার্গারেটের ভেতরটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল : ক'দিন কী কষ্ট পেয়েছি? সব সময় গা বমির ভাব, মাথা তুলে দাঁড়াই এমন শক্তি ছিল না। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে সব সয়ে গেল।

প্রত্যুত্তরে স্বামীজি কোনো কথা বললেন না। কথাগুলো তিনি আদৌ কানে শুনেছেন কি না তাও বোঝা গেল না। মার্গারেটে বেশ একটা অস্বস্তি নিয়ে যখন ইতস্তত করছিল সেইসময় গেরুয়াধারী এক শিষ্য তাকে জুঁই ফুলের তিন লহরীর মালা পরিয়ে দিয়ে বলল : ভারতের পক্ষ থেকে সামান্য উপহার। ভারত আপনাকে বরণ করে নিল।

আশ্চর্য হল মার্গারেট। এ কথাগুলো যে মানুষের মুখে শোনার জন্য সে আকুল হয়েছিল, তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্বিকারভাবে তার পাশেই আছেন তিনি। মার্গারেটের অদ্ভুত লাগল। এমন পুরুষমানুষ হয়! একবছর পরে দেখা তবু কত শান্ত তিনি। একটুও ভাবাবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, ভীষণ নির্বিকার। একটা কুশল প্রশ্নও জিগ্যেস করলেন না তাকে। অথচ পাশাপাশি হাঁটছিল তারা। যেতে যেতেই বললেন: তোমার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি বাইবে অপেক্ষা করছে। কথাটা শুনে মার্গারেট সরাসরি ওঁর দিকে তাকাল। মনে করল, এটা হয় তো তাঁর কথা বলার ভূমিকা।

পাশাপাশি ওরা তিনজন যাচ্ছিল। মার্গারেট উৎসুক নয়নে বারংবার তাঁর দিকে চোখ উজাড করে তাকাচ্ছিল। কিন্তু তিনি একবারও তার দিকে ফিরেও দেখলেন না। বেশ একটু নিরাশ হল মার্গারেট। মনে মনে ভাবল তার সামান্য প্রত্যাশা কি চাওয়ার অতিরিক্ত কিছু? স্বামীজি তো চিঠিতে লিখেছেন– আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে। এর চেয়ে অধিক চাইবার কি থাকতে পারে একজন সন্ন্যাসীর কাছে। এই প্রতিশ্রুতি ভরসা করেই তো সে ভারতে এসেছে। কিন্তু এখন তিনি এমন ভাব করছেন যেন ভালো করে চেনেন না তাকে। তার সঙ্গে ভালো করে দুটো কথা বলা তো দূরের কথা, ভালো ব্যবহার করতেও যেন কুণ্ঠা ও সংকোচ তাঁর। মনে হচ্ছে, সে যেন তাঁর কত অচেনা। স্বামীজি মুখে কুলুপ এঁটে চলমান যাত্রীদের স্রোতে গা ভাসিয়ে চললেন। তাদের মধ্যে আর একটিও কথা হল না। অথচ মার্গারেট আশা করেছিল তার মনের গভীরে গোপনে গচ্ছিত ধনের মত কত কথা সে সঞ্চয় করেছিল। রাজার ঔদাসীন্য এবং অনাসক্তির জন্য সে কথা বলা হল না। রাজা কত বদলে গেছে।

মার্গারেটের খুব ইচ্ছে হল যেতে যেতে তাঁকে জিগ্যেস করে অমন করে মুখ ফিরিয়ে আছেন কেন? ম্লেচ্ছ বলে আমার সঙ্গে যদি কথা বলতে ইচ্ছে না হয়, বলবেন না। কিন্তু কি হয়েছে আপনার। সেটা তো বলতে পারেন। বলবেন না আমায়! গভীর

অভিমানে তার কান্না পাচ্ছিল। বাস্তব অবস্থা তার কাছে মরীচিকার মত হয়ে গেছে।

জাহাজঘাটা থেকে বাইরে এসে অপেক্ষামান একটি ঘোড়ার গাড়ি দেখিয়ে মার্গারেটকে উঠতে বললেন বিবেকানন্দ। দুঃখে-অভিমানে মার্গারেটের বুক ফেটে যাচ্ছিল। বিবেকানন্দকে বড় নিষ্ঠুর মনে হল। তাঁর মধ্যে রক্তমাংসের মানুষটাকে সে যেন কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না। একটা নিষ্ঠুরতা দিয়ে আগাগোড়া তিনি নিজেকে মুড়ে রেখেছেন। মৌনতার সেই দেয়ালটা নিজে থেকে তিনি না ভাঙলে মার্গারেটের সাধ্য নেই তাকে ভাঙে।

গাড়ি কিছুক্ষণ চলার পর স্বামীজি তাকে শুধালেন : তোমার বাড়ির সব কুশল তো। মিসেস ইসাবেল তোমাকে এভাবে একা একা ছাড়বেন আমি ভাবিনি। বেশ চিন্তায় ছিলাম। পথে অন্য কোনো অসুবিধে হয়নি তো। অবশ্য হলেই বা আমি কি করতে পারতাম।

স্বামীজির মামুলি প্রশ্ন শোনার আগ্রহ ছিল না মার্গারেটের। হাঁ-হুঁ করে গেল। বুকের মধ্যে তার কথা ফুটছিল। কিন্তু প্রকাশের পথ পাচ্ছিল না। আলাপের সূচনা তার পছন্দ হল না।

মুখ বুজে মার্গারেট জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল। স্বামীজি তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন : এখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, তুমি আসছ। সত্যি তুমি তা-হলে এলে আমাদের অর্ধনগ্ন, কালো কালো মানুষের দেশে।

মার্গারেট বাইরের দিকে চোখ রেখে নিস্পৃহভাবে বলল : হ্যাঁ, এর সব কৃতিত্ব মিস হেনরিয়েট মুলারের। তাঁর অর্থ সাহায্য না পেলে আমার ভারতে আসা হত না কোনোদিন। জাহাজ ভাড়া ছাড়াও আরো আনুষঙ্গিক খরচ খরচার সব অর্থ তো তিনি দিয়েছেন। অবশ্য এ অর্থ প্রকারান্তরে আপনাকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে আমার মধ্য দিয়ে আপনাকেই নিবেদন করেছেন। উপচার ছাপিয়ে সে পুজো ঠিকই উপাস্যের পায়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে তাঁব পুজোর নৈবেদ্য হয়ে। কথাটা বলা শেষ করে বিহ্বল চোখে স্বামীজির দিকে চেয়ে রইল।

স্বামীজি সব ব্যাপারটা লঘু এবং সহজ করে দেবার জন্য প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সহাস্যে বললেন : আচ্ছা মার্গারেট আমি কেমন আছি একবারও জিগ্যেস করলে না তো? এক বছরেই অসুখ আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে। কথা বলতেও ভালো লাগে না। কিন্তু সেকথা বোঝে কে? জান. নেড়া হওয়ার জন্য চেহারাটাই বদলে গেছে। খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা একমুখ দাড়ি থাকার জন্য বেশি অসুস্থ মনে হচ্ছে। তাই-না?

মার্গারেটের সব রাগ অভিমান মুহূর্তে জল হয়ে গেল। ভেতরটা তার খুশি হয়ে উঠল। দুচোখ ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল। মজা করেই বলল : বুড়ো বুড়ো লাগছে। আমি তো প্রথমটায় চিনতেই পারিনি।

স্বামীজি বেশ একটু হেসে কৌতুক করে বললেন : বুড়ো হতে আমার আপত্তি নেই। বরং বুড়ো হলে অনেকরকম সুবিধে পাওয়া যায়।

মার্গারেট হাসি হাসি মুখ করে বলল : আহা, বেশি বেশি। বুড়ো হলেই হলো। আপনি কোনোদিন বুড়ো হবেন না।

তুমি না চাইলেও বুড়ো তো সবাইকে হতে হবে।

সে বুড়ো হতে এখন অনেক দেরি। মনের বার্ধক্যকেই ভয়। শরীরের বার্ধক্য কোনো বার্ধক্যই নয়। শরীরের এ হাল হল কেন? বেশ তো ছিলেন লন্ডনে।

লন্ডন থেকে ফেরার পরে অজস্র কাজের মধ্যে ডুবে ছিলাম। শরীরের দিকে তাকানোর সময় ছিল না। মানুষের কাজের সময় বড় অল্প। অল্পকালের ভেতর সব কিছু ঠিক ঠাক করে গেলে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। কিন্তু শরীর শুনবে কেন? অনেক অনিয়ম হয়েছিল। খাটা-খাটনিতে শরীরে ক্লান্তি জমেছিল। রোগ সুযোগ নিল। ডাক্তারের পরামর্শ : শরীর মন এবং মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিশ্রাম। ডাক্তার তো বলে খালাস। কাজ পড়ে থাকলে জমে যাবে। সে তো আর ডাক্তারে উদ্ধার করবে না। কাজেই ডাক্তারের কথায় কান দিলাম না। কিন্তু শিষ্য এবং বন্ধুরা মিলে কলকাতায় থাকতে দিল না। জোর করে দার্জিলিং পাঠিয়ে ছাড়ল।

উৎকর্ণ হয়ে মার্গারেট ওঁর কথাগুলো শুনছিল। তার চোখেমুখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। বেশ একটু অভিমান হল ওঁর ওপর। বলল : কৈ এসব কথা তো চিঠিতে একবারও লেখেননি আমায়। এভাবে আমাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না আপনি। আমার প্রতি-আপনার ভীষণ অবিচার। এটা আপনার একেবারেই ঠিক কাজ হয়নি। বলতে বলতে তার দুচোখ সজল হল।

স্বামীজির অধরে স্মিত হাসি। বললেন : এসব কথা বলে তোমাকে ব্যাকুল করা কি ঠিক হত? অতদূর থেকে তুমি কি বা করতে পারতে? মনটাই আর্ত হত শুধু। তাছাড়া এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। ওষুধপত্তর পথ্যি বলতেও তেমন কিছু নেই। শুধুই শুয়ে শুয়ে নির্ভাবনায় নিষ্কর্মা হয়ে দিন কাটাও। সেজন্য তো সাকরেদরা দার্জিলিং পাঠাল। কিন্তু কী হল তাতে? যেটুকু ভাল হলাম, পথের ধকলে সেটুকুও গেল।

মার্গরেট বলার মত কথা খুঁজে না পেয়ে আর্ত গলায় বলল : সত্যি আপনার জন্য ভাবনা হয়। সেদিন লন্ডনে যদি দেখা না হত তা-হলে এসব কথা বলতে হত না। ব্যাকুলতাও থাকত না কোনো।

স্বামীজি বললেন : তাহলে তো স্কন্ধকাটা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে—তাই না।

মার্গারেট লজ্জা পেয়ে হাসল! লাজুক হাসি তাতেই দু'চোখ রমণীয় দেখাল।

ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে মার্গারেট ইংরেজের তৈরি কোলকাতা দেখছিল। লন্ডনের মত সব রকম যানবাহন কোলকাতায় রাস্তাতেও ছড়ানো। রাস্তার দু'ধারে বনবীথি ওর সব নজর কেড়ে নিয়েছিল। ঘোড়ায় টানা অসংখ্য নানারকম

জুড়িগাড়িতে পথ ভরে আছে। ওর মধ্যে পথ করে কোচোয়ানরা যে যার গাড়ি নিয়ে চলেছে। সবাইকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অদম্য চেষ্টায় ঘোড়ার পিঠে সপাং-সপাং করে চাবুক চালাচ্ছে। মারের জ্বালায়, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। কেবল তাদের কোচোয়ান চাবুক না চালিয়ে গলার দাপটে লোক সরিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে গাড়িটি গড়ের মাঠ পেরিয়ে এসপ্লানেডে এসে পড়ল। জায়গাটা মার্গারেটের ভীষণ ভালো লাগল। লন্ডনের মতই একটা সাজানো শহর। ঘোড়াগাড়ি থামল ৪৯ পার্ক-স্ট্রিটের সামনে।

স্বামীজি বললেন : মার্গারেট আপাতত এটাই তোমার ঠিকানা। এই হোটেলে তোমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতদিন অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে না পারছি ততদিন সাহেব পাড়ার এই পরিবেশে নিজেকে সইয়ে নাও।

হোটেলের বয় জিনিসপত্তরগুলো তার ঘরে নিয়ে গেল। রিসিপশানিস্টকে সব বুঝিয়ে দিয়ে স্বামীজি বিদায় নিতে উদ্যত হলেন। মার্গারেটের ঘরে আর গেলেন না। প্রস্থানের সময় বললেন : মার্গারেট, তুমি বিশ্রাম কর। সময় মত দেখা হবে। এর মধ্যে বাংলাটা শিখতে থাক। কাল থেকেই বাঙলা শেখার কাজটা শুরু করে দাও। আমি একজন ভালো বাংলার মাস্টারমশাই তোমার জন্য ঠিক রেখেছি। শুভস্য-শীঘ্রম। দেরি কর না কিন্তু। কাল থেকেই তিনি আসবেন।

মার্গারেট ডাগব নীল চোখ দুটি মেলে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। সেই সংগে হাত নেড়ে বিদায় জানাল তাঁকে।

হোটেলের ঘরটা খুব বড় নয় কিন্তু তার দরজা ছিল আটটা। এত ছোট্টঘরে আটটা দরজা দেখে মার্গারেটের হাসি পেল। মোটামুটি সাজানো-গোছানো ঘর। ঘর সংলগ্ন স্নানঘরটি খুবই ছোট। ঐটুকু পরিসরের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনের সব কিছুই ছিল। ঘুরে ঘুরে মার্গারেট অনেকক্ষণ ধরে থাকার জায়গাটি দেখল। অবশেষে বেশ একটু হতাশ হয়ে চেয়ারের উপব থপ করে বসল। খোলা জানলা দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত ব্যস্ত কোলকাতাকে দেখতে পাচ্ছিল। প্রশস্ত পথটি খুবই পরিচ্ছন্ন। সুদৃশ্য বড় বড় বাড়িগুলি দেখলে লন্ডন শহরের কথাই মনে পড়ে। পথে যারা চলেছে তাদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ। ধোপ দুরস্ত পোশাক তাদের অঙ্গে। স্থানীয় যে সব পথচারী এই পথে চলাচল করে তাদের পরিধেয় বস্ত্র দেখলে মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন তারা। রাস্তার দু'ধারে সাজানো দোকানপাটগুলোও মনোরম। সব মিলিয়ে লন্ডন শহরের একটা মিনি সংস্করণ। প্রথম দর্শনেই জায়গাটা তার ভালো লেগে গেল। বেশ কিছুক্ষণ থমধরা একটা ক্লান্তি নিয়ে ঈজিচেয়ারে বসে থাকল। একসময় উঠে জাহাজেব জামা-কাপড় ছেড়ে স্নানঘরে ঢুকল। স্নান করে শরীরটা স্নিগ্ধ হল। দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি হয়ে সাজল। তারপর একটু ব্রেকফাস্ট করে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

এক ঘুমেই বিকেল হয়ে গেল। শীতকাল। জানুয়ারি মাসের শেষ। দিন ছোট

হওয়াব জন্য সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল দ্রুত। মার্গারেট দ্রুত তৈরি হয়ে পথে বেরোল। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, সবই অচেনা, তবু সাহেবপাড়ার এই অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে তার ভাল লাগছিল। এখানকার বিচারে ঠাণ্ডাটা ভালোই ছিল। তবু লন্ডনের তুলনায় তা অতি সামান্য বললে হয়। বেড়ানোর পক্ষে খুবই মনোরম। সন্ধের পরেই পথে লোক থাকে কম। অচেনা জায়গায় একজন মেয়ের পক্ষে একা একা বেড়ানো নিরাপদ নয় মনে করেই হোটেলে ফিরল।

দুপুরে ঘুমিয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়েছিল। বিকেলে বাইরে ঘুরে মনটা ফুরফুরে হল। বেশ লাগছিল। বুকের ভেতর খুশির স্রোত বইছিল। মা, বোন, ভাইয়ের সঙ্গে অনেককাল যোগাযোগ নেই। পৌঁছনোর খবর দিয়ে ওদের চিঠি লেখাটা প্রথম কর্তব্য মনে হল। কালক্ষয় না করে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। তিনজনের মধ্যে কাকে লিখবে, কোথা থেকে শুরু করবে ভেবে স্থির করতে পারছিল না।

অবশেষে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখল, আমার প্রিয় নেল। অক্ষরগুলোর ওপর আশ্চর্য বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। মনেব গতি কি আশ্চর্য! মা, ভগ্নি মে ভাই কিংবা রিচমন্ড কাউকে নয়। বান্ধবী নেল হ্যামন্ডকে সব জানিয়ে চিঠি লেখার কথা মনে হল কেন? কলমটা হাতের মুঠোয় ধরে গভীরভাবে ভাবতে লাগল এমনটা হয় কেন? অথচ, যাদের কথা প্রথম মনে হল যাদের জন্য মনটা ভীষণ আকুল হয়েছিল, তাদের একজনের নামও কলমে প্রকাশ পেল না কোন কারণে? অথচ, তারাই তো হৃদয়ের মধ্যে সর্বক্ষণ আছে। * এই সুগভীর প্রশ্নে তার হৃদয় আলোড়িত হল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চাবণ করল---আমাব ছোট্ট মা-টি! তোমার দুঃখের তপস্যাকে আমি ভুলিনি, ভুলবও না। আমার হৃদয়হীনতার অপরাধকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিন আর চিঠি লেখা হল না মার্গারেটের। মনের যন্ত্রণা নিয়ে জানলাটা হাট করে খুলে দিল। অমনি একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া হু-হু করে ঘরে ঢুকল। সারা শরীরটা স্নিগ্ধ হলো তাতে।

হোটেলের অ্যাটেনডেন্ট মার্গারেটকে বিসিপশনিস্টের একটা চিরকুট দিয়ে বলল: নেড়া মাথার এক সাধু আপনার দর্শন প্রার্থী। নিচে বসে আছেন। আপনার আজ্ঞা হলে আনতে পারি।

---

* নিবেদিতার পত্রাবলী সংগ্রহ বান্ধবী নেল হ্যামন্ডের চিঠি দিয়ে শুরু। এব আগে কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি। মার্গারেটের মনেব অনুরূপ অবস্থা বর্ণনার পেছনে ২১.১.১৮৯৯ র চিঠিখানির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই পত্রে মার্গারেট লিখেছেন বাড়ির লোকজনের হস্তাক্ষরে কোনো চিঠি এলে আমি থরথরিয়ে কেঁপে উঠি এবং না পড়ে পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। কাহিনীতে মার্গারেটের অবচেতন মনের এই ঘটনার জের টেনেছি।

নেড়া মাথার সাধু শুনে মার্গারেটের বুকটা ধড়াস করে উঠল। এখানে তার আছে কে? দেখা-সাক্ষাতের লোক কোথায়? একজন মানুষই তার চেনা কেবল। সে মানুষ বিবেকানন্দ। খোঁজ-খবর করার মানুষ বলতে মার্গারেট তাঁকেই জানে। অনুগ্রহ করে খবরাখবর নিতে তিনি হোটেলে এসেছেন একথা ভাবতে তাঁর একটা আশ্চর্য অনুভূতি হল। বুকের ভেতরটা আনন্দে উথাল-পাথাল করতে লাগল। প্রত্যুত্তরে বলল তোমাকে কিছুই কবতে হবে না। আমি যাচ্ছি। যা বলার আমিই বলব।

মার্গারেটের তর সইল না। আকুল হয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল। তর্ তর্ করে নীচে নামতে লাগল। মনে হচ্ছিল, সিঁড়ির ধাপে পা পড়ছিল না তার। সে যেন উড়ে যাচ্ছিল। বিশ্রস্ত কেশরাশি তার ডানার মত হয়ে গেছে। আর সে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। মনে হচ্ছিল, ময়ূর নাচছিল পেখম খুলে।

তারপরে যা অনিবার্য তাই হল। রিসেপশনিস্টের সামনে অচেনা নেড়া মাথার এক সন্ন্যাসী মার্গারেটকে দেখেই তৎক্ষণাৎই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভারতীয় রীতিতে দু'হাত জোড় করে তাকে স্বাগত জাগল। আচমকা তার মুখোমুখি হতে বেশ একটু লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। নিজের বেসামাল ভাবালুতার রেশ তৎক্ষণাৎ কাটিয়ে উঠতে পারল না। প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনার সঙ্গে একটু সংকোচ ও দ্বিধা যুক্ত হয়ে তার এমন অবস্থা হল যে বেশ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল।

মার্গারেটের লাজুক অপ্রতিভতা সন্ন্যাসীকেও বেশ কিছুটা বিব্রত এবং বিহ্বল করল। বলল : স্বামীজি পাঠিয়েছেন। একটা চিঠিও দিয়েছেন। আলাদাভাবে বাংলা শেখানো সম্পর্কে কিছু কথা বলার ছিল।

মার্গারেট কথা খুঁজে পেল না। নিদারুণ আশাভঙ্গের কষ্টে সে একটু হতাশ ও বিবর্ণ হয়ে বলল : তাহলে বরং আমার ঘরেই চলুন। স্বামীজি তো আমার ঘরেই ঢোকেননি। অন্তত, আপনি তাকে বলতে পারবেন।

মার্গারেটকে অনুসরণ করে সন্ন্যাসী দুয়াব পর্যন্ত এল। সন্ন্যাসীর বয়স কম। পরনে সাদা কাপড লুঙির মত পবা, গায়ে সাদা কাপড়ের উডনী, মাথা কামানো এবং মাথায় একগোছা শিখি। ছেলেটি ভীষণ নিরীহ, শিশুর সারল্য তার চোখে মুখে।

মার্গারেটের সঙ্গে একসাথে ঘরে ঢুকল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। পর্দা থাকার জন্য ঘরের মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কবছিল কতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে মার্গারেট আহ্বান করে তাকে।

কিছুক্ষণ বাদেই নবীন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে সে কক্ষে ঢুকল। এবং যথারীতি তার দিকে একটা চেয়াব এগিয়ে দিয়ে বসতে বলল। এবং শয্যাব একপ্রান্তে নিজে বসল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজন মুখোমুখি বসে আছে। কিন্তু কেউ কথা বলছিল না। ছাত্রী সম্পর্কে শিক্ষক মশাইব কোনো কৌতূহল নেই। কীভাবে ভাষা শিক্ষাব পাঠ শুরু হবে শিক্ষক মশাই ছাত্রীকে তা খুলে বলছে না। এমন কি ছাত্রীর দিকে একবাবও তাকিয়ে দেখল না। কিংবা জিজ্ঞাসা করল না বাংলা শেখানোর জন্য কোন সময় আসতে হবে

শিক্ষককে। মার্গারেট ততক্ষণে লাজুক অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। নবীন সন্ন্যাসীর জড়সড় ভাবটা কাটিয়ে উঠার জন্য বলল : আপনার নিজের সম্পর্কে তো কিছু বললেন না। অথচ, এটা একটা ভাইটাল ব্যাপার।

নবীন সন্ন্যাসী চোখ না তুলে, মাথা হেঁট করে নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল আমি একজন ব্রহ্মচারী। এটুকু ছাড়া কোনো পরিচয় নেই। সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাকি পরিচয় মুছে ফেলতে হয়। সন্ন্যাসীর কোন অতীত নেই। তার থাকে শুধু বর্তমান।

মার্গারেটের কেমন অবাক লাগে। ভিতরের কৌতূহলটা তাকে চুপ করে থাকতে দিল না। স্বামীজি সম্পর্কে কত কথা মনে জাগল। তাঁর সম্পর্কে কত কী জানতে ইচ্ছে করল। কিন্তু লজ্জায় সংকোচে কিছু জিগ্যেস করা হল না। নিস্পৃহভাবে বলল : ও। স্বামীজি তো বাংলা শেখানোর জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন। এভাবে চুপ করে থাকলে আমার ভাষা শেখা হয় কী করে? এ ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানি না। একটা অজানা ভাষা শেখাব বললে তো আর শেখা হয় না? নিজে শেখা এক, কিন্তু অন্যকে শেখানোর জন্য চাই একটা পদ্ধতি। ভাষা শেখার গোড়াপত্তন করতে সাধারণ কিছু কথা জানা আবশ্যক হয়। কিন্তু আপনি তো কিছুই বলছেন না। এমন কি বলার ভূমিকাও করছেন না। সে কাজটা তো আজ করা যেত।

সন্ন্যাসী মাথা নিচু করে মেঝের দিকে চেয়ে রইল। তার ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে মার্গারেট মজা করার জন্য বলল : আমিও শিক্ষকতা করতাম। শিক্ষকের নিজস্ব একটা প্রকাশ ক্ষমতা চাই। নিজেকে প্রকাশ করার কৌশল যাঁর জানা নেই তিনি কক্ষনো ভালো শিক্ষক নন। স্বতস্ফূর্ততা একটা আর্ট। এই আর্ট যাঁর করায়ত্ত তিনি তত সফল শিক্ষক। একটা শিক্ষককে সারা জীবন ধরে অনুশীলন করতে হয়। কিন্তু আমার সামনে এত জড়সড় হওয়ার আপনার কী আছে? আমি বাঘ, সিংহ নই যে হালুম করে খেয়ে নেব। বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল।

কিন্তু যাকে বলল কথাগুলো তার কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। লজ্জায় কর্ণমূল আরক্ত হল। নিজের লাজুক অপ্রতিভতা সামলে নিতে কয়েকটা মুহূর্ত লাগল সন্ন্যাসীর। তারপর শুষ্ক মুখে অস্ফুট স্বরে বলল : স্বামীজি বলেন, কোনো কিছুই কাউকে শেখানো যায় না। মানুষ নিজেই শেখে। নিজের প্রয়োজনে এবং ইচ্ছেতেই শেখে। শিশুও এভাবে কথা বলতে এবং হাঁটতে শেখে।

মার্গারেটের তার্কিক মনটা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল। বলল : এটা হলো ইন্‌স্টিংটগত শেখা। একটা পশুও এই প্রবণতা থেকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু দ্রুত শিখে নেয়। এর জন্য বুদ্ধিবৃত্তি দরকার হয় না। এর সঙ্গে দক্ষতা যোগ্যতা কিংবা উৎকর্ষতার কোনো সম্পর্ক নেই। অনুশীলন করে যা জানতে হয়, যে জ্ঞান অর্জন করতে হয় সে কেবল মানুষের আয়ত্তে। একজন প্রাণীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কোনো বিষয়ে শিক্ষিত করা যায়, কিন্তু তার সব ক্রিয়াকর্মই যান্ত্রিক। শিক্ষার বাইরে কিছুই করতে পারে না সে।

সন্ন্যাসী কোনোরূপ প্রতিবাদ না করে বলল : তা-হলে দেখুন, শেখার পথটা উন্মুক্ত কবে দিলেই হল। প্রদীপের পলতে উস্কে দেয়ার জন্য একজন লোক চাই। প্রদীপ নিভু নিভু হওয়ার আগেই তার শিখাকে অনির্বাণ রাখার জন্য একজনকে পলতে উস্কে দেবার দায়িত্ব নিতে হয়। শিক্ষকের কাজ হল নজরদারি করা—খবরদারি করা নয়। আপনি তো ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি মেনে একজন শিশুর খেলার সাথী হয়ে তার মনের অন্দরমহলে পৌঁছে তাকে গাছ-পালা-পশু-পাখি প্রকৃতি চিনিয়েছেন। অক্ষর চিনিয়েছেন, ভাষা শিখিয়েছেন। আপনার মত মানুষকে বাংলা ভাষা শেখানোর স্পর্ধা আমি করি না। গুরুগিরি করতে আসব না, গুরুর আদেশ পালন করতে যা করার দরকার তাঁর নির্দেশে শুধু সেটুকুই করব। ঠাকুরের কথা নিয়ে দু'খানা বই রেখে যাচ্ছি। এ দুটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করবেন।

ঠাকুরের নাম শুনে মার্গারেটের দু'চোখে আগ্রহের দীপ জ্বলে উঠল। সে ভাবল নবীন সন্ন্যাসী তার গুরু বিবেকানন্দের বইকেই হয়তো ঠাকুরের কথা বলেছেন। লন্ডনে তো স্বামীজি তাঁর গুরুকে ঠাকুর বলতেন। মার্গারেট ভাবল, প্রত্যেক শিষ্যই হয় তো তাঁর গুরুকে ঠাকুর বলে। নবীন সন্ন্যাসীও তেমনি তার গুরু স্বামী বিবেকানন্দকেই ঠাকুর বলেছেন মনে করে ব্যগ্রভাবে বইদুটি হাতে করে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। তার উৎফুল্ল কৌতূহল পাছে সন্ন্যাসীর মনে অন্য কোনো ভাবনা-চিন্তা উদ্রেক করে তাই তাড়াতাড়ি সে ভেতরের কৌতূহলকে চাপা দেবার জন্য বলল : কোন্ ঠাকুরের বই?—কথাটা বলে, নিজেই সমাধান করার জন্য একটু ভাবার অভিনয় করল নিজের সঙ্গে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জিগ্যেস করে ঠাকুব বলতে স্বামী বিবেকানন্দর লেখা কোনো বইয়ের কথা বলছে কি? প্রেমিকা নারীসুলভ লজ্জা ও সংকোচে হঠাৎ তার মুখ-চোখ রাঙা হয়ে ওঠল। একজন অচেনা সন্ন্যাসীর কাছে তার নির্লজ্জ প্রগলভতা পাছে প্রকাশ পায় তাই খুব কষ্ট করে নিজের কৌতূহলকে দমন করে সংশয় প্রকাশ করে বলল : কোন ঠাকুর? যীশু? কৃষ্ণ? না অন্য কেউ? বলার সময় তার ভুরু কুঁচকে চোখ দুটি ছোট হয়ে গেল।

শিক্ষকমশাই অত তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করল না। শান্তভাবেই তার ভ্রম দূর করতে বলল : উনি আমাদের সবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

মার্গারেটের প্রত্যাশা দপ করে নিভে যায়। তার বলার কিছু থাকে না। কেমন একটা বিব্রত লজ্জায় মুখ চোখ রাঙা হয়ে যায়। দেয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজেকে দেখতে পায়। নিজের অস্বস্তিকর অবস্থা গোপনের এমন ভান করল যেন কথাটা ভুল করে বলেছিল। এরকম অবস্থায় কেউ ভুল শুধরে দিলে যেমন লাজুক অপ্রতিভতায় সংকুচিত হয়ে পড়ে অনেকটা সেরকমভাবে মার্গারেট বলল : ও-হাঁ-হাঁ-নিশ্চয়ই।

সন্ন্যাসী ওর বিসদৃশ কথায় বেশ একটু থতমত খেয়ে যায়। বলল : কাজটা আজ থেকেই শুরু করতে বলেছেন স্বামীজি। আজ আপনি বইগুলো উল্টে-পাল্টে দেখুন।

নিজের মত ভাবনা চিন্তা করুন—কাল আমি আসব। কথাগুলো বলেই আর এক মুহূর্ত বসল না,-- সন্ন্যাসী পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

সাহেবপাড়ার হোটেলেই মার্গারেট আছে। সারাদিন কাজ নেই হাতে। তার মত কাজপাগল মেয়ের এভাবে চুপচাপ বসে থাকাটা যে কী দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক এমন করে আগে কখনো অনুভব করা হয়নি। জাহাজে আঠাশ দিন বন্দী অবস্থায় কেটেছে, তখন উপায় ছিল না বলেই মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনো হেতু আছে মনে হল না। দিনগুলোর অপচয় তার মর্মযন্ত্রণার কারণ হল। বসে, শুয়ে কারো দিন কাটে? হোটেলে মার্গারেটের দিন কাটতে চায় না। অথচ, লন্ডনে থাকতে মোটে সময় পেত না। মনে হয়, দিনগুলো রোজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়। কিন্তু এখানে দিনটা যেন থেমে আছে। তার কোনো তাড়াহুড়া নেই। যাচ্ছি-যাব ভাব। এখানকার মানুষগুলো পর্যন্ত সময় সম্পর্কে-উদাসীন। একটা দিনের অপচয় মানে যে বাঁচার এবং কাজের একটা দিন কমে গেল তার হিসেব করে হা-হুতাশ করার একজন মানুষও চোখে পড়েনি।

সময়ের অপচয় মার্গারেটকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ কষ্ট দেয়। সে তো একজন ভ্রমণকারী হয়ে এদেশে আসেনি। তাহলে সাহেবপাড়ার স্বজাতির লোকদের সঙ্গে থেকে তাদের সঙ্গে মেলামেশা গল্পগুজব করে সময় কাটিয়ে দেয়ার সার্থকতা কোথায়? স্বামীজির উপর মার্গারেটের রাগ হয়, অভিমান হয়। সেই যে প্রথম দিন এখানে রেখে চলে গেলেন তারপর একদিনও তার সঙ্গে দেখা করলেন না কেমন আছে, কিভাবে তার দিন কাটছে, কাজকর্মের শুরু করবে কীরূপে, কোথায় পাকাপাকিভাবে থাকবে তার কিছুই জানলেন না। জানানোর কথা ভাবেনও না। তার জন্য সামান্য উদ্বেগও কি তাঁর নেই? থাকলে, আলমবাজার থেকে যে কোনো মূল্যে এখানে আসতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি এলেন না। মেয়ে বলেই কি তার কাছে আসতে সংকোচ হয় তাঁর? -- প্রশ্নটা তার মনের ভিতর ঘুরতে লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে।

অথচ, এদেশের নারীশিক্ষার জন্য তাকে তো সমাদর করে আহ্বান করে এনেছেন? তা-হলে, এরকম নিস্পৃহ এবং নির্লিপ্ত থাকার অর্থ কি? অথচ, এই কাজটুকু করার জন্য কত উদ্যম এবং স্বপ্ন নিয়ে সে ভারতে এসেছে। কিন্তু কাজ আরম্ভের কোনো আয়োজন কিংবা পরিকল্পনা নেই তাঁর। কার্যত, স্বামীজি তাকে নিয়ে কী করতে চায়-কিছুই ভেঙে বলছেন না। অন্ধকারে থাকার জন্যই ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয় সে। স্বামীজি তাকে নিয়ে সত্যি কোনো অসুবিধেয় পড়েছেন কি না এবং কী ধরনের সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তাঁর মুখে শোনার জন্য অষ্টপ্রহর উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তবু সে মানুষটাব কাছ থেকে কোনো সাড়া আসে না, কেন? তাঁর কাছে কী অপরাধ

করেছে সে? স্বামীজির নিষেধ না শোনার জন্য কী রুষ্ট হয়েছেন তিনি? এজন্য কি কঠোর শাস্তি পেতে হচ্ছে তাঁকে? জাহাজে ওঠার আগেও তিনি চিঠিতে নিষেধ করেছেন তাকে — মার্গারেট এখানে না এসে ইংলন্ডে থেকে ভারতের জন্য বেশি কাজ করতে পার। কারণ নানারকম অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষে ভারতে কাজ করা কঠিন। এখানে য়ুরোপীয় ধরনের জীবনযাপনের সুযোগের ভীষণ অভাব। ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা প্রবল। সেভিয়ার দম্পতি আশ্রম জীবন-যাপন করছেন, কিন্তু তাতে ভারতের জনসাধারণের কোনো উপকার হবে না। গুডউইনের সঙ্গে অন্য-ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং নানারকম বাধা বিপত্তি তাঁকেও অসহিষ্ণু করে তুলেছে। তাই আমার ধারণা ইংলন্ডে থেকে তুমি ভারতের কথা বেশি বলতে পারবে। তোমার বাগ্মিতা ও লেখনী ইংলন্ডের জনগণকে ভারতের প্রকৃত অনুরাগী বন্ধুতে পরিণত করবে। সর্বোপরি, ভারতের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারেও তুমি বড় ভূমিকা নিতে পারবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের সংকল্পের জন্য ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। এসব শোনার পরেও যদি তুমি ভারতের কাজে এদেশে আস তবে তোমাকে শতবার স্বাগত। আবার বলি কাজে ঝাঁপ দেওয়ার আগে চিন্তা কর। আরো জেনে রেখ তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। মিস মুলার কিংবা অন্য কারো ছায়ায় আশ্রয় নিলে চলবে না। অনন্ত ভালবাসা জানবে। শেষের লাইনটি-এক অনির্বচনীয় আনন্দে তার মন ভরে দিল। গাঢ় আবেগে নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল : রাজা আমার রাজা। রাজা ডাকতে ভীষণ ভালো লাগে। অনির্বচনীয় সুখের অনুভূতিতে দুচোখ বুজে যায়।

ছ'মাস আগে লেখা স্বামীজির চিঠি। তবু সব কথাই ভীষণভাবে মনে পড়ছিল। ঐ চিঠি পাওয়ার পরই সে ভারতে আসার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। তার ভিতরটা এত অধীর হল যে, আবেগ চেপে রেখে তার সুস্থ থাকা মুশকিল হল। কোনো কিছুই গোপন করিনি রাজা। তীব্র ভালোলাগার সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের বাধাগুলি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা যেমন কর্তব্য তেমনি তার কাছে কিছু প্রত্যাশাও ছিল তাঁর। নিজের সুখের জন্য তাকে নাবলে স্বার্থপরের মত উপেক্ষা করতে পারবে না মার্গারেট। রাজার স্বপ্ন, সাধ প্রত্যাশা পূরণের কাজে যদি এজীবন উৎসর্গ করতে না পারল তাহলে বিবেকানন্দের মার্গারেট বলে আত্মগর্ব করা বৃথা হয়ে যায়। ভারতের সন্ন্যাসী তো তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। বরং বরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে দুষ্টু দুষ্টু চোখে যেন তার দিকেই চেয়ে আছে। সংশয়ের অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার দিকে ফেরান চোখে তাঁর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা। নিজেকে জানার ও বোঝার কৌতুকই তাকে ভারতের সন্ন্যাসীর দিকে প্রবল বেগে টেনেছে। সন্ন্যাসীও তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পালন করে বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছেন। তবু কিছু প্রশ্ন থেকে যায় মার্গারেটের। স্বামীজি তাকে সেভিয়ার দম্পতি কিংবা গুডউইনের মত কোনো সমস্যার চোখে দেখছেন কি? কথাটা মনে হওয়ায় একটা অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কায় তার ভেতরটা অস্থির হল। কিন্তু

স্বামীজি আলমবাজার কিংবা বেলুড়ে থাকলে তার সংকটের সুরাহা হবে কী করে এই প্রশ্নটা মার্গারেটকে অভিমানী করে তুলল। স্বামীজির ওপর তার ভয়ঙ্কর রাগও হল। স্বামীজি যে কি ভাবছেন তিনিই জানেন।

কার্যত হোটেলে সে একা। সারাদিন একা থাকলেই তাকে ভাবনায় পায়। তখন মনে হয় এভাবে পাগলের মত ভারতে আসা তার ঠিক হয়নি। আসলে মানুষ যা সহজে পায় তার কোনো দাম দেয় না। তাই বোধ হয় এত নির্মম অবহেলা। উপেক্ষার যাতনা ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। বিদেশিনী হওয়ার জন্যই কি স্বামীজি উপেক্ষা করছে তাকে? অথচ তার ভাবনায়, চিন্তায় এই মানুষটি ছিল সব। ওঁর দুর্নিবার আকর্ষণে 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,' তবু কী পেল সে? এরকম এক কঠিন হিসাব করে যখন কান্না পায়। কিচ্ছু ভালো লাগে না। এক বুক বিষাদ আত্মগ্লানি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কোলকাতার রাস্তায়। অস্থির মন নিয়ে চারপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সে ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরে ঘুরে দেখে।

বাইরে বেরোলেই মনের দিগন্তটা বড় হয়ে যায়। তখন অনেক তুচ্ছ, সামান্য জিনিসও অসামান্য হয়ে ওঠে। মনের মুক্তিকেই জীবনের আসল সম্পদ মনে হয়। তখন প্রশ্বাস নেওয়া, নিঃশ্বাস ফেলা এবং বেঁচে থাকার মানেটাও বদলে যায়। বেঁচে থাকার সুখ, আনন্দ সম্পূর্ণ এক অন্য ব্যাপার হয়ে যায়। নতুন করে আত্মবিশ্লেষণ শুরু হয়। বারংবার মনে হতে লাগল সব কিছুরই একটা মানে আছে। সে মানেটা মানুষকে আবিষ্কার করতে হয়। যে না পারে, বাইরে থেকে কারো সাধ্য নেই তাকে অনুভব করানোর। এসব তো জোর করে হয় না। মনের আলোয় আভাসিত না হলে বস্তুর যে নিজস্ব দ্যুতি আছে তা অনুভব করা হয় না। সব সুন্দর অনুভূতি বীজের মত সুপ্ত থাকে। মনের অভ্যন্তরে মনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে হয়। সাহেবপাড়া থেকে সেই দেখার কাজটা শুরু করতেই যে রাজা এই অভিজাত পাড়ায় তাকে রাখেনি কে বলতে পারে?

মার্গারেট ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার পাশে বসে তার মনের জবাব খুঁজতে লাগল। এদেশের কেউ নয় সে। তবু এখানে বসে থাকতে থাকতে বারংবার মনে হতে লাগল সে এই দেশেরই একজন। এর সঙ্গে তার জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক। কেন জানে না, তার সমস্ত মনের ভেতর এই দেশকে, দেশের মাটি, মানুষজন, এই দেশের আকাশ, বাতাস, ধুলোর গন্ধ, এর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সব কিছুকেই সে বড় ভালোবাসে। তার যা কিছু আবেগ, উত্তেজনা, তা শুধু এই দেশকে ঘিরেই। দেশ, জাতি, ধর্মের সীমা পেরিয়ে গেছে তার আবেগ। কিন্তু তার অগ্নিপরীক্ষা হয়নি আজও। মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিককে গভীর করে না জানলে কোনো জানাই সম্পূর্ণ হয় না। সেজন্যই বোধ হয় স্বামীজি প্রথম দিন থেকেই তার বাংলা ভাষা শেখার ব্যবস্থা করেছেন।

কেননা, আঞ্চলিক ভাষাই পারে একজন বিদেশিনী সমাজসেবিকাকে এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ওঠে ভাষা দিয়েই। ভাষায় কত সুধা আছে। কত বলবতী তার ধারা, কী তার বেগ, কত সহজে প্লাবিত করতে পারে মানুষের হৃদয়, জয় করতে পারে মনকে। সেই জানার অভিজ্ঞতা স্বামীজির লন্ডনের বক্তৃতা থেকে হয়েছে তার। আবার স্বামীজির গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ লোকভাষাতে জীবনের জটিল, দুরূহ, অমীমাংসিত তর্কের কত সহজেই সমাধান করে দিতেন। হৃদয়ের উষ্ণ পরশ লেগে থাকত তাঁর মুখের ভাষায়। জীবনের গল্প বলে মানুষের মনের অন্ধকারের ওপর চৈতন্যের আলো ফেলে তাকে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। মুখের ভাষাই মানুষকে বদলে দেয়, অমানুষ মানুষ হয়ে যায়। ভাষাতেই ভালোবাসা হয়ে যায়।

কোনো কোনো মানুষের জীবনই তো দীপ যা অন্যের পথে আলো ফেলে। পৃথিবীকে চিনতে শেখায়। স্বামীজি হলেন সেই শ্রেণীর এক আশ্চর্য মানুষ। তাঁর কথা মনে হলে একটা কিছু ভিতরে স্পন্দন তোলে। লন্ডন ছাড়ার আগে তাঁর কথা মনে পড়ে। মার্গো তুমি যে সংস্কারমুক্ত তাতে আমি নিঃসন্দেহ। তোমার গভীরে আছে জগৎকে টলিয়ে দেবার বীর্য। আমার এই বিশ্বাসকে জীবনের প্রতি কর্মে ফুটিয়ে তুলে প্রমাণ করতে হবে ভারতের জন্য নিজের সব কিছু উৎসর্গ করতে পার। অনন্ত প্রেম ও করুণা নিয়ে ভারতপ্রাণা হওয়াব কঠিন সাধনা যদি করতে পার তুমি তা হলে শতবার স্বাগত তোমাকে। তোমার মত বীর্যবতী মহিলাকে সামনে রেখে আমি এদেশের হিন্দুর গোঁড়ামি আর সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করব। তোমাকে আমার দেশে আসার অনুমতি দিয়ে এবং কাজের অধিকার দিয়ে আমি ভাঙনের সূচনা করব। পুরনো যা কিছু জীর্ণ তাকে না ভেঙে ফেললে নতুন করে কিছু গড়া হবে না। আমি আরো চাই, মঠের অভ্যন্তরে গুরু ভাইদের আত্মকেন্দ্রিক মনের বদ্ধ জানলা খুলে দিযে এক বৃহৎ পৃথিবীর খোলা আকাশের নীচে মহৎ কর্মের ছত্রছায়ায় তাদের দাঁড় করানোর এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে।

মার্গারেটের দু'চোখে নিবিড় বিহ্বলতা নামল। স্বপ্নাচ্ছন্ন দু'চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তার স্বপ্নের পুরুষ আজও অনেক অনেক দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তখন কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত অনুভূতিতে তার সারা শরীর কেমন অবশ হয়ে যায়।

ভাবতে ভালো লাগছিল স্বামীর প্রত্যেকটি কথা। আলমোড়া থেকে লেখা চিঠির কথাগুলো হঠাৎ তার মনে পড়ে—তোমার প্রত্যেকটি কথার দাম আছে আমার কাছে, প্রত্যেকটি চিঠিই হাজারবার সুস্বাগত। যখনই ইচ্ছা হবে সুযোগ মিলবে, আমায় চিঠি লিখো। যা মনে আসে তাই লিখো। তোমার কোনও কথাই ভুল বুঝব না। অবুঝ হয়ে উড়িয়ে দেব না। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে মনটা ভরে গেল।

মাথার ওপর নীল আকাশ। মেঘের কোল ঘেঁসে সাদা সাদা বকের পাঁতি উড়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ভাবাচ্ছন্ন আধচেতনার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়ে সে শুনতে পায়

স্বামীজির মধুশ্রাবী কণ্ঠস্বর। মার্গো, আমি ঐ অনন্ত নীলাকাশের মত। আমার ওপর দিয়ে নানা রঙের মেঘ ভেসে চলে যায়, কখনো বা একমুহূর্ত থাকে। তারপর আর দেখা যায় না। আমি আকাশের মত চিরন্তন নীলই থেকে যাই। আমি সব কিছুর সাক্ষী। আমার মনের মধ্যে তার সব অস্তিত্ব। আমি দেখি বলেই সে দেখে, নইলে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রকৃতিকে আমি যেমনভাবে দেখি, প্রকৃতি তেমন তেমন হয়। তাই আমার দেখার সঙ্গে আর কারো দেখার মিল নেই। আমি না দেখলে প্রকৃতির কিংবা বস্তুর কোনো রূপ, রঙ নেই। আসলে আমরা কেউ কিছু দেখতে বা কিছু বলতে পারতাম না যদি আমার নিজের জানাটা সম্পূর্ণ না হয়। বেদের মূল কথাই হল : আত্মানং বৃদ্ধি। অর্থাৎ, নিজেকে জান। কিন্তু মুশকিল কী জান? আপনাকে এই জানা কোনোদিন শেষ হয় না। অনেক অনেকদূর থেকে বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এল রাজার কথাগুলো। অমনি কি একটা না পাওয়ার শূন্যতায় বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল। মনে মনে বলল : রাজা তুমি এখন কত কাছে, তবু একবার তোমার মার্গোকে ফিরেও দেখলে না। তোমাকে নিষ্ঠুর বলতে বুক ফেটে যায়। তবু বলব নিজেকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ। আর কেউ না জানলেও আমার মনের চোখ দিয়ে দেখেছি তোমার মুখের হাসির নিঃশব্দ ঝরনায় আমার হাসি যখন মেশে তখন হাজার বাতির আলোয় ঝলমল করে তোমার মুখমণ্ডলে। কী ভালো যে লাগে তখন! কথাগুলো এভাবে মনে হতে বুক কাঁপিয়ে মার্গারেটের গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

চারিদিক থেকে শীতের বিকেল দ্রুত আঁধারের ঢেকে যাচ্ছে বলে মার্গারেট উঠে দাঁড়াল। থমধরা বিষাদমাখা এক গভীরবোধে তার কেবলই মনে হতে লাগল তার মধ্যে এক নতুন জীবনের সূচনা হচ্ছে। কিন্তু কেমন হবে এই দ্বিতীয় পর্বের জীবন? এই প্রশ্নটা তার অনুভূতির মধ্যে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল।

শিল্পী বন্ধু এবেনজার কুক সব সময় বলত সব ছবিরই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চাই। জীবন এবং ছবির পটভূমিই হল আসল। নইলে, জীবন ও প্রকৃতি একেবারে 'ডাল'। সব সময় ছবিকে একটা ফ্রেমের মধ্যে রাখতে হয়। তবেই তার রূপ খোলে এবং বাচ্যার্থ হয়ে ওঠে। যেমন মনে কর মুক্ত নীল আকাশে শুভ্র মেঘপুঞ্জের মধ্যে অন্তত একটা ডানা মেলে দেওয়া পাখি রাখলেও চলবে। ঐ পাখিটার মত গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত নীল আকাশও ভীষণ একা। নইলে সৌন্দর্যের মধ্যিখানে বসেও প্রাণহীন সে। অনুরূপভাবে শুধু মানুষকে নিয়ে বিষাদমাখা পরিবেশের মধ্যে তার নিঃসঙ্গতার হাহাকার শূন্যতাকে গভীর করে বোঝাতে পটভূমিতে যদি একজন জেলে জাল ছুড়ে দেয় আকাশের দিকে তাহলে একই সঙ্গে ঐ শূন্যতা গভীরভাবে ফুটে উঠবে। শূন্যের বুকে ছড়িয়ে পড়া জালটা যেমন জেলের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নীল আকাশের কাছে ভিক্ষে চাইছে। আর ঐ জাল যেমন অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া নদীর কাছে আশ্রয় চাইছে, তেমনি ছবির মানুষটার নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, অসহায়তা, আশ্রয়হীনতা এই পটভূমিতেই ফুটবে। আকাশ, নদী, জলে ছাড়া ছবির মানুষের

বিষাদ, একাকিত্ব নিজে নিজে ফোটে এমন সাধ্য কি?

এবেনজার কুকের কথাগুলো শিল্পীর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করা বলেই এত সত্য ও মর্মস্পর্শী। এত গভীর করে নিজের কথা ভাবা হয়নি মার্গারেটের। এই ছবি তার জীবনের মতই সত্য। ছবির ক্যানভাসে নিঃসঙ্গ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো জালের মত শূন্যের গায়ে অনন্তকাল ধরে লেগে থাকবে একটা আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। সেই আশ্রয় তো তার স্বামীজি। কাছে না থাকলেও শূন্যের গায়ে লেগে থাকার জালের মত মনের আকাশে ছড়িয়ে আছেন তিনি। ছবির মত অনন্তকাল ধরে থাকবেনও। কিন্তু মানুষ তো শুধু ছবি নয়, তার রক্তমাংসের মন আছে একটা। সেই মনটা সর্বক্ষণ ভালো লাগার মানুষকে কাছে চায়। একটু সান্নিধ্য, একটু চোখের দেখা, কিংবা দুটো কথা বলার জন্য তাকে তো একটু দরকার হয়। বাতাসের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে তো কথা হয় না। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি বেসুরে রয়ে গেলেন। তিনিও জানেন না বুকের গভীরে কত ধরনের দ্বন্দ্ব, সংশয়, ভয়, আতঙ্ক সর্বক্ষণ অস্থির করে তাকে। মার্গারেটের জন্য তাঁর বুকে যদি একটু দরদ, মমতা, সহানুভূতি থাকত তা-হলে এত নির্দয় হতে পারতেন না। অথচ একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হল ভালবাসা এবং মমতা। সেজন্য প্রত্যেকেরই একটু সময় দিতে হয়। দিনান্তে মনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভালোবাসার মুখ না দেখলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। মানুষ যে রোজ প্রাণপাত পরিশ্রম করে সে তো ভালোবাসার জন্যই। ভালোবাসা থাকার জন্যই কাজে আনন্দ পায়। এই ভালোবাসা, প্রেম তার মধ্যে আছে বলেই তার চারধারে ঘিরে অন্যান্য সব সম্পর্ক আছে নইলে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ত এ দুনিয়া। ভালো না বাসলে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যেত। ভালোবাসাহীন জীবন কোথাও নেই। সন্ন্যাসীর বুকেও ভালোবাসার ফল্গুনদী বইছে। নইলে, মানুষকে ভালো রাখতে সুখী করতে সুন্দর হতে তাঁর মত নিঃস্বার্থভাবে এত বেশি কেউ চায়নি। দেশের স্বার্থেই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেলেও ভালোবাসার সুখ স্মৃতি বুকে নিয়ে এই পৃথিবীকে সুন্দর মানুষদের বাসযোগ্য করে যাওয়ার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। একী কম কথা! ভালোবাসার মানুষ সুন্দর হোক, মহান হোক এই আকাঙ্ক্ষা স্বামীজির কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলে অসুন্দরের জঞ্জাল সরানোর জন্য পাশ্চাত্য থেকে মানুষ ধার করে এনেছেন। দেশের মানুষের প্রতি যাঁর এত ভালোবাসা, বুকভরা মমতা তাঁকে নির্দয় রক্তমাংসের পাষাণ বলতে মার্গারেটের বুক ফেটে যায়। হৃদয় নিংড়ে দিয়েই হয়তো হৃদয় ভরে ওঠে তাঁর। তারপরে হয়তো চাওয়ার কিছু থাকে না। তা যদি না হয়, নারায়ণের বুকে ভৃগুর পদচিহ্ন আঁকা কেন? ভালোবাসা হারায় না, ভালোবাসা গাঁথা থাকে। সেই ছোট্ট অথচ বৃহৎ চাওয়া ফুলের গন্ধের মত অন্য মানুষের মনে স্নেহ-ভালোবাসার সমুদ্র হয়ে মিশে যেতে চায়। তাতেই মনটা পর্যাপ্ত প্রাপ্তিতে ভরে ওঠে। কিন্তু সে তো সন্ন্যাসিনী নয়। এভাবে নিজের সঙ্গে ফাঁকির

বাঁশি বাজাতে তার ভীষণ কষ্ট হয়। অথচ, স্বামীজি একটু চাইলেই তাঁর সান্নিধ্য দিয়েই তাকে ভরে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি আশ্চর্যভাবে রইলেন আত্মমগ্ন। সে কথা মনে হলে নিজেকে বড় বিড়ম্বিত মনে হয়।

বিকেলের স্নিগ্ধ সান্ধ্য মুহূর্তে ইডেনে একটা স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তবু একটা দারুণ অতৃপ্তিতে মনটা বিষণ্ণ হয়ে থাকে। দারুণ ক্ষোভে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যায়। কোথা থেকে হঠাৎ বুকের মধ্যে এক সুখের দপদপানি অনুভব করে। রাজার কথাই ভাবে। তার মত ইন্টারেস্টিং মানুষের কথা ভাবতে ভালো লাগে। তার মত মানুষের নিজের জন্য কিছুই প্রয়োজন নেই। কিন্তু চারপাশের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা গভীর। মানুষের বেঁচে থাকার পটভূমিই হল গভীর, গাঢ়, নিরুচ্চার ভালোবাসা। ভালোবাসার ফ্রেমে জীবনের ফটোগুলো আটকানো আছে। ঐ বন, নদী, পাহাড়, আকাশের তারা যেমন করে ভালোবাসে পৃথিবীকে, রাজার ভালোবাসা অনেকটা সেরকম। প্রতিদিন তার সুযোগ-সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর করে রাজা তার মনের স্পর্শ পৌঁছে দেয়।

অন্ধকার হওয়ার আগেই সে উঠে পড়ল। একা পথ চলতে চলতে তার মনে হতে লাগল, জীবনও একধরনের ফটোগ্রাফি। ভিউ ফাইন্ডারের ভেতর তাকে ও স্বামীজিকে পটভূমি সমেত মঞ্চে ধরানো যাচ্ছে না। বোধ হয়, যাবে না কোনোকালে।

গভীর এক বিষাদে অভিভূত হয়ে সে আপন মনে হাঁটছিল। আজ কোনো সঙ্গী ছিল না তার। একেবারেই সে একা এবং নিঃসঙ্গ। পথের দু ধারে গ্যাসের বাতিগুলো মিট মিট করে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল ওরাই রাজার লক্ষ লক্ষ চক্ষু হয়ে অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখাচ্ছে। মূক মানুষের মত অনন্ত প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকেই নীরবে চেয়ে আছে যেন।

মাত্র ক'দিনেই পার্ক স্ট্রিট হোটেলে মার্গারেট হাঁফিয়ে উঠল। সে কথা স্বামীজির কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হল না। তার অসহিষ্ণু হওয়া একটুও দোষের নয়। সে কাজপাগল মেয়ে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের ভার তাকে দেওয়া যায়নি। কী কাজ করবে তার কোনো কর্মসূচি নেই। কাজ ছাড়া চুপচাপ দিন কাটাতে কার ভার লাগে? মার্গারেটের হাঁফিয়ে ওঠার মধ্যে কোনো অন্যায় ছিল না। সব দোষ স্বামীজির নিজের।

স্বামীজিও সে কথা বোঝেন। এই মহিলা রোজ তাঁর পথের দিকে চেয়ে থাকে। চোখে না দেখলেও তার ব্যাকুলতা অনুভব করেন। খুব লোভ হয় তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, কী বা করতে পারেন? মার্গারেটের প্রতি যথেষ্ট কর্তব্য না করার জন্য একধরনের অপরাধবোধ ছিল তাঁর মনে। অন্য কেউ না জানলেও তিনি তো জানতেন এই বিদেশিনী মহিলা তাঁর চিত্তে কতখানি স্থান দখল করে আছে। ঐ মহিলা তাঁর স্বপ্নের, তাঁর জাগরণের। ওর কাছে তাঁর অনন্ত দাবি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেমন তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্যকে, তেমনি মার্গারেটের মধ্যে খুঁজে পেলেন বিবেকানন্দও ভারতাত্মার মর্মবাণীকে তাঁর মন্ত্র সাধিকাকে, যে তাঁর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

বিবেকানন্দের চোখের ওপর ক'দিন আগের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। পার্ক স্ট্রিট হোটেল থেকে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, মার্গারেটও তাঁর সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে তাঁর পদধূলি নিল। বিবেকানন্দের অধরে স্মিত হাসি। বললেন : মার্গো এবার আমার উঠতে হবে। পথে অনেক ধকল গেছে। এবার একটু বিশ্রাম নাও। ঠিক সময়ে তোমাকে ডেকে নেব। পারলে, আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। শুভস্য শীঘ্রম।

মার্গারেট শান্ত গভীর, নীল চোখ দুটি মেলে ধরল ওর দীপ্ত দুটি চোখের ওপর। স্বামীজির মনে হল অনন্ত নীল আকাশ যেমন বন নদী পাহাড়কে দেখে অনেকটা সেরকমভাবেই চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। সেই চেয়ে থাকার ভেতর কোনো দাহ ছিল না। শান্ত স্নিগ্ধ নীরব হেসে সে শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। তার ঐ নীরব হাসিটা এখনও তাঁর দু'অঞ্জনে লেগে আছে।

অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল বিবেকানন্দের। মার্গারেট তাঁর জন্য যতই ব্যস্ত হোক না কেন, শুয়ে-বসে ছিল না ঘরে। বসে থাকার মেয়েই নয় ও। ঝড়ের আগে চলে। ওকে ধরে রাখা যায় না। দূর্বাঘাসের মত একই জায়গা নড়ে চড়ে, সরে সরে চারদিকে নিঃশব্দে চারিয়ে গিয়ে এক সবুজ প্রান্তর সৃষ্টি করে কত প্রাণীর আহার যোগায়। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বড় থেকে বড় তার থেকে আরো বড় হতে হতে এত বেশি জীবন্ত স্পষ্ট ও চোখ ধাঁধানো এমন এক ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় যখন মনে হয় সাগরে যাওয়া নদীর মত সে চলেছে আপন পথে নির্ভয়ে। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে অনন্ত জীবনের অভিমুখে। জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে ছুটে চলার জন্য পাহাড় প্রমাণ শৌর্যের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু আন্তরিক দাক্ষিণ্য আর মায়ের মমতা। পিতার কর্তব্য, বন্ধুর সহমর্মিতা। মার্গারেটের মধ্যে তা বিপুল পরিমাণে আছে। আরো আছে সাহস আত্মপ্রত্যয় এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা।

কথাগুলো হঠাৎই তাঁর মনে হল। এক আশ্চর্য গর্ব, আনন্দের মধ্যেও বুকটা তাঁর হু-হু করে উঠল। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন নিচের ঠোঁট!

বাগবাজারে রমাকান্ত বসু স্ট্রিটে রামকৃষ্ণপ্রাণ জমিদার বলরাম বসুর বাড়ি। সেখানে মাঝে মাঝেই বিবেকানন্দ আসেন। এই গৃহ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত এক মন্দির। এখানে ঠাকুরের দেহাবশেষ আছে বলেই রোজ পুজো, আরতি হয়। অনেক ভক্তও আসেন। বলরাম বসুর বাড়ি ছিল ঠাকুরের ভাষায় 'বাগবাজারের কেল্লা।' এই কেল্লায় বসে ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন সংঘ প্রতিষ্ঠার

প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর এই গৃহকে বাগবাজারের কেল্লা কেন নাম দিয়েছিলেন বিবেকানন্দও জানেন না। ঠাকুরের কথাকে সত্য করে তোলার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনেব কর্মসূচি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে মার্গারেটকে সেখানে ডেকে পাঠালেন।

বিবেকানন্দ অনেক ভেবেই মার্গারেটকে বলরাম বসুর গৃহে আনার বন্দোবস্ত করলেন। বলতে গেলে এটাই ছিল কোলকাতায় আসার পর মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। এটা হোটেলেও হতে পারত। কিন্তু একটা নিছক মামুলি দেখা-সাক্ষাতের মূল্য কি? সাক্ষাতকারটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে একমাত্র বলরাম বসুর গৃহে। মার্গারেট খ্রীস্টান গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে। কাজেই হিন্দুসমাজের মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা কোনো সুযোগ নেই মার্গারেটের। অনেকরকম বাধা আছে। প্রথম সাক্ষাতেই সেই প্রতিবন্ধগুলো দূর না হলে তার নারী শিক্ষার কাজ বিলম্ব হবে। সর্বাগ্রে তাকে বরণ করে নেওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বিনা বাধায় রামকৃষ্ণেব বাগবাজারের কেল্লাতেই তা হতে পারে কেবল। রামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়েব গুরু। জাত-পাতের সংকীর্ণতা নেই তাঁর ধর্মমতে। তাই মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকাবেব উৎকৃষ্টস্থান এই বাগবাজারের কেল্লা। রামকৃষ্ণ ভক্তদের সমক্ষে মার্গারেট বরণের কাজটা বিবেকানন্দ খুব সাবধানে করা স্থির করলেন। তাঁর মনের অভিপ্রায় কেউ জানতে পারল না।

বিবেকানন্দের আবো মনে হয়েছিল, বলরাম বসুর গৃহে এই সাক্ষাৎ সফল হলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। সম্ভ্রান্ত অভিজাত হিন্দু পরিবারের গৃহে তার এই আগমনটা লোকে অনেককাল মনে রাখবে। হিন্দু মেয়েদের আলোচনার পাত্রী হয়ে উঠবে। মার্গাবেট সম্পর্কে তাদের কৌতূহলের বন্ধপথ ধরে কালক্রমে এই বিধর্মী বিদেশিনী মহিলা হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশে যাবে। উত্তর কোলকাতাই হয়ে উঠবে তার কর্মক্ষেত্র। রামকৃষ্ণ নামের পতাকা নিজের হাতে কেল্লাতে উত্তোলন করবে। বিবেকানন্দের চিন্তাসূত্র সহসা ছিন্ন হল। বিস্ময়টা বেশ কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে অভিভূত কবে রাখল। বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎই তাঁর ভেতরটা উদ্ভাসিত হল। তিনি তো একান্তভাবে চেয়েছিলেন মার্গারেটকে মা সারদামণির কাছে রাখতে। কিন্তু সেই সময় তিনি কোলকাতায় না থাকায় সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। তবে কি ঠাকুর চান্‌নি? নিজের কেল্লাতে সকলের মধ্যে মার্গারেটকে বরণ করতে চান বলেই কি তাঁর মাধ্যমে সাদা সাদা মানুষের দেশের মেয়েকে এখানে ডেকে এনেছেন। কথাটা মনে হতে তাঁর ভেতরটা চমকাল। কে যেন ভর্ৎসনা করে বলল : কার নির্দেশে কী হল তা ভেবে তোর কী লাভ? তুই কাজ করার মানুষ, কাজ করে যা। কৃপার বাতাস সব সময় বইছে, তুই শুধু পাল তুলে দে। কেউ-কাউকে কিছু দিতে পারে না। নিজের নিয়তি নিজের হাতে। তা নিয়ে গুরুর দেমাক করার কিছু নেই। গুরু শুধু পথের সঙ্কেত দিতে পারেন, পথ চলতে হয় নিজের জোরে, নিজের নিষ্ঠায়। বীজের শক্তিতে

গাছ হয়, পারিপার্শ্বিক অথবা জলবায়ু আনুষঙ্গিক সহায়মাত্র।

স্বামীজির খুব আশ্চর্য লাগল : একহাট লোকের মাঝে তাঁকে উদ্দেশ করে কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু নিজের শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে কথাগুলো স্পষ্ট শুনেছেন। তা-হলে ও কার নির্দেশ তিনি শুনছেন? বিবেকের না ঠাকুরের? ঠাকুরের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। কৃতার্থ হওয়ার হাসি।

বাইরে একটা ঘোড়াগাড়ি এসে দাঁড়াল। শ'খানেক ছোট-বড় ছেলে-বুড়ো ঘোড়া গাড়ির পিছন পিছন এল। পাড়ায় মেম আসার খবরটা রটে যেতে বিলম্ব হল না। তাকে দেখার জন্য বেশ একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। কেউ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, কেউ হাতের কাজ ফেলে পথে এসে ভিড় করল। ওদের উৎসুক ও কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে মার্গারেট সাদা ফ্রক পরে পরীর মত স্বচ্ছন্দে নেমে এল। যারা তাকে দেখার জন্য এসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে মার্গারেট মিট মিট করে হাসল। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। হাত নেড়ে প্রত্যেককে অভিবাদন করল। তারপর উৎসুক মানুষদের দিকে একবার আর একবার পথের দিকে তাকিয়ে সে বলরাম বসুর বাড়ির বহির্মহলে প্রবেশ করল। সেখানে যাঁরা ছিলেন অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মার্গারেটের অপূর্ব দেহলাবণ্যের দিকে তাকিয়ে বিমোহিত হয়ে গেছিলেন। বিবেকানন্দ নিশ্চিত মনে হুঁকো টানছিলেন। মার্গারেট সর্বাগ্রে রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রণাম করল। তারপর সমবেত রামকৃষ্ণ ভক্তদের সশ্রদ্ধ নমস্কার করে ভক্তিভরে আচার্য-বিবেকানন্দের পদধূলি নিল। চোখের ইঙ্গিত করে মার্গারেটকে বসতে বললেন।

বিবেকানন্দ হুঁকো টানা শেষ করে বৈঠকী মেজাজে বললেন, ঠাকুরের স্বপ্নে দেখা সাদা সাদা মানুষের দেশের মেয়ে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ঠাকুরের কাজ করতে এদেশে এসেছেন। ঠাকুর ওকে ভারতপ্রাণা করে ভারতে এনেছেন। লন্ডনে ওয়েস্ট এন্ডের একটি বৈঠকখানায় ওকে আমি প্রথম দেখি। একজন শ্রোতা হয়ে আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিল। আইরিশ ধর্মযাজক পরিবারের মেয়ে হলে কী হবে বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিবাদ ওকে নাস্তিক করেছিল। ঠাকুরের সংস্পর্শে আমার যেমন নবজন্ম হয়েছিল তেমনি ভারতাত্মার মর্মবাণী ওকেও এক নতুন মার্গারেট করেছে। বৈরাগ্য ও সাধনার আগুন জ্বলছে ওর মধ্যে সহস্রশিখায়। ঠাকুর ওর মধ্যে যে জীবনযন্ত্রণা দিয়েছেন তা ওকে ভারতের জন্য অধীর ও আর্ত করেছে। ভারতসেবা মার্গারেটের ভবিতব্য। ঠাকুরের ইচ্ছে না থাকলে তার সঙ্গে আপনাদের আলাপ পরিচয় হত না। অনেক সময়েই আমার মনে হয় ঠাকুরের কাজের রূপ দেওয়ার জন্য তাকে সফল করার জন্য মার্গারেটের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেজন্য তাকে আসতে বলেছি।

সবাই তন্ময় হয়ে স্বামীজির কথা শুনছিল। মার্গারেট এক ঘর অপরিচিত লোকের মধ্যে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। কিন্তু সকলের ব্যবহার বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ এবং

আন্তরিক ছিল বলেই দ্বিধা ও সংকোচের ভাবটা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছিল।

উপস্থিত ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করল : হোটেলে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মার্গারেট একটু লাজুক হেসে বলল : এমনি কোনো অসুবিধে নেই।

অন্যজন বললেন : নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ তো। ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগবে। অবসর সময় কেমন করে কাটে?

স্বামীজির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : অবসর পাই কোথায়? বাংলা ভাষা শেখার জন্য অনেকটা সময় দিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বিবিধ গ্রন্থ পড়ি। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলি উল্টে-পাল্টে দেখতে অনেক সময় লেগে যায়। তারপর যেটুকু সময় পাই কোলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘুরে দেখি। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেই। এত মুক্তির শ্বাস ভারতে আর কোথাও নেই। গঙ্গা হল জীবন্ত ভারতবর্ষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য নিয়ে ভারতের গর্ব তার দর্শন এই গঙ্গার ঘাটেই মেলে। এ শুধু ভাবময় নয়, প্রাণময় এক ঐক্য। গঙ্গা হল মহামানবের সাগরতীর। শত শত স্নানার্থী যখন গঙ্গায় স্নান করে সম্প্রদায়ের গণ্ডিটা মুছে যায়। কে কোন জাতের মানুষ, কোন সম্প্রদায়ের লোক, কার ছোঁয়া কার গায়ে লাগল কেউ মনে রাখে না। গঙ্গার জলই সবাইকে পবিত্র করে দেয়। মানুষের সঙ্গে মানুষেব সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সত্তার গভীরে এমন এক মহাভাবের সঞ্চার হয় যেখানে জাত-পাত-সম্প্রদায় থাকে না। সবাই ঈশ্বরের সন্তান—অমৃতের পুত্র এবকম একটা বোধের আলো পড়ে তাদের অন্তরটা বড় হয়ে যায়। কুসংস্কার ঘুচে যায়। আচার-প্রথা-সংস্কার মুছে যায়। অন্য.এক বোধ বড় হয়ে ওঠে। গঙ্গা তখন আর নদী থাকে না—হিন্দুদের আদিমতম ঐক্যস্বরূপিনী শক্তি হয়ে ওঠে ; যা বহু অনৈক্য ও বিভেদের ঊর্ধ্বে মানুষকে মিলিত করে একত্রিত করে। বিশ্বাস করে পবিত্রতাই গঙ্গার ধর্ম। যে ধর্মবোধ মানুষকে মহান করে, সুন্দর করে ঐক্যবদ্ধ করে। তাই বোধ হয়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ গঙ্গার তীরে বসে ধর্মসমন্বয়ের তপস্যা করেছিলেন। ভারতবর্ষকে আমি খুব কম জানি, তবু মনে হয়েছে গঙ্গাই ভারতের আত্মা এবং কৃষ্টি।

মার্গারেটের বাগ্মিতায় শ্রোতারা অভিভূত হয়ে যায়। গঙ্গাকে, গঙ্গার তীরে খুঁটিনাটি প্রতিটি ঘটনাকে এমন গভীর করে অনুভব করেছে খুব কম ভাবতীয়। সমস্ত জীবনটা গঙ্গার পাশে কাটিয়ে দিয়েও তারা ভাবতীয় হয়ে যা পারল না, মার্গাবেট একজন বিদেশিনী হয়ে মাত্র কয়েকদিনে গঙ্গার যা কিছু মহিমা তার সবটুকু মর্ম দিয়ে উদ্‌ঘাটন করেছে।

যে আশ্চর্য মেধাবলে গঙ্গার ঐতিহ্য সে বিশ্লেষণ করল তাতে একজন ভারতীয় হিসেবে বিবেকানন্দের গর্ব হলো। নিজের অজান্তে চোখের কোণে নীরব হাসি ঝিলিক মেরে গেল। মনে মনে বলল : মার্গো সত্যি তুমি অসাধারণ। তোমার কোন তুলনা নেই। তুমি আমার গর্ব। সম্মান বাঁচিয়ে তুমি আমাকে ধন্য করলে। মার্গো যা কিছুই

ভালোলাগার মানুষের জন্যে খুশিমনে করে, তাইই শুধু থাকে জীবনে। সেইটুকু আনন্দ এবং গর্বই বুকের মধ্যে বেঁচে থাকে। আর যা কিছুই হয় নিজের বাহাদুরি দেখানোর জন্য বা অন্যের হাততালি পাবার জন্য তার কিছু মাত্র থাকে না অন্যের মনে।

হঠাৎই স্তব্ধতা নামল বৈঠকখানার ঘরে। মার্গারেট অসহায়ভাবে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, কত মানুষই তো দেখে রোজ। জীবনভর চলে এই দেখাশোনা। কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে মনের মানুষ থাকে কজন? সকলকে কি মনে ধরে? যাকে মনে মনে চাওয়া যায় সেই তো মনের মানুষ। সেই মানুষটার সঙ্গে দেখা করার জন্য সকাল থেকে উৎসাহের সঙ্গে উৎকর্ণ ও উন্মুখ হয়ে ছটফট করছিল সারাক্ষণ। দেখা যদিও বা হল একঘর লোকের মধ্যে তার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করে, সংকোচ লাগে, অস্বস্তিও হয়।

সময় যেন পাথরের মত ভারি হয়ে বসে রইল। মার্গারেটের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। নিজের সঙ্গে মানুষটা কেন যে অমন লুকোচুরি খেলে ঈশ্বরই জানেন। অথচ, অবচেতনের গভীরে সে নিঃশব্দে তার অন্তরাত্মার কাছে অসহায়ভাবে মাথা কুটছিল। মার্গারেট ঐ নীরব অর্থপূর্ণ হাসির সঙ্গে তাকে অনুভব করল।

নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে মার্গারেট বিবেকানন্দের দিকে চেয়ে বলল: একটু পরেই সন্ধে হবে। অনেকখানি পথ যেতে হবে। এদিকটা একেবারেই অচেনা। চারদিকে ছোটবড় অচেনা গলি, পথটাও বড় চাপা। এখানে-ওখানে ষাঁড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুরের দল কামড়া-কামড়ি করছে। এখান থেকে একা যাওয়াই কষ্টকর।

বিবেকানন্দ ওর কথা শুনে হাসলেন। মার্গারেটের মনের কথাটা বুঝতে তাঁর কষ্ট হল না। একধরনের চাপা অপ্রকাশ্য আনন্দে বললেন, এখানে যখন এসেছ, সব দায়িত্ব আমার। শরৎ তোমার ঘোড়াগাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে।

বিবেকানন্দর রুক্ষ কথার প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না। বরং এমন ভাব করে বসে রইল, কথাটা যেন তার কানে পৌঁছয়নি। বিবেকানন্দের উদাসীনতায় ও একটু ক্ষুণ্ণ হল। গভীর এক অপমানে তার কান রি রি করে জ্বলতে লাগল। মুখখানা আপেলের মত রাঙা হল।

বিকেলের কম আলো পড়ে ওর বিষাদমাখা মুখখানা আরো বিবর্ণ ও করুণ দেখাল। বিবেকানন্দ অসন্তোষ চাপা দেবার জন্য বললেন : তোমার অন্য কোনো কথা থাকলে পাশের ঘরে বস। ওখানে শরৎ আছে। আমি আসছি।

বিবেকানন্দ বেশ বিলম্বেই এলেন সেখানে। অবহেলায় অপমানে মার্গারেট ভেতরে গোমরাচ্ছিল। অভিযুক্ত হওয়ার আগেই উৎফুল্ল ভাব প্রকাশ করে বললেন : মার্গো, তুমি আমার সম্মান বাঁচালে। মনে ভয় ছিল। সময়কালে সবার কাছে আমার মাথাটা উঁচু করে দিয়েছ। ঠাকুরের বিদেহ আত্মা এখানে আছে। আমি তাঁর উপস্থিতি টের পাই। মনে হয় তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তিনি থাকলে আমার কোনো ভয়

থাকে না। আমি জানতাম তাঁর আশীর্বাদে তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। অন্য কোনো বিদেশিনীকে নয়, শুধু তোমাকে ঠাকুরের সামনে হাজির করেছি। উনি তোমাকে মেনে নিয়েছেন। আমার ভয়ের আর কিছু নেই।

মার্গারেট রাগে অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। মার্গো ডাক শুনলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। হঠাৎই দুর্বলতায় ভিতরের সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। কষ্টে মন ভরে যায়। রাজার কথাগুলো জলতরঙ্গের মত বাজতে লাগল তার বুকের ভেতর। রাগ অভিমান সব জল হয়ে গেল। তবু এক আশ্চর্য সংযমে সে শান্ত স্থির হয়ে রইল।

মার্গারেটের রহস্যময় আচরণ বিবেকানন্দকে অবাক করল। যখন তার ভীষণ উৎফুল্ল হওয়ার কথা, তখন ভদ্রতা রক্ষার জন্য সে একেবারে মৌন এবং নির্বিকার। কথাগুলোর কোনো গুরুত্বই দিল না। অন্তত একটু হেসে তো ঠাকুরের কৃপা সম্পর্কে কিছু বলতে পারত। নিরুত্তর থেকে তাঁকে শুধু হতাশ করল না। প্রত্যাশাকেও বিদ্ধ করল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বিবেকানন্দই জিগ্যেস করলেন : তোমার বাংলা শিক্ষা কেমন চলছে? কতটা আয়ত্ত হল? হোটেলে তোমার দিন কাটে না শুনতে পাই। কিন্তু যেভাবে দিনযাপন কর এর থেকে বেশি ভালো করে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার নেই।

মার্গারেটের মনে হয় স্বামীজির কথাবার্তা ভীষণ আন্তরিকতাশূন্য, একেবারে মামুলি। এর মধ্যে হৃদয়ের উষ্ণতা নেই। তাঁর নিরুত্তাপ কথাবার্তা একটুও ভালো লাগল না। এদেশের মানুষগুলো যেন কেমন। নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কটা বড় দূর দূর। প্রকাশ্যে একজন নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে তাদের সংকোচ একধরনের লজ্জা ও দ্বিধায় আড়ষ্ট থাকে সর্বদা। কেন? এতে দোষ কি? মার্গারেটের ভিতরটা রাগে অভিমানে টাটাচ্ছিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : আপনি তো বলেছিলেন আমরণ আমাকে তোমার পাশে পাবে।

বিবেকানন্দ একটু হাসেন। বললেন : আমি তো তোমার পাশে বন্ধুর মত আচার্যের মত, পথ নির্দেশকের মতই আছি। পাশ্চাত্য থেকে ভারতের কাজে আর যে সব মহিলা এসেছেন তাদের জন্য আমার খুব মাথাব্যথা নেই। শুধু তোমার জন্যই আমার ভাবনা হয়।

রাগের গায়ে বাতাস লেগে মার্গারেটের ভেতরটা দপ করে জ্বলে উঠল। বলল : আপনাকে ভাবতে কে বলেছে? এতই ভাবছেন যে আজ পর্যন্ত কাজকর্মের কোনো বন্দোবস্ত হয়নি। কাজের পরিকল্পনা নিযে কোনো আলোচনা হয়নি। কবে থেকে আমার স্কুল চালু হবে, কোথায় চালু হবে তার কিছুই জানি না। তবু আমার জন্য কত কি ভাবছেন? আমি যেন আপনার খেলার পুতুল। যখন ভালো লাগল নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, তারপর তুলে রাখলেন। আপনার এটুকু অনুগ্রহ না হলেও আমার চলবে।

ওর ছেলেমানুষী রাগ-অভিমানে বিবেকানন্দ কিছুমাত্র উত্তেজিত হলেন না। নরম চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন : অবুঝ হয়ো না। আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। আর কেউ না বুঝলেও চলে কিন্তু তুমি অবুঝ হলে বড় অপরাধী মনে হয় নিজেকে। একটু ধৈর্য ধর। সব হবে। শীঘ্রী হবে। সব ঘটনারই একটা নির্ধারিত সময় থাকে। গাছে কুঁড়ি ধরার, ফুল ফোটার, ফল হওয়ার এবং তার ঝরে পড়ারও।

ওঁর কথার মধ্যে এমন একটা আকুতি ও অসহায়তা ছিল যে মার্গারেটের মনটা সহসা নরম হয়ে গেল। বিধুর হয়ে গেল তার চোখের দৃষ্টি। মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে বলল : মনটা ভালো নেই। রাগের মাথায় বেফাঁস কথা বলে যদি আপনার মনকে আর্ত করে থাকি তাহলে আমাকে মাপ করে দিন। সত্যি মনটা ভালো নেই। আপনি একটু খোঁজ করেন না আমার। অথচ এখানে আপনি ছাড়া আপনজন কে আছে, যার কাছে নিজের দুঃখের কথা, ক্ষোভের কথা বলে একটু—হাল্কা হতে পারি।

ভেজা দুচোখের কোণ দিয়ে মার্গারেটের দু'ফোঁটা জল মুক্তার মত তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল গাউনে। মনের ভাব গোপন করে মুখে মোহমাখা হাসি ফুটিয়ে বিবেকানন্দ বললেন : বলরাম বসুর বাড়ি প্রায়ই আসতে হয় আমাকে। এখানেই তোমার প্রবলেম নিয়ে দেখা কর। ঠাকুরের কাছে বসেই তাঁর কাজ নিয়ে পরিকল্পনা করব। সেটাই ভালো। কারো মনে করার কিছু থাকবে না।

বিবেকানন্দের কথাগুলো শুনতে শুনতে মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল মার্গারেটের চেতনা। সুদূর স্বপ্নের মত নীরব চোখ দুটি বিবেকানন্দের ওপর রেখে বলল : মিস মুলার এসেছিলেন।

কথাটা তোমাকে জিগ্যেস করব ভেবেছিলাম। যাই হোক, মহিলার কাছে আমি ঋণী। ওঁর অর্থানুকুল্যে বেলুড়ে মঠবাড়ি নির্মাণের জমির বায়না করা গেল। তুমি আসার পর এসব কাজে এত বেশি ব্যস্ত ছিলাম যে তোমার প্রতি কর্তব্য করার ফুরসত হয়নি। মহিলার অনেক টাকা আছে। বিলেতে থাকতে আমাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বহুভাবে সাহায্য করেছেন।

ওঁর সঙ্গে আমার থাকার কথা বলছিলেন।

একটু চিন্তা করে বিবেকানন্দ বললেন : খারাপ প্রস্তাব কি? তুমি তো হোটেলে একা আছ। ওখানে গিয়ে একজন সঙ্গী পাবে। খরচও বাঁচবে। এখানে থাকার খরচ অনেক। যতদিন একটা ভালো কিছু করতে না পারি ততদিন না হয় ওঁর সঙ্গে থাক।

তবু কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

তা তো থাকবেই। অঢেল টাকার দেমাকটা ওঁর সব গুণ নষ্ট করে দিচ্ছে। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উনি চান দাসত্ব। ভাবটা এই, টাকা দিয়ে উনি কিনেছেন প্রভুত্বের অধিকার। সব ব্যাপারে মহিলা এত নাক গলান এতবেশি আধিপত্য দাবি করেন যে

মাঝে মাঝে আমিও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি। উনি আমাকেও ধমক দেন। নির্দেশ দেন। ওঁর ধারণা টাকা-পয়সা দিয়ে মানুষের বিবেক, মানুষ্যত্ব কেনা যায়। টাকা দেখিয়ে উনি দুনিয়ার ওপর প্রভুত্ব করতে চান। জানি না, ওঁর সঙ্গে কতকাল মানিয়ে চলতে পারব। তবে মহিলা খুব ভাল। দোষ একটাই। ঐ দোষের জন্য তোমাকেও ব্যবধান রেখে চলতে বলব। নিজেকে খুব জড়াবে না। যত তাড়াতাড়ি পার স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হও। নিজের পায়ে দাঁড়াও। আমি চাই তোমার সর্বাঙ্গীন সাফল্য। মার্গো আমিই জানি নিজের শক্তিতে তুমি এগিয়ে যাবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তোমাকে দাবিয়ে রাখে। আমার গুরুই তোমার পথ দেখাবেন। তিনি সর্বক্ষণ তোমার সাথেই আছেন। ভুলে যেও না এই অভাগা বাংলা দেশে হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পথ দেখিয়ে দেয়, তাহলেই মাথা তুলে সাড়া দেবে তারা।

মার্গারেট তন্ময় হয়ে তাঁর কথাগুলো শুনল। আর এক ভীষণ ভালো লাগায় তার চেতনা আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এমন করে মুখোমুখি বসে স্বামীজির সঙ্গে একান্তভাবে কথা বলার সুযোগ এর আগে তার হয়নি। মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে বিভোর হয়ে সে শুধু রাজাকেই দেখছিল নিজের কারণে।

মার্গারেটেরও ইচ্ছে করছিল রাজার সঙ্গে ঝগড়া করে। একটু চুপ করে থেকে বলল : আমি কি কচি খুকী? নিজের ভাল মন্দ বুঝি না? সব সময় নির্দেশ শুনতে, শাসন মানতে কার ভালোলাগে? আত্মমর্যাদাবোধের বয়সে কেউ যদি আগলায় সেটা সম্মানে লাগে।

বিবেকানন্দ ওর আচমকা প্রতিবাদের সম্মুখে বেশ একটু বিব্রত এবং অসহায় বোধ করল। আমতা আমতা করে বলল : দ্যাখ, কোনো কিছু ভেবে আমি বলিনি। আমার বিবেক বলল তোমার মত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আত্মাভিমানী মহিলাকে একটু জানানো ভাল।

আমার জন্য আপনি খুব ভাবেন তাই না?

লজ্জা পাওয়া গলায় চোখ নামিয়ে বিবেকানন্দ বললেন : তোমার অসুবিধার কথা আমি বুঝি, আমার জন্য তোমার কোনো অসুবিধে হোক চাই না।

ওঁর লাজুক অপ্রতিভ মুখটিকে ভালো করে দেখতে পাওয়ার আগে মার্গারেট বলল : আপনি সত্যি ভীষণ ভালো। আপনার সব কথা শুনব, যেমন বলবেন তেমনি চলব। নিজেকে সামলে-সুমলে আগলেও না হয় রাখালাম। কিন্তু আমার লোভ? তাকে আগলাব কি দিয়ে?

বিবেকানন্দ ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন : মনের আনন্দের মধ্যে কোনো পাপ নেই। বরং তীব্র একধরনের পুণ্য আছে। যা তোমারই তার প্রতি লোভ হবেই বা কেন? কোনো মহিলা স্বামী, পুত্রের জন্য তুলে রাখা খাবার লোভে পড়ে খেয়ে নেয় কি? খায়? মাথা হেঁট করলে কেন? বাইরে বোধ হয় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে

দাঁড়িয়েছে। মনে হয় শরৎ এসেছে। চেনাজানা গাড়ি, কোনো অসুবিধে হবে না। তুমি একাই যেতে পারবে। তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে।

প্রত্যুত্তর না করে মার্গারেট একটা মূর্তির মত তাঁর দিকে চেয়ে রইল। বিচিত্র একটা আবেগে তার বুকের শিরা-উপশিরাগুলো টনটন করছিল। মনের যন্ত্রণা চেপে সে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। যাওয়ার সময় একবারও বলল না-- যাচ্ছি।

চার
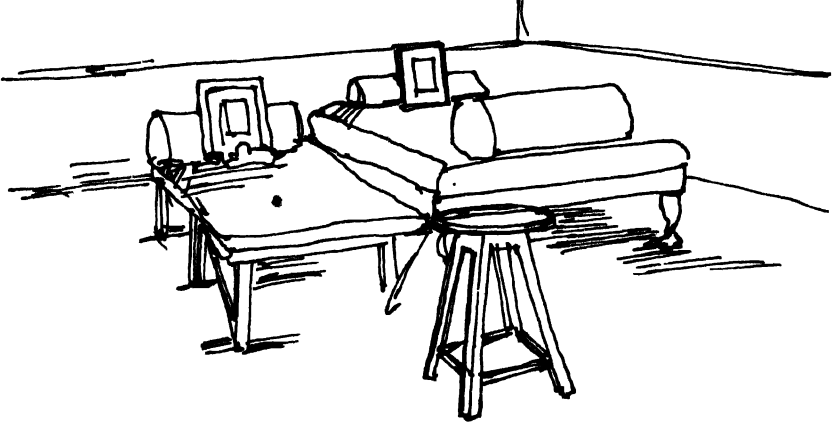
আমেরিকা থেকে মিসেস সাবা বুল এবং মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড বোম্বে পর্যন্ত জাহাজে এসে সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া এলেন ৮ই ফেব্রুয়ারি (১৮৯৮)। তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য বিবেকানন্দ একদল শিষ্যসহ হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলেন। তারপর দুই ধনী মহিলাকে নিয়ে প্রখ্যাত অ্যাটর্নি-মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কোলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটা সেরা হোটেলে তাঁদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

অঢেল পয়সা সত্ত্বেও হোটেলের আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও বিলাসিতার মধ্যে থাকা তাঁদের পছন্দ হল না। কারণ, তাঁবা তো ট্যুরিস্ট নন। এদেশের সঙ্গে একটা অভিন্ন সম্পর্ক গড়ে তোলার সংকল্প তাঁদের। তাঁরা উভযেই এসেছেন ভারত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। তাঁর স্বপ্নের ভাবতবর্ষকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য, আরব্ধ কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যই তাঁরা এসেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তাঁর একজন সহযোগী হয়ে ভারতবর্ষের কার্যে নিজেদের উৎসর্গ করতে এসেছেন। সুতরাং সেই কাজই যদি শুরু করা না গেল, তার অংশীদার না হওয়া গেল তাহলে ভারতে আসার সার্থকতা কি?

স্বামীজি থাকেন বেলুড়ে। সেখান থেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলের হোটেলের দূরত্ব অনেকখানি। প্রতিদিন যোগাযোগ রাখা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু তাই নয়, সুখ ও

স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিলাসবহুল হোটেলে থাকলে স্বামীজির কাছে থাকা হবে না, প্রতিদিন তাঁকে দর্শন করা যাবে না। অথচ স্বামীজির পাশে থেকে কাজ করার জন্যই এদেশে এসেছেন। কাজেই কোনোক্রমে দুটো দিন হোটেলে কাটিয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁরা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়ি যাবেন বলে মনস্থ করলেন।

বাবুঘাট থেকে একটা ডিঙি নৌকো ভাড়া করে নিল। শীতের সকালে ছোটো খেয়া নৌকোটি মৃদুমন্দ চালে ভেসে চলেছে। ম্যাকলাউডের ইশারায় বৈঠা তুলে নিল মাঝি। মৃদু স্রোতে নৌকো ভেসে চলেছে। গঙ্গার মাঝ বরাবর অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। মুগ্ধ বিভোর হয়ে দুই বিদেশিনী নিস্তব্ধতাকে গভীর করে অনুভব করে। মাঝেমধ্যে গাংচিল বা কোনো পাখির ডাক ভেসে আসে। আর আছে জলতরঙ্গের মত স্রোতের সংঘর্ষে জেগে ওঠা মৃদুমন্দ শব্দ। যেন তা এই নিস্তব্ধতাকেই গভীর করে তোলে। মোহিনীমোহন দুই বিদেশিনীর এই তদ্‌গতভাব লক্ষ্য করে সতর্কভাবে চুপ করে থাকে।

অনেকখানি ভেসে যাওয়ার পর নৌকোটা যাতে দিকভ্রষ্ট না হয়, নিয়ন্ত্রণে থাকে সেজন্য মাঝি বৈঠাটা জলে ডুবিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

হু হু করে হাওয়া বইছে। ঝিমঝিম করছে রোদ। উদাস দৃষ্টিতে সারা বুল গঙ্গার বহমানতার দিকে চেয়ে বলল : এইরকম নদী পৃথিবীতে কত আছে, কিন্তু এমন করে মন দিয়ে আগে দেখিনি। নদীর স্রোত জিনিসটা বড় অদ্ভুত। সময়স্রোত এবং জলস্রোত একসঙ্গে মিশেছে। একটা দেখা যায় না, আর একটা দেখা যায়।

ম্যাকলাউড তার সরল চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে বলল : ভারতবর্ষের পরিবেশেই বোধহয় জীবনকে এবং প্রকৃতিকে দেখার একটা আলাদা চোখ দেয়। অথবা পুরনো চোখটাই নতুন করে দেখে। নইলে, এমন করে সব স্বর্গীয় মধুরিমায় পরিপূর্ণ হয় কি করে?

মোহিনীমোহন ওদের দিকে চেয়ে বলল : ভারতবাসীর জীবনে এবং জীবনদর্শনে এই পুতসলিলা নদীটির প্রভাব যুগে যুগে বহুভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এই নদীতে গা না ভাসালে অনুভব করা যায় না এর বৈভব।

ওরা কেউ কোনো কথা বলল না। শান্ত সুন্দর নদীর চারদিকে চেয়ে চেয়ে যেন তারা আত্মার রহস্য আবিষ্কার করতে লাগল।

অনুকূল স্রোতে নৌকো এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়া ক্রমশ দৃষ্টি পথে ধরা দিল। অমনি এক স্বর্গীয় আনন্দে দুই বিদেশিনী পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল।

সামনেই বেলুড়ের ঘাট। নৌকোকে ধীরে ধীরে তীরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল মাঝি। যাত্রী ওঠানামার ঘাট হলে কী হবে ভরসা করে ভাঙাচোরা পিছল সিঁড়িতে পা রাখতে ভয় পাচ্ছিল দুই বিদেশিনী। মাঝিই ওদের হাত ধরে পাড়ে পৌঁছে দিল।

গঙ্গার তীরে বেলুড়ের এই মনোরম জায়গাটি নতুন মঠের জন্য স্বামীজি বায়না করেছেন। প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল। জায়গাটার চারপাশে এমন একটা

অপার্থিব মাধুর্যে পরিপূর্ণ ছিল যে মনে হচ্ছিল তারা কোনো তপোবনে আছে।

নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়ি একেবারে গঙ্গার ধারে নয়। অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হয়। গাছগাছালির ছায়ার জন্য রোদে হাঁটতে তাদের কষ্ট হল না। তা ছাড়া বাতাসে একটু শীত শীত ভাব থাকার জন্য রোদের তাপ গায়ে লাগছিল না। বরং মনোরমই বোধ হতে লাগল। গঙ্গার বুক থেকে নিরন্তর হু হু করে বাতাস ছুটে আসছে। চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। পিপাসিত অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে অনুভব করছিল নূতনকে আবিষ্কার করার আনন্দ।

যেতে যেতে ম্যাকলাউড অভিভূত গলায় বলল : জান চ্যাটার্জি এখানে কেউ আমাকে জোর করে টেনে আনেনি। স্বামীর কাজে ভাগ নিতে স্বেচ্ছায় এসেছি। মজার কথা কি জান, ভারতবর্ষের নামটাও শুনিনি। সেখানে আসার কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। স্বামীর সঙ্গে দেখা না হলে ভারতে আসা হতো না। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কেবলই মনে হত, আমি নিজেকে যা ভাবি, আমি বুঝিমাত্র সেটুকুই নই। তারও চেয়ে বড় আমি। আমার বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব আকাশ বাতাস জুড়ে মুখব্যাদান করে আছে। এরই নাম সোহম্ কি?

সারা বুল নাভি থেকে একটা লম্বা শ্বাস নিল। প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল এক আশ্চর্য ভালো লাগার কথা। বলল : বাংলাব নয়নভোলানো প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামল রূপের মধ্যিখানে বাস না করলে এর মমতামাখানো স্নেহময়ী জননীর নিবিড় করস্পর্শের সুখানুভূতি অনুভব করা যায় না। একটা গভীব টান অনুভব করছি। মনে হচ্ছে এর সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। বোধহয় সেই কারণেই পিছনেব সব আকর্ষণ ছিঁড়ে ফেলে এমন করে চলে আসতে পেবেছি। এই মাটিতে পা দিয়ে আমি মায়ের মমতা কি জানতে পারলাম। বেশ বুঝতে পারছি আমার মধ্যে অন্য এক জীবনের সূচনা হচ্ছে। এক উপচানো আনন্দের মধ্যে দ্বিতীয জন্মের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

ম্যাকলাউড তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল। বাকি পথ সারা বুলের কথাগুলো তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। এক অসহনীয় সুখবোধ লয় করে দিচ্ছিল তাব সত্তা। হারিয়ে যাচ্ছিল চিন্তাশক্তি। এমন কি অহংবোধ পর্যন্ত।

আচমকা দুই বিদেশিনীকে নীলাম্বব মুখুজ্যের বাড়িতে হাজির হতে দেখে বিবেকানন্দের বিস্ময়েব শেষ নেই। আমেরিকায় থাকতে যখন এই দুই মহিলা ভাবতে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তখন মনে হয়েছিল ধনী মহিলা বৈচিত্র্য খুঁজতেই ভারতকে দেখতে চায়, ভারতের দারিদ্র্য উপভোগ করতে চায়। যারা ভাবতের নাম পর্যন্ত জানে না, তাদের কাছে প্রত্যাশার কিছু থাকে না। সেজন্যে রূঢ় ভাষায় এঁদের দু'জনকে সতর্ক করতে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের ভালাবাসা চায়, করুণা কিংবা দয়া চায় না। হৃদয় উজাড় করে দিয়ে যে ভারতকে নিজের করে নিতে পারবে কেবল ভারতে যাওয়ার তারই অধিকার আছে। আমি স্বীকার করছি দারিদ্র্য

ভারতবর্ষকে হতশ্রী করেছে। অর্থোভাবে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষগুলো শুধু দেবতার মুখ চেয়ে বেঁচে আছে। এসব কথা মনে রেখে যদি কেউ ভারতে যেতে চায় তাহলে হাজারবার এদেশে আসুন। কারো কাছে আমার দেশ সম্পর্কে একটা বিরূপ মন্তব্য শুনতে চাই না। বিদ্যুৎচমকের মত কথাগুলো মনের মধ্যে আলোর মালা হয়ে ফুটে উঠল। এক গভীর দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল এক গভীর তীব্র ভালোলাগা। খুশিতে তাঁর দুই চোখ চকচক করছিল। কিছু বলার জন্য তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

স্বামীজির বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই সারা বুল বলল : অবাক হয়ে গেছ তো। তোমাকে চমকে দেওয়ার জন্য কোনো খবর না দিয়ে সশরীরে হাজির হলাম। কোলকাতায় থেকেও তোমাকে দুটো দিন চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি তা হোটেলে থেকে বুঝেছি। তাই, নিজের মুখে কেমন আছ এই কথাটা জিগ্যেস করতে পারার একটা আলাদা সুখ আছে। ঝটপট ঘাড় নেড়ে ছোট্ট করে বলবে—'ফাইন'। সেই মুহূর্তে তোমার মুখে সুডৌল ভাব এবং রেখাগুলোর ওপর চোখ রেখে পর্যবেক্ষণ করব তোমার দৃষ্টি কেমন। তারপর যদি মনে হয় সব ঠিক আছে, স্বাভাবিক আছে তবেই বুঝব তুমি ভালো আছ। মায়ের চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না। কোথায় তোমার দুঃখ, কত জায়গায় ব্যথা, কতরকম কষ্টে তোমার বুকটা আর্ত আমি সব ধরে ফেলব।

সারা বুলের দিকে তাকিয়ে স্বামীজি হেসে ফেললেন, বললেন : আমার প্রতি তোমার মমতার অন্ত নেই। তুমি যে আমার ধীরা মা। তোমার এই স্পর্শকাতর মনটি আমার দেশের মানুষের জন্য তোমাকে ভাবতে বলবে। এই অধম ছেলের আবেদনের কথা মনে আছে তো মা।

সারা বুলের ভারী মাংসল মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটল। বলল : আমেরিকায় তুমি যেদিন প্রথম মা বলে ডাকলে সেই দিনটা কখনো ভুলবার নয়, এ জীবনে কখনো তা বিস্মৃত হওয়াও সম্ভব নয়। এমন সব অত্যাশ্চর্য কথা শুনেছি যা আমার জীবনের মর্মমূলে নিয়ত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তোমার সব কথা আমার মনে আছে। ভালো কাজের জন্য টাকার কোনো অভাব হবে না। তোমার ভাবনা চিন্তাকে রূপায়িত করতে যে অর্থের দরকার তার একটা বড় ভাগ আমার কাছে পাবে।

ম্যাকলাউড বলল : স্বামী হোটেলে কেমন আছি জানতে চাইলেন না তো। মিসেস বুলকে দেখে অভাগা বন্ধু জো'র কথা ভুলে গেল। আমার প্রতি একটু নজর দিন।

জো'র কৌতুকে স্বামীজি মৃদু হাসলেন। বললেন : খারাপ থাকবে কেন? তোমার চোখে খুশির বন্যা, মুখে বিগলিত হাসির অমৃতধারা। মনে হচ্ছে, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কী ভালো লাগছে। তোমার দিক থেকে চোখ ফেরাই সাধ্য কোথায়?

ভালো কথা, আপনার বক্তৃতাসভায় মার্গারেট নোবল নামে যে আইরিশ মহিলা আসতেন তাঁর তো ভারতে আসার কথা ছিল, সে এসেছে কি?

দু'সপ্তাহ আগেই কোলকাতায় এসেছে সে। এখন চৌরঙ্গী অঞ্চলের হোটেলেই থাকে। কোলকাতার বাইরে যাওয়া তাব হয়ে ওঠেনি।

অদ্ভুত। এখনও সে বেলুড়ে আসেনি।

না। মার্গারেটের প্রসঙ্গ স্বামীজি চাপা দেবার জন্য বললেন : এভাবেই কি দাঁড়িয়ে থাকা হবে? রোদে পুড়ে এসেছ। একটু বিশ্রাম নাও। ডাব খেয়ে তেষ্টা মেটাও। তারপর মঠের ছেলেদের হাতে রান্না দেশীখানা খিচুড়ী খেয়ে জায়গাটা ঘুরে দেখবে।

মিসেস বুল বললেন : আমরা কি তোমাব অপেক্ষায় আছি? মোটামুটি দেখা হয়েছে। যা দেখলাম তাব তুলনা নেই। জায়গা নির্বাচনে তোমার বাহাদুরি আছে। বেশ একটা তপোবনের ভাব আছে এখানে। এই ছোট জায়গাটা পা দিয়ে আমি বেঙ্গলকে দেখলাম। গঙ্গাহৃদি ভারতভূমির হৃৎস্পন্দন অনুভব করলাম। আমার এক নবজন্ম হল অকস্মাৎ। গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া বহুদূর থেকে কার আহ্বানের বাণী বহন করে আনল যেন।

স্বামীজির অধরে ঠাকুরের মহিমা বোঝাব কৌতুক হাসি, চোখের চাহনিতে অবাক তন্ময়তা। কথা বলার সময় চোখ দুটি নিবিড় ঘুম পাওয়ার মত ধীরে ধীরে বুজে গেল। অভিভূত গলায় বললেন : বাঁচলুম। ঠাকুরের জালে ধরা পড়েছে, আর বেরুতে পারবে না। সবই আমার ঠাকুরেব কৃপা। সুদূব আমেরিকা থেকে তিনি যদি তোমাদের ধরে না আনতেন তা-হলে আমার সাধ্য কি তোমাদেব টেনে আনার। তিনিই আমার আদর্শ. আমার নেতা, আমার জীবন্ত ভগবান। তিনি না চাইলে, না করলে, আমি কিছুই করতে পারি না। চিন্তায়, কথায়, কাজে আমি যা করে থাকি তা আমার নয়, আমার গুরুর। মঠের জমি নির্বাচনের কৃতিত্বও তাঁর।

সত্যি! মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল মিসেস্ সারা বুল। তোমার সব কাজই আশ্চর্যের। কথাগুলো বলার সময় এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল।

বিকেল হলে স্বামীজি এই দুই বিদেশিনীকে মঠের জমি দেখাতে নিয়ে গেলেন। গঙ্গার পাবে বাইশ বিঘা জমির সবটাই ফাঁকা। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তীর বরাবর নানা মাপের নারকেল গাছের সাবি। মাঠের মধ্যিখানে দু'একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর খোলা নীল আকাশে সাদা মেঘ জমেছে। সাদা মেঘের স্তূপ ভেদ করে সূর্যের আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। নারকেল গাছের পাতায় পুণ্যের আলোর মত ঝরে পড়ছে। অদূরে পালতোলা নৌকো ভেসে যাচ্ছে। দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে ভাটিয়ালী গান।

গোটা অঞ্চলটা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ওরা একটা নালার সামনে এসে দাঁড়াল। নালা পারাপারের জন্য একটা সরু সাঁকো ছিল। সাঁকো মানে তালগাছের একটা গুঁড়ি শোয়ানো অবস্থায় ছিল। পায়ে পায়ে ওপরটা ভীষণ মসৃণ হয়ে গেছে। স্বামীজি ঈষৎ একটু বিব্রতভাবে বললেন : এই সাঁকোটা পার হবে কী করে? ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। এখান থেকেই বরং ফেরা যাক।

জো বিস্মিত হয়ে বলল : ফিরব? কেন? ফিরব বলে তো আসিনি। এতখানি কাদাজলের জায়গায় কাদা বাঁচিয়ে যখন আসতে পেরেছি তখন বাকিটাও যেতে পারব।

জো ধরার কিছু নেই। কোনো কারণে দেহ একটু টাল খেলে পা হড়কে কাদায় পড়বে।

স্বামী, আমাদের ওপর তোমার একটুও আস্থা নেই। অতখানি অযোগ্য বলে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। দ্যাখই না— বলে, জো অনায়াসেই সাঁকো পার হল। মিসেস্ বুলও ওর দেখাদেখি সন্তর্পণে সাঁকো পার হল।

জো হাসতে হাসতে বলল : তাহলে বুঝতে পারছ আমবা অযোগ্য নই। কোনো বাধাই বাধা হয় না সংকল্পের কাছে।

স্বামীজির মুখের রঙ বদলে গেল। বিষণ্ণ গলায় বলল : পাশ্চাত্য মেয়েদের এই স্বাবলম্বিতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমাদের দেশেব বনেদী পরিবেশের মেয়ে হলে এই সাঁকোটুকু পার হতে কত ওজর আপত্তি কতবকম যে ঢঙ করতো ভাবতে লজ্জা হয়।

সারা বুল বলল : এত অনেকখানি জমি। এত জায়গা নিয়ে করবে কী?

স্বামীজির অধরে গর্বিত হাসি। বলল : আরো জায়গা পেলে ভালো হত। কত কী করব। গুরুভাই এবং শিষ্যদের থাকার জন্য ঘর দরকাব, সংঘের নানারকম কাজ-কর্ম করার জন্য নানাধরনের অফিস চাই, এছাড়া চাষের জন্য বেশ কিছু জমি থাকবে। ধ্যানের জন্য মন্দির দরকার। শিক্ষার জন্য মঠচালিত বিদ্যাপীঠ দরকার, গুরুর জন্মোৎসবের সময় হাজার ভক্তের সমাবেশ হবে, তাদের থাকার জন্য অতিথিশালা দরকার, একটা গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালযও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভবিষাতে এটা হয়ে উঠবে ভারতের অগণিত তীর্থক্ষেত্রের মতই আর এক তীর্থস্থান। সেদিন বোধহয় খুব বেশি দূরে নয় মা।

স্বামী তোমার এই স্বপ্নের জায়গা ছেড়ে আমরা কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না, এখানে থাকার বন্দোবস্ত কর।

বিব্রত বিস্ময়ে স্বামীজি বললেন : এখানে তোমাদের বাখব কোথায়?

জো বলল : কেন, আপনার বায়না করা জমির মধ্যে যে ভাঙাচোরা বাড়িটা আছে, ওটা মেরামত করে নিলেই থাকার জায়গা হয়ে যাবে।

জো'র চোখে চোখ রেখে স্বামীজি বললেন : তোমাদের এখানে এনে তো মুশকিলে পড়েছি।

তোমার অত কিন্তু করার কিছু নেই। আমরা ঐ বাড়িতেই থাকব।

স্বামীজি ওদের প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল : পাগল হয়েছে। ঐ পোড়ো ভাঙা বাড়ি সাপ-খোপের বাস। ওখানে কোনো মানুষ থাকে? তোমাদের এসব ছেলেমানুষী জেদ ছাড়ো।

সারা বুল বলল : সান্, থাকার জন্যই সখ করে কেউ বাড়িটা করেছিল।

হাঁ, ঐ বাড়িতে সে থাকতে পারেনি বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। তোমরাও ওখানে থাকতে পারবে না।

সান্‌, আমাদের অভিধানে পারব না, হবে না বলে কোনো শব্দ নেই। তুমি কালই মিস্ত্রি মজুর লাগিয়ে বাড়িটা মেরামত করে, নতুন করে পলেস্টার করে রঙ দাও। দেখবে গোটা বাড়িটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। চারপাশের জঙ্গল কেটে মালি দিয়ে গার্ডেন তৈরি করে দাও। এর সব খরচপত্তর আমরাই করব।

স্বামীজি তাঁর ধীরা মা'র কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন : মা, তুমি যা বলছ, ভাবনাচিন্তা করে বলছ না। জীবনে ভাবাবেগের কোনো মূল্য নেই। বাস্তব বড় কঠিন।

জো বলল : সংকোচ করার তো কোনো কারণ নেই। পস্তাতে যদি হয় সেজন্য আমরাই দায়ী।

স্বামীজি আমতা আমতা করে সারা বুলের দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল : মা, হোটেলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এখানে নেই। অভাব, কষ্ট কি তোমরা জান না। আরামের মধ্যে বিলাসের মধ্যে তোমাদের জীবন কেটেছে। হঠাৎ এত কৃচ্ছ্রসাধন সইবে না। তাই তোমাদের জন্য ভাবতে হয়।

জো তৎক্ষণাৎ বলল : আমাদের জন্য তোমার অত না ভাবলেও চলবে। আমাদের ভাবনা আমাদেরই করতে দাও। আমরা তোমার কথায় দেশ ছেড়ে আসিনি। তোমাকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় এসেছি। তোমার মধ্যে দিয়ে যে ভারতকে দেখেছি সেই ভারতবর্ষের জন্য আমরা কিছু করতে এসেছি। তোমার খুব কাছাকাছি থাকতে চাই।

অগত্যা বিবেকানন্দকে বলতে হল : তোমরা যখন চাইছ, তাই হবে।

ওদের জেদের কাছে বিবেকানন্দকে অবশেষে হার মানতে হল। বাড়ি সারানোর জন্য লোক লাগানো হল।

দেখতে দেখতে বাড়ির শ্রী ও ছাঁদ বদলে গেল। দু'খানা শোবার ঘর, বৈঠকখানা, রান্না ঘর নিয়ে একটা ছোট-খাট কটেজ তৈরি হল গঙ্গার ধারে। রঙ করার পর বাড়ির চেহারা বদলে গেল। এটা যে এককালে পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়ি ছিল মনেই হয় না। কোলকাতা থেকে নিত্যব্যবহার্য বেশ কিছু কাঠের আসবাবপত্র দিয়ে ঘরটা সাজানো হল। দেয়ালে টাঙানো হল ক্রুশবিদ্ধ যীশু এবং রামকৃষ্ণের তেল রঙের ছবি। বাড়ির সামনে মস্ত বড় একটা লন। রাস্তার দু'ধারে ফুলের টব, পাতাবাহারী গাছ, ঝাউ দিয়ে ছবির মত সাজানো। সারা বুল এবং জো দু'জনের তদারকিতে একমাসের মধ্যে এক নন্দনকানন সৃষ্টি হল সেখানে।

ওদের কাজকর্ম দেখে স্বামীজির খুশির অন্ত নেই। মনের সেই আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন ধীরা মা, মনে হচ্ছে তোমরা দেবতার মেয়ে। নইলে, এত ক্ষমতা কোথা থেকে পেলে? কী জায়গা ছিল, আর কী বানালে তাকে, ভাবতেই

অবাক লাগে। সব কেমন স্বপ্ন মনে হয়। বিধাতা তোমাদের হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ দিয়েছেন। তাই এমন করে একে পাল্টে দিতে পারলে।

মার্গারেটকে ডেকে না পাঠালে বলরাম বসুর বাড়ি বড় একটা আসে না। হঠাৎ নিজের খেয়ালে একদিন বাগবাজারে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে এল। মাঝে মাঝে জীবনে আচমকা কিছু ঘটনা ঘটে, যা না হলে বোঝাই যায় না একজন মানুষ তার খুব কাছের এবং প্রিয় মানুষটিকে কত কম চেনে। মনের গতিপ্রকৃতি বোধহয়, মানুষ নিজেও ভালো করে জানে না। মানুষের সমস্ত জীবনটাই হয় তো পরস্পরবিরোধিতার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বলরাম বসুর বাড়ি এসে মার্গারেটের সেই অভিজ্ঞতা হলো।

অথচ, মার্গারেট ভাবেনি, মানে ভাবতে পারিনি স্বামীজির প্রশ্রয়ে এবং আগ্রহাতিশয্যে স্বেচ্ছায় আসাটা তাঁর অপছন্দ হতে পারে। বরং ধারণা হয়েছিল দু'জনের অগোচরে যে এক মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, নিকট সান্নিধ্য হয়তো তাকে কিছুক্ষণের জন্য মধুরতায় ভরে রাখবে। এই অনাবিল সুন্দর আশ্চর্য আনন্দ পাওয়ার দাম জীবনে অনেক। দিল্ খুশি থাকলে ভালোবাসার মানুষের জন্য কাঙালপনা থাকে না। কিভাবে, কোন পথে পর্যাপ্ত প্রাপ্তির সুখে তার নিজের ভেতরটা ভরে উঠল দ্বিতীয়জনের তা জানার দরকার নেই। নিজের খুশিতে ভরে উঠুক এই খুশিহীন বিদেশ-বিভুঁইয়ের সঙ্গীহীন জীবন এই-ই ছিল মার্গারেটের মনের কথা। অন্তরের ইচ্ছা।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, স্বামীজি তাকে দেখে উৎফুল্ল হওয়ার বদলে বিরক্তই হলেন। কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। ভ্রূকুটিতে ভুরু যুগল কুঁচকে গেল, চোখ দুটো কিঞ্চিৎ ছোট হল, কপালের চামড়ায় অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। সমাদর করে মার্গারেটকে ডাকা তো দূরে থাক, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এমন এক বিরক্তি এবং তিরস্কার ছিল যা তার অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করল। বুকের মধ্যে গেঁথে গেল সে চাহনি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। নীরব উপেক্ষায় সেই ঘোরটা কেটে গেলে অনুভব করল ঝোঁকের মাথায় এখানে এসে ভালো করেনি সে। কিন্তু অবাধ্য মনটা কোনো বাধাই মানেনি। কোনো প্রবোধ শোনেনি। বরং বারবার মনে হয়েছিল জানার ইচ্ছে আর ঔৎসুক্য যে মানুষের নেই সে তো মৃত মানুষ। যে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়, তার কাছে কোনো পথই দুর্গম নয়, সব বাধা অতিক্রম করে অজানাকে সে জানে। সুদূর লন্ডন থেকে অনুরূপ এক ঔৎসুক্য নিয়ে সে এদেশে এসেছে। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণের মত কিছুই করা হয়নি তার।

স্বামীজি তাঁর আমেরিকান দুজন শিষ্যা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত। তার সম্পর্কে স্বামীজির কোনো কৌতূহল নেই। তাঁর এই নির্বিকারত্ব মার্গারেটের মনোবেদনার কারণ। অথচ চৌরঙ্গীর এক প্রান্তে তাঁর ডাক শোনার জন্য সে যে উন্মুখ হয়ে আছে এই কথাটা তাদের কোলকাতায় আসার পর স্বামীজির একবারও মনে হয়নি। সেও

যে তাদের মতই একজন এবং তার প্রতি স্বামীজির যে কিছু কর্তব্য আছে, সেটা কিন্তু করে দেখাচ্ছেন না। স্বামীজির এই নিরুত্তাপ ব্যবহার তাকে বড় ধাক্কা দেয়। মনে সংশয় জাগে, মানুষটা সত্যিই কী তার সব বোঝে? কে জানে মুখে তো কিছুই বলেন না? এমন নীরব উপেক্ষায় না থেকে তাকে তো তিরস্কার করতে পারত, নিজের বিরক্তির কথা বলতে পারত। তাহলে জানত রাজার কাছে তার কিছু দাম আছে, কিন্তু রাজার অদ্ভুত ঠাণ্ডা এই ব্যবহার তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা দুর্বল করে দেয় ওকে। বাধা না থাকলে তাকে প্রতিহত করার প্রশ্ন ওঠে না। মনের মন কী করবে ভেবে না পেয়ে, চিন্তাভাবনা না করেই বলরাম বসুর গৃহে দৌড়ে এসেছিল।

অথচ, তাকে দেখে স্বামীজির আনন্দ হওয়া দূরে থাক, ভীষণ লজ্জায় তিনি অপদস্থ হয়ে নিস্পৃহভাবে বললেন : তুমি?

মার্গারেটের ভেতরটা তাঁর নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের বাতাস পেয়ে দপ করে জ্বলে উঠল। থমথমে গলায় বলল : কেন, আসতে নেই বুঝি? আমার কিন্তু একমুহূর্তের জন্য মনে হয়নি আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু করেছি।

বিবেকানন্দ বেশ বিরক্ত হয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বলল : এটা লন্ডন নয়। এখানে নারী পুরুষের মেলামেশা, কথাবার্তার মধ্যে একটা ঢাকাঢাকির ব্যাপার আছে। তাই কোন্‌টা এদেশের চোখে ভালো ঠেকবে আর কোন্‌টা মন্দ লাগবে তুমি বুঝবে না।

কথাটা শুনে ভীষণ কষ্ট হল মার্গারেটের। অপমানে তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। লজ্জাটা চোখ তোলার সময় মুখে মাখামাখি হয়ে গেল। চাপা আর্তনাদ করে বলল : আমি কী খারাপ? মন্দ কিছু করেছি আমি? এভাবে কথাটা আমায় বলতে পারলেন? আপনার মন বলে কিছু নেই?

স্বামীজি তার কথার জবাব না দিয়ে নিস্পৃহভাবে বললেন তর্কের প্রয়োজন নেই। কি বলতে এসেছ বল। আর বলার যদি কিছু না থাকে তাহলে এস। যখন ডেকে পাঠাব, তখন আসবে।

মার্গারেটের সব প্রগলভতা স্তব্ধ হয়ে গেল। অপমানে মুখ রাঙা হল। যেখানে প্রত্যাশার অনেক কিছু থাকে সেখান থেকে খালি হাতে অসম্মান এবং লাঞ্ছনা নিয়ে ফেরা বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার। মার্গারেটের বুকের ভেতরটা গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। এই প্রথম নিজেকে প্রশ্ন করল তবে কি মানুষ চেনা ভুল হল তার? এই আশ্চর্য মানুষটিকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে সে ভারতে এসেছে। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে কোনোকালেই ভারতে আসাই হতো না। শুধু বিবেকানন্দের কাছাকাছি থাকতে পারবে, বিভিন্ন কাজের ভেতর নিত্য দেখাসাক্ষাৎ হবে, চোখের তৃষ্ণা, মনের ক্ষুধা প্রতিদিন অনন্ত প্রাপ্তিতে ভরে উঠবে, এই প্রত্যাশা নিয়েই তার ভারতে আসা। একান্ত আপনজন হিসেবে তাঁর সঙ্গে জীবনের গ্রন্থীবন্ধন নাই-বা হল, কাছে থাকলে হৃদয়বন্ধন তো হবে। ছায়ার মত পাশে পাশে তো থাকতে পারবে। সেও কম নয়! সুখ-দুঃখ,

আনন্দ-বেদনা তাঁর সঙ্গে ভাগাভাগি করে কাছাকাছি তো জীবনভোর থাকা হবে। ভালোবেসে নিজেকে নিবেদন করেই ধন্য হবে। একজন নারীর জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়ার কি আছে। বিবেকানন্দের রূঢ় আচরণ এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার বুকের ভেতর জমানো সুন্দর অনুভূতিগুলোকে ভেঙে খান খান করল। এক দুরন্ত কান্না বুক ঠেলে সবেগে উঠে এল। সমস্ত কান্নাটা নিজের বুকে শুষে নেয় এমন ক্ষমতা ছিল না তার। শব্দ করে কেঁদে ওঠার আগেই সেখান থেকে সে চলে গেল।

মার্গারেট চলে যেতেই জায়গাটা বিবেকানন্দের কাছে ভীষণ শূন্য হয়ে গেল। এক ভয়াবহ শূন্যতায় ঘরখানি একেবারে শব্দহীন হয়ে গেল। মনে হল তাঁর দেহটা হাল্কা হয়ে গেছে। নির্জন কক্ষে একা একা বসে থাকতে থাকতে মনে হল মার্গারেটের সঙ্গে এতখানি রূঢ় আচরণ না করলেই ভালো হত। যে সচেতন নিষ্ঠুরতা দিয়ে মার্গারেটকে তিনি আঘাত করলেন হঠাৎ তা বুকের মধ্যে শক্ত করে আঁটা দরজা জানলাগুলো ভেঙে কী এক গভীর যন্ত্রণার আর অনুশোচনার বোধে তাঁকে চঞ্চল করে তুলল। বিবেকানন্দ নিজেও অবাক হলেন, যাকে দেখার জন্য মন আকুল হয়, দেখা মাত্র মনটা দ্রুত ভরে ওঠে তার প্রতি এত রূঢ় আচরণ করেন কেন? মনের মনকে শক্ত হাতে শাসন করতে গিয়ে নিজেকেই শাস্তি দেন নির্দয় হয়ে। মানুষ হলেই তাকে দুঃখ, যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে। ভোগান্তির দুঃখ এড়াতে গিয়ে অমানুষ না হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর ঠাকুর। তাঁর কথা শুনলেন কৈ? অনুশোচনা হল বিবেকানন্দের।

কিন্তু ঠাকুরের কথাটা যে তাঁর নিজের বেলাতে এত গভীর করে প্রযোজ্য হবে তা জানতেন না। নিজের জন্য এবং মার্গারেটের জন্য এক গভীর বেদনা অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব. অহং সব কিছুকে মার্গারেট ভীষণ নাড়া দিল। তার প্রস্থানের দৃশ্যটা তিনি কিছুতে ভুলতে পারছিলেন না। তার অপমান, অভিমান তাঁকে একবার তছনছ করে দিল। এতকাল তার সঙ্গে যে সম্পর্কটা ছিল তার মধ্যে এরকম নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের কোনো ঘটনাই ছিল না। এরকম গভীর অপমান, অভিমান নিয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরেও যেতে হয়নি তাকে। তাই একবারও বোধহয় বুঝতে পারেননি যে, মার্গারেটের যে থাকাটা তিনি না থাকাই বলে জানতেন তাই ছিল এক মস্ত বড় হয়ে থাকা। শীতের ঝরাপাতা গাছের কঙ্কাল ডালপালার মধ্যে যে প্রাণ সুপ্ত থাকে বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সব শূন্য ডালেই কচি কিশলয়ের সহস্র গুঁড়ি গুঁড়ি কুঁড়িতে ভরে উঠে প্রমাণ করে যে তারা প্রচণ্ডভাবেই ছিল, কিন্তু লুকিয়ে ছিল। অনুভূতির মধ্যে মার্গারেটের অস্তিত্বটা অনেকটা সেরকম।

ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিবেকানন্দের দু'চোখ অজান্তে ভিজে উঠল। নিরুচ্চারে নিজের মনে বলল : সেই প্রাগৈতিহাসিক ন্যক্কারজনক ভাবাবেগ দিয়ে তুমি আমাকে বাজিয়ে নিতে চাও?

মার্গারেটের সঙ্গে গলির মুখেই দেখা হল সারদানন্দের। সৌজন্যের হাসি হাসল সে। মার্গারেট অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এড়িয়ে গেল তাকে। কোনোরকম কথা

বলার চেষ্টা করল না। এমনকি পরিচিতের সঙ্গে দেখা হলে যেরকম ফিক করে হাসে সেরকমও কিছু করল না। সারদানন্দের কেমন সন্দেহ হল। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় এক গভীর যন্ত্রণা অনুশোচনায় তার ভেতরটা যেন ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল।

সারদানন্দ স্তব্ধ হয়ে পথে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরে কোনো ভাবনা-চিন্তা না করে, জোর কদমে হেঁটে গিয়ে ওকে ধরল। পিছন থেকে ডাকল : মার্গারেট। হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে এসে বলল : তোমার কী হয়েছে মার্গারেট? অমনভাবে মুখ ভার করে কোথায় যাচ্ছ? কথা বলছ না কেন? আশ্রমে কি কেউ নেই?

মার্গারেটের উত্তর না পেয়ে পুনরায় বলল : মার্গারেট আমি তোমার বন্ধু। আমাকে তুমি সব বল। মানে, আমি, তুমি— আমরা সকলে এক আশ্রয়ে আছি।

মার্গারেট বলল : শুনে কী হবে? তোমাদের দেশে কী পুরুষ কী মেয়ে সবার হারাবার ভয় বড় বেশি।

একথা বলছ কেন?

দুঃখে, অপমানে, অভিমানে মার্গারেটের দুই চোখ যেন বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে ওঠে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত তাকে দুর্জয় দেখায়। বলল : আমি আর কোনো দিন বলরাম বসুর ভিটে মাড়াব না। কেন আসব?

সারদানন্দ বেশ একটু অবাক হয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল : ম্যাডাম বলরাম বসুর ভিটের দোষ কী?

তুমি জান না সারদা, একটা সাংঘাতিক অপরাধবোধে আমার ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অথচ, অপরাধটা যে কোথায় জানি না। সেকারণে মনে বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই। জ্বলে মরছি শুধু আমি সেই অপরাধের গ্লানিতে।

সারদানন্দ ওর মনের ভার হাল্কা করে দেবার জন্য রসিকতা করে বলল : এ আর নতুন কথা কি, অপরাধ করে একজন আর তার ফলভোগ করে আর একজন। ভগবানের লীলা বড় বিচিত্র। তা জানাব ক্ষমতা বা যোগ্যতা কার আছে বল?

সারদানন্দ আমার ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। মিসেস সারা বুল, মিস্ ম্যাকলয়েড যদি স্বামীজির পাশে ছায়ার মত থাকতে পারে তাহলে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা আমার বেলায় দোষের হবে কেন? লোকে মন্দকথা বলবে এসব ভেবে স্বামীজির আকুল হওয়ার কারণ কি?

সারদানন্দ হাসল ওর কথায়। বলল : তুমি স্বামীজির কথা বলছ। উনি একা কোনো মহিলার সঙ্গে দেখা করেন না। কারণ, মানুষের সব পাপ চোখের দেখার।

ওঁদের সঙ্গে আমাকে আলাদা করে দেখার কোনো কারণ আছে? আমাকে ভয় পাওয়া ওঁর মনের ব্যাপার। এতে আমার কোনো ভূমিকা নেই।

তা নেই, কিন্তু অন্যের ওরকম ভাবনায় ওঁকে অনেক কিছু হারাতে হবে।

সন্ন্যাসীর হারানোর কিছু নেই।

সন্ন্যাসী ভগবান নয়, মানুষ। তাঁরও শত্রু আছে। স্বামীজির শত্রুরা দেশ বিদেশ

জুড়ে কত কুৎসা করে বেড়াচ্ছে। ওঁর অনুরাগী ভক্ত, বিদেশী শিষ্যদের অধিকাংশ মহিলা বলে নিন্দুকেরা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কতরকম কটাক্ষ, গালমন্দ করছে, নিন্দে, অপবাদ রটাচ্ছে। সব তো জান। সেজন্য স্বামীজির মনটা ইদানীং ভালো নেই। হয়তো সেকারণে তাঁর ব্যবহারটা রূঢ় হয়ে গেছে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে ওদের কথা বলতে দেখে পথ চলতি অনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। বিশেষ করে মেমসাহেবকে দেখার জন্যই লোক দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভিড় জমতে দেখে সারদানন্দ বলল : It is the cause, it is the cause my soul—Let me not name it to you, you chaste stars—It is the cause—স্বামীজি একারণে তোমার সঙ্গে একা একা কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করেছেন।

মার্গারেট বেশ একটু অখুশি হয়ে বলল : এ তোমাদের সমাজের দোষ। এদেশে পুরুষ ও নারী দুই মেরুর মানুষ। নিজের মনের কারাগারে তারা বন্দী হয়ে আছে। ছোট হয়ে গেছে তাদের আকাশ, অনুভূতির বৃত্ত। সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চাই শিক্ষা। যতদিন না জীবনে স্বাভাবিক হতে পারছে, কারাগারে অন্তরীণ সত্তাটা মুক্তির জন্য আঁকুপাঁকু করবে। শ্বেতাঙ্গ মেয়ে-পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহজ স্বাভাবিক মেলামেশার দিকে তাই লোভীর মত তাকিয়ে থাকে। অবাক হয় তারাও,- ওদের মত হতে পারে না কেন? খাঁচার পাখি যেমন নীল আকাশের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকে মুক্তির তৃষ্ণায়, ওদের দু'চোখে অনুরূপ এক দিশাহীন ভাব।

মার্গারেটের কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সারদানন্দকে অভিভূত করল। তাকে নীরব দেখে মার্গারেট ভাবল, সারদানন্দ এরূপ সমালোচনায় খুশি হয়নি। বুকটা কেমন দুরদুর করে উঠল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। বিদেশিনী বলেই সহজ হয়ে উঠতে পারছে না সে। মেয়েলী মনের দুর্জয় অভিমানে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল। কী যেন বলি বলি করেও সামলে নিল নিজেকে। ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বলল : বিদেশিনী হওয়ার অনেক জ্বালা। আচার্য বোধহয় আমাকে নিয়ে সমস্যায় আছেন। তবে সমস্যাটা যে কী জানা থাকলে ভালো হত। আমার জন্য ওঁর স্বপ্ন নষ্ট হোক্ চাই না। বেশ বুঝতে পারি, বাইরের অনেক ঝড়-ঝাপ্টা ওঁর গায়ে লাগছে অহরহ। তাতে মনটা বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত হওয়া কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু আমিও তো একটা মানুষ। আমার সময় কাটে কী করে? নিষ্কর্মার মত বসে বসে সময়ের অপচয় করতে আমার খুব কষ্ট হয়। গুরুকে একথাটা বলতে চাওয়া কি খুব অপরাধ? শুনতে পাচ্ছি, মিসেস ওলি বুল এবং মিস ম্যাকলয়েড কোলকাতায় আসা থেকে তাদের নিয়ে রাত্রিদিন এত ব্যস্ত যে আমার কাজের প্রতি নজর দেওয়া কিংবা আমার কথা ভাবার সময় হয় না তাঁর। আমি কী করেছি? আমাকে অবহেলা করার কী আছে? ওঁরা ধনী, স্বামীজির কাজে বিপুল অর্থ দান করতে পারেন বলেই হয়তো সমাদরের সিংহভাগ জোটে ওঁদের কপালে।

সারদানন্দ এই অভিযোগের উত্তর না দিয়ে বলল : ওঁকে মিথ্যে দুষছ তুমি। বাইরেটা দেখে কি ভেতরটা বোঝা যায়? তোমার জন্য কত ভাবেন, তুমি জান না। তোমার থেকে ওঁর দায়িত্ব অনেক বেশি।

কী জানি? স্কুল খোলার আয়োজন কোথাও চোখে পড়ছে না। যতদিন যাচ্ছে অধৈর্য হয়ে পড়ছি।

হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

একজন মানুষের অপেক্ষা করা, কাজ করার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। সেই সময় অপচয় হলে ভাবনা হয়। হতাশায় মনটা কুরে কুরে খায়।

যথার্থই। কিন্তু উনি বসে নেই। বসার একটা ঘর, লেখার একটা বোর্ড হলেই মেয়েদের স্কুল হয় না, ছাত্রী চাই। কোথায় পাবে ছাত্রী? একজন বিদেশিনী বিধর্মী শিক্ষিকার কাছে অভিভাবকেরা লেখাপড়া করতে মেয়ে পাঠাবে কেন? তুমি জান না, যেদেশে বিধর্মীর ছায়া পড়লে ধর্ম যায়, জাত যায়, অচ্ছ্যুৎ হয় — সেদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজটা যে কত কঠিন, কাজে নামলে টের পাবে। এই অপ্রিয় রূঢ় কথাগুলো স্বামীজি তোমাকে বলতে কষ্ট পান। তুমি দুঃখ পেলে সে কষ্ট তাঁকেও যন্ত্রণাবিদ্ধ করবে। মায়ের হৃদয় ওঁর। মানুষের কষ্টে ওঁর বুক ফেটে যায়।

সারদানন্দের কথা শুনে মার্গারেটেব বুকটা মোচড দিয়ে উঠল। কথা হারিয়ে গেল তার। অথচ, এতদিন ধরে যেসব ভাবাবেগ, উষ্ণ তরল প্রমত্ত হয়েছিল হঠাৎ বিজাতীয়তার প্রশ্নে তা যেন মুহূর্তে শীতল, প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। তাঁর ঐ বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখ দেখে বড় মায়া হল সারদানন্দের। বলল : হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তোমার উৎসাহ, উদ্যমের অপব্যয় হয় এমন কোনো কাজ মরে গেলেও উনি করবেন না। তুমি ওঁকে পুরোপুরি ভরসা করে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। পাশ্চাত্য থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের গোত্রে তুমি পড় না। তুমি একেবারে আলাদা। তোমার কাজের ক্ষেত্রটা ওদের মত ছোট্ট নয়। স্বামীজিব কর্মযজ্ঞের তুমি একজন প্রধান ঋত্বিক। তোমার আত্মপ্রকাশের জন্য ক্ষেত্র চাই। যে সে ক্ষেত্র হলে চলে না। চিকাগো ধর্মসভার বিশাল মঞ্চ না পেলে বিবিক্তানন্দ বা বিবিক্ষানন্দ—কোনোদিন স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারতেন না। চিকাগো ধর্মসভা তাঁকে বিশ্ববাসীর সামনে এনে দাঁড় করল। তেমনি একটা ভারতমঞ্চ কিংবা বঙ্গমঞ্চে এদেশবাসীর সামনে তোমাকে তুলে ধরতে চান তিনি। চিকাগোতে স্বামীজি যেমন প্রথম দিনেই বিশ্বকে জয় করেছিলেন তেমনি প্রথম দিনেই তুমি ভারতের হৃদয় জয় কর এই আশা তাঁকে প্রত্যয়বান করেছে। কারণ তুমি বাগ্মী; বিদেশিনীদের মধ্যে কেবল তুমিই পার এদেশের হৃদয় খুঁড়ে ভারত আত্মার মর্মবাণীতে মানুষের অন্তব জয় করে তাদের হৃদয় সিংহাসনে নিজের অভিষেক সম্পন্ন করতে। তোমার সে রাজকীয় অভিষেক দেখার স্বপ্ন তাঁর দুই চোখে। তোমার নিজের পরিচয়ই তোমার কর্মের ছাড়পত্র হোক। ঠাকুর বলতেন কেউ কাউকে কিছু করে দিতে পারে না, নিজের নিয়তি নিজের হাতে। গুরু শুধু

পথের সঙ্কেত দিতে পারেন, পথ চলতে হবে নিজের নিষ্ঠায়, নিজের জোরে।

মার্গারেটের সব কথা ফুরিয়ে গেছিল। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল। সারদানন্দের কথাগুলো সারা রাস্তার ধরে তার বুক আলোড়িত করল। সুগন্ধ ফুলের সুবাসের মত একটা মিষ্টি ভালোলাগা তার সমস্ত চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তার আর দুঃখ নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই। পথে যেতে যেতে নিরুচ্চারে নিজের মনে বারংবার বলল : প্রভু আমার, স্বামী আমার, গুরু আমার, ইষ্ট আমার—তুমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ। তুমি আমার সকল ভালোর স্রষ্টা । তুমি কি আমায় ত্যাগ করতে পার। সারা জীবন আমি কেবল তোমারই—তোমাকেই এ জীবন উৎসর্গ করছি। হে আমার প্রিয়, তুমি আমার জীবন সর্বস্ব। আমার অহঙ্কারকে চূর্ণ করার জন্য আমাকে দীন কর, কিন্তু তোমার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না।

একটা আশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে মার্গারেট ঘরে ফিরল। মিস মুলার উদ্বিগ্ন হয়ে তার অপেক্ষা করছিল। সে ফিরতেই জিগ্যেস করল : হ্যাঁরে, কী হয়েছে?

স্মিত হেসে মার্গারেট উত্তরটা এড়িয়ে গেল। বলল : কিছু হয়নি তো।

মিস মুলারের বিশ্বাস হল না। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল মনের ভেতর। বলল: মুখখানা শুকনো. চোখের চাহনিতে এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব। মনে হয় মনের ওপর দিয়ে একটা বড় ঝড় বয়ে গেছে। নইলে, এত বিধ্বস্ত লাগত না।

মার্গারেট একটু অসহায় বোধ করে। মনটা এমনিতে সিক্ত ছিল। মিস মুলারের স্নেহপ্রবণ মনের সহানুভূতি এবং উৎকণ্ঠা হঠাৎই উতলা করে তুলল তাকে। ভিতরের আবেগটা দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে বলল : মনটা ভালো নেই। মন ছাড়া মানুষ হয় না। মনের মনটা কি চায় জানা থাকলে কোনো সমস্যাই হত না। মনের অয়নপথ বড় বিচিত্র। কখন কোথা দিয়ে ঝড় আসবে মনই টের পায় না। মাঝে মাঝে নানারকম আবেগ অনুভূতির সংঘর্ষে জট পাকিয়ে ওঠে। সে রকম একটা জটলায় ভেতরটা অস্থির হয়ে আছে।

সন্দিগ্ধ চোখে মিস মুলার ওর দিকে চেয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল: তুমি আমাকে গোপন করছ।

মার্গারেট গম্ভীর হয়ে বলল : সব মানুষেরই ব্যক্তিগত কিছু কথা থাকে। সকলকে সব কথা বলা যায় না। অসহনীয় হলেও একা একা সহ্য করতে হবে। এই সহ্যক্ষমতা মানুষকে সহিষ্ণু করে।

মিস মুলার একটা চেয়ারে বসল। মুখের স্নিগ্ধভাবটা ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে একটা কঠোরতা ফুটল। অনুশোচনার গলায় বলল : আমার মনটাকে কেউ বুঝল না। আমার বাইরের ব্যবহার নিয়ে সবাই আমাকে ভুল বুঝল। স্বামীজিও আমার কাছ থেকে

অনেকদূর সরে গেছেন। তোমাকে আপন ভেবে কাছে টেনে নিলাম। ভাবলাম তোমাকে আশ্রয় করে আমি স্বামীর কাছের মানুষ হয়ে উঠব আবার। কিন্তু তুমিও দিন দিন অন্যরকম হয়ে উঠছ। তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কেমন একটা পালাই পালাই ভাব সব সময়। বেশ বুঝতে পারি একটা একাকিত্ববোধ তোমাকে গ্রাস করছে। তোমার সেই উচ্ছল, প্রাণচঞ্চলভাবে ভাটা পড়েছে।

মার্গারেট চুলের বিনুনি খুলতে খুলতে স্তব্ধ হয়ে গেল। মিস মুলারের বুকে লুকোনো কান্নাটা তাকে আচ্ছন্ন করল। কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্বের মত তাঁর দিকে চেয়ে রইল। মুখ কেমন সাদা। চোখে বোবা শূন্যতা। সারদানন্দের কথায় তার মনে যে রোমহর্ষ রহস্যময় আনন্দের অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল তাকে বলি বলি করেও সামলে নিল। বলল : একাকিত্ব ছাড়া কোনো কিছু গভীর করে অনুভব করা যায় না। আজ কেবলই মনে হচ্ছে, এক বৃহত্তর জীবনের আহ্বান আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এক উপচানো আনন্দ এবং অসহনীয় সুখবোধের সঙ্গে এক গভীর নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা মিশে আছে। মনের অভ্যন্তরে এ কোন্ প্রদোষের রহস্যময় আলো আঁধারের লীলাখেলা? ঘোড়াগাড়ি করে যেতে যেতে বারংবার মনে হতে লাগল চারদিকে এত আলো-হাওয়া প্রাণভরে শুষে নাও। চোখ মেলে যত দেখি ততই সব সুন্দর মনে হয়। বিষাদ অন্তর্হিত হয়। আনন্দে হৃদয় ভরে ওঠে। মনে হয়, জীবনের আসল মানেটা মুক্তি। কিন্তু কী আশ্চর্য বেশিরভাগ মানুষের কাছে জীবন একটা বন্দীদশা।

বিরসমুখে মিস মুলার বলল : তোমার এ ভাবাবেগ নিছকই একটি মেয়ের অভিমানের সমস্যা। এর মধ্যে কোনো সত্য নেই। স্বামীজি কেন কাজের দায়িত্ব দিচ্ছে না সে কথা কি জানতে চেয়েছ?

মার্গারেট ওঁর প্রশ্নের জবাবে বলল : ফুল কি জানতে চায় মধুকর তার কাছে আসবে কবে? আমিও তাই কোনো গরজ বোধ করছি না। যাঁর কাজের জন্য এসেছি সময় হলে তিনিই ডেকে নেবেন।

স্বামীজির তো এবিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখছি না। কিছু করব মনে করলে তো করা যায় না, তার জন্য টাকা চাই। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খুলতে যে টাকাই লাগুক তার সবটাই আমি দিতে প্রস্তুত।

তাঁর কথা শুনে মার্গারেট চমকাল। মিস মুলারের অনেক অর্থ আছে। তাই কথায় কথায় অর্থের দেমাক দেখাতে তিনি ভোলেন না। তাঁর সম্পর্কে এ অভিযোগ যাঁরা করেন, তাঁরা ঈর্ষা করে গায়ের জ্বালায় বলেন। টাকা অনেকের আছে, কিন্তু কজন মিস মুলারের মত এমন অকাতরে দিতে পারে? মিস মুলারের হৃদয়খানা আকাশের মত বড়। মহাপ্রাণ না হলে অন্য দেশের মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য, চিত্তবৃত্তি বিকাশের জন্য, জীবনের সার্বিক উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থভাবে এত অর্থ দিতে পারতেন না। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য বাইশ বিঘা জমি কেনার সব

অর্থই তিনি দিয়েছেন। তাঁর অযাচিত দানের মধ্যে কোনো কৃপণতা নেই। তাঁর দানের মন এত বড় যে অনেকে ঐ দানকে হেয় করার জন্য 'মুলারের টাকার দেমাক' বলে অপপ্রচার করেন। এতে নিন্দুকরা নিজেদেরই ছোট করেছে। মার্গারেটের মনে হয়েছে মিস মুলারের অযাচিত দান করার মধ্যে আন্তরিকতা নিশ্চয়ই আছে। সৎ এবং মহৎ কার্যের জন্য তাঁর এই দানের মহিমা ও গৌরব অন্যের নিন্দেতে ছোট হয়ে যায় না। বরং নিন্দের আলো পড়ে দানটা আরো বড় হয়ে যায়।

কিছুক্ষণের জন্য মার্গারেটকে অন্যমনস্ক দেখাল। মিস্ মুলারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তাঁর প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বলল : তোমার মহৎ সংকল্পকে রাজা ব্যর্থ হতে দেবে না। যে আন্তরিকতা নিয়ে তুমি ভারতে এসেছ তার মূলে তো ঐ হৃদয়বত্তারই প্রেরণা রয়েছে। তোমার মত কামধেনু তাঁর ঘরে বাঁধা বলে রাজার টাকার দুর্ভাবনা নেই। টাকার কথা কেউ তুললে ঠারে ঠারে জানিয়ে দেয় টাকার অভাবটা কোনো সমস্যাই নয় আসল অভাব সচেতনতার, যাদের জন্য কিছু করা হবে, তারাই ওর গুরুত্ব বোঝে না। তাই বলে ও হাল ছেড়ে দেয়নি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস কাজের স্পৃহার জোরেই বদলে যাবে আবস্থাটা।

পাঁচ
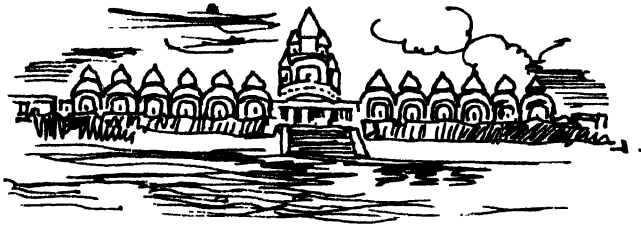
আলমবাজার থেকে রামকৃষ্ণ মিশনকে বেলুড়ে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করার জন্য স্বামীজি ধুমধাম করে রামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব পালনের আয়োজন করেছেন। যতদিন বাইশ বিঘা জমির ওপর মিশন, মঠ এবং রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ না হচ্ছে ততদিন নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়িতেই মিশন থাকবে।

কার্যত পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র বাড়িতেই মহাসমারোহে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের বিবিধ অনুষ্ঠান পালিত হল। ঐ দিনই মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠার শিলান্যাস বলতে যা বোঝায় তাই করলেন বিবেকানন্দ। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিদেশিনী শিষ্যাদেরও সেখানে আমন্ত্রণ করা হল। মিসেস ওলি বুল এবং মিস ম্যাকলাউড পূর্বাহ্ণেই বেলুড়ে অবস্থান করছিল। তাই মিস মুলার ও মার্গারেটকে কোলকাতা থেকে বেলুড়ে নিয়ে আসার জন্য স্বরূপানন্দকে পাঠানো হল।

বাবুঘাট থেকে একটা নৌকো ভাড়া করে তারা বেলুড়ে যাত্রা করল। মরালের মত স্বচ্ছন্দে স্রোতের ভেলায় ভেসে চলল যেন কোন্ দেবলোকের দিকে। সমস্ত নদীপথটাই নির্জন। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট-বড় নৌকোর সঙ্গে দেখা মিলছিল। পরস্পরকে অতিক্রম করে যাওয়ার সেই ক্ষণটুকু বোধ হয় নৌকো সফরের সুন্দর মুহূর্ত।

নদীর দু'পাড়েই ঝোপ-ঝাড় আছে। তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে মানুষের বসতি। ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়ে পড়ে, ধাক্কা খেয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। চেয়ে চেয়ে দেখছিল মার্গারেট। জীবনও স্রোতের মত চল্‌কে চল্‌কে চলে। মুখর জীবনের প্রতিমুহূর্ত কত আবেগ উচ্ছ্বাসের ঢেউ। কত দুঃখ বেদনা, আনন্দের দোলায় দুলতে দুলতে মানুষও চলেছে। মানুষ থেমে নেই। তার মনেরও বিশ্রাম নেই। শুধুই ছুটছে নদীর স্রোতের মত। কোনদিকে যে ছুটছে, কেন যে ছুটছে কিছুই জানে না। একটি কথা ভাবতে না ভাবতেই মন অমনি ঝাঁপ দেয় আর এক দরিয়ায়। নদী তবু একখাতে বয়, তার একূল, ওকূল—দুকূলই আছে। কিন্তু মানুষের মনের কোনো কূল নেই। শুধুই সে ছুটছে অভাবের পেছনে, অর্থের পেছনে, খ্যাতির পেছনে, ভোগ সুখের পেছনে, মোক্ষের পেছনে। মার্গারেট নিজের মনেই ভাবছিল আর ভাবছিল। নদীর সঙ্গে মিশে গিয়েই যেন ভাবছিল।

স্বরূপানন্দের গান তার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল। গানের মধ্যে বিভোর হয়ে গেছিল স্বরূপানন্দ। তার কণ্ঠস্বরে মাধুর্য ছিল না, কিন্তু সুরে ঐশ্বর্য ছিল।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
ভাসল তরী সকালবেলা,ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে সমীর, ভেসে যাব রঙ্গে।

একসময় গান শেষ হয়। কিন্তু ফুরিয়ে যায় না তাব নিঃশব্দ শব্দময়তা। মার্গারেট খানিকক্ষণ বিভোর হয়ে চেয়ে রইল। তারপর অভিভূত গলায় বলল : তোমার গানের ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু ঐ সুব যেন সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে মনটাকে কোন সুদূরলোকের দিকে নিযে যায়। তখন জগৎ আনন্দময় দেখি। জীব, জন্তু, আকাশ, পৃথিবী সব যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই অনুভূতিটুকু পাওয়া গানের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত।

মার্গারেটের কথাগুলো মিস্ মুলারের কান ভরে রইল। কিন্তু এই ভাবালুতার মূল্য কতটুকু? তাই বেশ একটু দম্ভ করে স্বরূপানন্দকে বলল : আমি তিন-তিনবার ভারতে এসেছি। এখানকার মানুষের মাঝখানে নেমে এসে তাদের সঙ্গে মিলে এদশের মানুষকে আবিষ্কার করার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য দুই আমার হয়েছে। ভারতের সব দুর্ভাগ্যের মূলে আছে পুরোহিততন্ত্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। জনসাধারণের ঘাড়ে ভূতের বোঝার মত চেপে বসে থেকে জীবনের মেদ মজ্জা, মাংস, রক্ত শুষে নিচ্ছে। তার বোধ-বুদ্ধি-মনুষ্যত্ব পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। ভারতবর্ষের জন্য সবচেয়ে বড় দরকার ভূত ঝাড়ানো মন্ত্র। তাই, আমি মরা অস্থির মধ্যে নতুন জীবনের সাড়া জাগানোর জন্য নিজে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছি এবং একটি হিন্দু বালক অক্ষয় ঘোষকে দত্তক নিয়েছি। বলতে পার, এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। তোমাদের এই পচা গলা শবের ওপর যে অনড় অচল সমাজের অচলায়তনের প্রাচীর উঠেছে তাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছি। মানুষের মনুষ্যত্বকে কিছুটা চাঙ্গা করতে পেরেছি।

ভারতের জন্য যা দরকার তা হল শিক্ষা। নারীশিক্ষার রাজপথ ধরে এদেশে মুক্তি আসতে পারে। স্বামীজিও বলতেন : ভারতের প্রকৃত মুক্তি নির্ভব করছে নারীর ওপরে, পুরুষের ওপরে নয়। ভারতের নারীরা সেবায়, ত্যাগে, বীর্যে, মহানুভবতায় মহীয়সী নারী। একটু শিক্ষা পেলেই পাশ্চাত্য নারীদের পিছনে ফেলে এগিযে যাবে মানবমুক্তির পরোয়ানা নিয়ে।

স্বরূপানন্দ চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল : বেলুড়ে যে মঠ বাড়ি স্থানান্তরিত করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার কাজ ঠাকুর স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে থাকতে থাকতে সূচনা করে গেছেন। প্রেম ও বৈরাগ্যের আদর্শ সঙ্ঘজীবনের মূলমন্ত্র। দক্ষিণেশ্বরে যে ত্যাগের বীজ বপন করেছিলেন শ্যামপুকুর, বরাহনগর হয়ে বেলুড়ের মাটিতে সেই চারাগাছটিকে বিশাল বটগাছ হয়ে ওঠার জন্যই রোপন করা হল। প্রতিটি স্থান মঠেব ক্রমবিকাশের পথে এক একটি মাইলস্টোন। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের দশ মাসের ব্যাধিকে অবলম্বন করে ভাবী সন্ন্যাসী সঙ্ঘ স্বতোৎসারিত পথেই এগিয়েছিল। আমরা দেখেছি কাশীপুরে ঠাকুর এই সঙ্ঘ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। স্বামীজিকে বিভিন্ন সময়ে তিনি বলতেন, মা তোকে দক্ষিণেশ্বরে টেনে এনেছেন তাঁর কাজ করার জন্য। তুই পালাবি কোথায়? আমার পিছে তোকে ফিরতেই হবে। তুই হবি একটা বিশাল বটগাছ, তোর ছায়ায় হাজার জীব আশ্রয় পাবে। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই তোর জীবনের মন্ত্র। আত্মনো মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় এই মহামন্ত্রকে জপমন্ত্র করে সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। স্বামীজি বলেন, তুমি কাউকে সাহায্য করতে পার না, তুমি কেবল সেবা করতে পার। সেবাই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ পূজা।

মিস মুলারের উজ্জ্বল দুই চোখের তারায় হঠাৎই একটু বিব্রতভাব খেলে গেল। বিজ্ঞের মত বলল : আমার কাছে খবর আছে, তোমাদের ঠাকুর সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্বরূপানন্দ বলল : তিনি নিজেও সন্ন্যাসী নন, গৃহী যোগী। কিন্তু বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ। বিশ্বের কোন যোগী সংসারের মধ্যে থেকে ভাবতে পেরেছেন, 'আমিই পরম সত্য। আমিই বিশ্বের অধীশ্বর। মোহ বলে কিছু নেই, মোহ কখনো ছিল না। মানুষ নিজের মনের অভ্যন্তরেই তার কারাগার রচনা করেছে। মানুষকে সেই কারাগার ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য ডাক দিয়েছেন।

মিস মুলার বললেন : রামকৃষ্ণের অনেক ভক্ত এই সন্ন্যাসী সংঘকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। এই সার্থকতা সম্পর্কে সংশয় রয়ে গেছে।

স্বরূপানন্দ তারস্বরে প্রতিবাদ করে বলল : বোঝার ভুল। স্বামীজি যখন তাঁর কাছে সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন ঠাকুব তাকে খুব করে বকে দিলেন। বললেন, তুই বড় স্বার্থপর, শুধু নিজের কথা ভাবলি। মা তোকে দক্ষিণেশ্বরে কাজ করতে এনেছেন। কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার

হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা না হয়ে তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস। গুরুর মনের বাসনা পূরণ করতে তিনি গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। ঠাকুরের ভাবকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য এই মঠ নির্মিত হল। ঠাকুরই তাঁর কাজ তাঁকে দিয়ে করেছেন। এর বাড়-বৃদ্ধির মূলেও তিনি। যাঁরা প্রশ্ন করেছেন : ঠাকুরের উপদেশ কি এরকম ছিল? তাঁদের কথার প্রত্যুত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন : যোগেন, তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।

মিস মুলার বলল : স্বামী বিদেশে যখন থাকতেন, ঠাকুরের কৃপা, করুণা কিংবা তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটা কথাও বলেননি।

মার্গারেট বলল : মিস মুলার, স্বামীর সঙ্গে তোমার পরিচয় তিন-চার বছরের। তবু নিন্দুকদের অপপ্রচারটা তুমি বিশ্বাস করলে কী করে? স্বামীজি ঘরোয়া কথাবার্তার সময় কত সময়ে বলেছেন আমি দেহহীন এক কণ্ঠস্বর — I am a voice without form। তাহলে ও কার কণ্ঠস্বর আমরা তাঁর মুখে শুনেছি? এ প্রশ্নের উত্তর রামকৃষ্ণের। যে ভারত নিত্য ও শাশ্বত তার প্রতীক রামকৃষ্ণ। স্বামীজি সেই চিরন্তন ভারতবর্ষের ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যবাসীকে পরিচয় করে দিয়েছেন। কতবার তাঁর কাছে শুনেছি, সপ্তাহে বারো চোদ্দটা বক্তৃতা দিই। প্রস্তুত হওয়ার সময় পাই না। কী বলব নিজেও ভাল করে জানি না। যখন বলতে উঠি তখন দেখি কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন কত নতুন কথা, নতুন ভাব — যা তিনি কখনও শোনেননি, ভাবেনওনি। এইভাবে একটা ঘোরের মধ্যে থেকে তিনি ভাষণ দিতেন। তাতেই লোক মুগ্ধ হয়ে যেত। বাহবা দিত তাঁকে। কিন্তু তিনি বলতেন ঠাকুরই তাঁকে দিয়ে এসব বলাচ্ছেন। ঐ বাহ্‌বা তার উপাসিতের পায়ে ভক্তের পূজাঞ্জলি হয়ে শোভা পেত। এরপরেও জোর করে যদি কেউ অভিযোগ আনেন তা-হলে সে নিন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাফাই গাওয়ার কোনো গরজ না দেখানোর অপরাধ কোথায়।

এইরকম কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎই নির্মুক্ত অবারিত নীল আকাশের কোণে জেগে উঠল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের গগনভেদী চূড়া। নীল আকাশের ললাটে আঁকা যেন একটা অপূর্ব রাজতিলক। নৌকো যত এগিয়ে চলে দক্ষিণেশ্বরের নদীতীরের আরেকটা নতুন রূপ ফুটে ওঠে। তীরের দুধারে নারকেল, তাল, খেজুর গাছের শ্রেণী। নদীতটে হেলে পড়া বটগাছ, বাবলাগাছ মাটি কামড়ে এমন একটা অনুপম শৈল্পিক ভঙ্গিতে আছে যে চোখ ফেরানো যায় না। সবকিছু মিলে প্রকৃতির একটি অনুপম পটে বাঁধানো রয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। হিন্দুর প্রিয়তম নদী গঙ্গার তীরের ওপরেই দুর্গ প্রাকারের মত মন্দিরের সার। সব মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি করে ওঁ শোভিত ত্রিশূল আছে। সব কটি মন্দিরই একই রকম দেখতে। কেবল ভবতারিণীর বিশাল মন্দিরেব স্থাপত্যকলা

একটু ভিন্নরকম। দেখতে দেখতে মার্গারেটের সমস্ত মন বিহ্বল হয়ে গেল। গঙ্গার বুক থেকে দেখতে লাগল যেন প্রকৃতির নির্মুক্ত পটে আঁকা রয়েছে অপূর্ব একটি অনুভূতির আত্মলীন ভাবমূর্তি।

নিজের ভাবনায় তন্ময় হয়ে গিয়ে মার্গারেট দেখতে পাচ্ছিল, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের ঘরে বসে আছেন। তাঁর খুব কাছে বসে আছে প্রিয়তম শিষ্য নরেন। প্রসঙ্গটা নরেনই উত্থাপন করেছিল। বৈষ্ণবদের দর্শন হল : জীবে দয়া করে যে জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। পরিবৃত অনুরাগী ও ভক্তদের মধ্যে সহসা বিতর্ক সৃষ্টি হল। রামকৃষ্ণ কথার চাপান-উতোর শুনতে শুনতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সমাধি যখন ভাঙল, নরেনকেই তিরস্কার করে বললেন, শালা, জীবে দয়া! জীবে দয়া করার অহংকার তোকে কে দিল? দূর শালা! কীটানুকীট তুই, জীবকে দয়া করবি কি? তোর আছে কি, যে দয়া দেখানোর স্পর্ধা করিস? জীবকে দয়া করার তুই কে? তুই শুধু বলতে পারিস শিবজ্ঞানে জীবেব সেবা করি। কথাগুলো বলার সময় শরীরে উত্তেজনাব ভাব প্রকাশ পেল। তাঁর শরীর কাঁপছিল। চোখ দুটি রাঙা জবার মত হয়েছিল।

নরেন তো এক নতুন আলো খুঁজে পেল ঠাকুরেব কথায়। দু'হাত করজোড করে ঠাকুরের সামনে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুর তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল: ওরে বোকা - জীবে শিবে ভেদ নেই, কেবল নামেই আলাদা।

বেলুড়ের ঘাটে মাঝিদের নৌকো ভেড়ানোর তোড়জোড় দেখে মার্গারেটের সহসা চৈতন্য হল। ব্যস্তভাবে মাঝিদের দিকে তাকিয়ে বলল : আহা কর কি? এখানে নয়। দক্ষিণেশ্বরে। যাঁকে নিয়ে আজ এত আয়োজন তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার পীঠভূমি দর্শন না করে বেলুড়ে যাব না।

স্বরূপানন্দ বেশ একটু বিপন্নবোধ করল। অস্বস্তিকর দ্বিধা ও সংকোচ নিয়ে বলল: ম্যাডাম অবুঝ হবেন না। সব দেশের মানুষের নিজের কিছু কিছু সংস্কার থাকে, প্রথা ও আচরণবিধিও আছে। যেগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই মানে। পুরুষ পরম্পরায় এই বিশ্বাসগুলো পরমযত্নে লালন করে আসছে তারা। অসাবধানে হঠাৎ যদি কেউ তাকে ভেঙে ফেলে তা-হলে সমূহ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সকৌতুক মার্গারেট বলল : সমস্যা হবে আপনাকে বলল কে?

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কতরকম ঝঞ্ঝাট যে স্বামীজিকে ভোগ করতে হচ্ছে আপনি জানেন না। জানলে, কখনও বলতেন না।

আমি যা জানি, তা-হল ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যা করতে পারেননি তাঁর শিষ্য তাই করে দেখাল। কোনো বাধাই তাঁর বাধা মনে হয়নি। সমস্যার ভয়ে পিছিয়ে পড়েননি। তাই তো গঙ্গার ওপারে বেলুড়ে স্বামীজির পক্ষে রামকৃষ্ণবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল। এত বড় গুরুদক্ষিণা ক'জন শিষ্য দিতে পারে?

স্বরূপানন্দ বলল : সমস্যা তো সেখানে। মঠ-মন্দিরের দ্বার সব শ্রেণীর এবং সব

ধর্মের মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য বিরোধীদের দ্বারা ভীষণভাবে সমালোচিত হচ্ছেন। কিন্তু স্বামীজি নতুন কিছু করেননি। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাঁচা আমিকে পাকা আমিতে রূপ দিতেই মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষ ধর্মে সুন্দর হোক, বিশ্বাসে উদার হোক, মানুষের কল্যাণে ও সেবায় মহৎ হোক, তা-হলেই ঠাকুরের পাকা আমির ভিত্ মজবুত হবে। সেজন্য পাঁচদিন আগে যে অনুষ্ঠান হল তাতে ব্রাহ্মণদের দেবসেবার একচেটিয়া পৌরোহিত্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানদের ওপর তার ভার অর্পণ করে স্বামীজি এক মহাসামাজিক বিপ্লবের সূচনা করলেন।

স্বরূপানন্দের কথাগুলো মার্গারেট গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। বিষয়টা ভাল করে পরিষ্কার করার জন্যই বলল : ঠিক বুঝলাম না। একটু পরিষ্কার করে বলুন।

স্বরূপানন্দ বলল : ঐদিন নীলাম্বর মুখুজ্যের বাড়িতে রামকৃষ্ণ মন্দিরে প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্তের উপনয়ন হল। এরা সবাই অব্রাহ্মণ। তারপর তারা গ্রহণ করল সনাতন গায়ত্রী মন্ত্র : তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, কিন্তু সামাজিক বিধি বিধান ভাঙার কাজটা কোনো সম্প্রদায়ের মনঃপূত হল না। স্বামীজির নিজের মনেও সংশয় জাগল। যোগানন্দকে বললেন : তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্যে সাহায্য কর, দেখবি তাঁর ইচ্ছে সব পূর্ণ হয়ে যাবে। বিরোধের ভেতর দিয়ে কাজ তো আরম্ভ করা গেল। এখন ঠাকুরের ইচ্ছেয় কতদূর হয় সেটাই দেখার। তাই বলছিলুম ম্যাডাম, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাজ নেই। তাতে শুধু অশান্তিই বাড়বে। সমস্যার মধ্যে স্বামীজিকে টেনে আনা ঠিক হবে না। দোহাই আপনাকে। জোর করবেন না। স্বামীজিও চান না, আপনি দক্ষিণেশ্বরে যান্—

মার্গারেট দৃঢ়স্বরে বলল : আমি বিশ্বাস করি না। রাজা আমার ঝড়ের আগে ছোটে। কোনো কিছুই পরোয়া করে না। আমিও ভয় পাই না। আমার গুরু অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখতে চান না। তাঁর ভাবকে পৃথিবীময় করতে চান। আমি বেশ বুঝতে পারছি ঠাকুরই আমাকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে টানছেন। স্বামীর কাজকে আর এক কদম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি আমায় ডাকছেন।

স্বরূপানন্দ অসহায়ভাবে বলল : ম্যাডাম, দক্ষিণেশ্বরে পাছে আপনাদের প্রবেশাধিকার বাধা পায় তাই বেলুড়ে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করা হচ্ছে। এ হল ঠাকুরের নিজের জায়গা। এখানে সকলের সমান প্রবেশের অধিকার। কিন্তু ভবতারিণীর মন্দির তো ঠাকুরের একার নয়, সমগ্র হিন্দুর। একটা বিরাট সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। তাই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে শত্রুরা গণ্ডগোল বাধাতে পারে। আপনাদের লাঞ্ছিত হওয়াও কোনো অসম্ভব ঘটনা নয়। কী দরকার ওখানে যাওয়ার।

নম্র গলায় মার্গারেট বলল : এত কাছে এসে ফিরে যাব। স্বরূপানন্দ, সংকল্প যখন একবার করেছি তখন সংকল্পচ্যুত আর কর না। সংকল্প ত্যাগ করা মানেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। ঠাকুরের সাধনাপীঠ দেখেই ফিরব।

স্বরূপানন্দ ভয়ার্ত স্বরে দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করে বলল : না, স্বামীজির আদেশ নেই। আমি পারব না।

গম্ভীর গলায় মার্গারেট বলল : নিষেধ করেছেন কি ? আমতা আমতা করবেন না।

স্বরূপানন্দ ভয়ার্ত গলায় বলল : দক্ষিণেশ্বরে সম্পর্কে কোনো কথাই হয়নি।

তা-হলে এত ভাবার কি আছে? আমি যা করছি তা ঠাকুরের নির্দেশে করছি। তিনিই আমার মধ্যে সাহস ও শক্তি যোগাচ্ছেন। আমাকে নিয়ে হয় তো প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে কোনো নতুন কৌতুক করছেন। শিষ্যের মনে সংশয়ের যে মেঘ জমেছে পশ্চিমের হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাক - এরকম কোনো চাওয়াও তো ঠাকুরের থাকতে পারে। বিশ্বাস কব, কে যেন ঘাটের সিঁড়ির দিকে আমাকে প্রবল বেগে টানছে, মন্দিরের চূড়া আমাকে পথ দেখাচ্ছে। বাতাস ফিস ফিস করে বলছে, আয় পিপাসী জয় রামকৃষ্ণ নাম করে। স্বরূপানন্দ আমাকে আর আটকাতে পারবেন না।

স্বরূপানন্দ বিমর্ষ গলায় বলল : স্বামীজি যদি কিছু বলেন?

মার্গারেট হাসল মরিযার হাসি।

দক্ষিণেশ্বরের চাঁদনী ঘাটে নৌকো ভিড়ল। মিস মুলার এবং মার্গারেট মাঝিদের হাত ধরে এক এক করে নৌকো থেকে নামল। যে সব দর্শনার্থী উৎসবে এসেছিল তারা মেম দেখার জন্য রীতিমত ঠেলাঠেলি আর ঝগড়া শুরু করে দিল। তাদের বাগ মানাতে সন্ন্যাসীরা হিমশিম খেল। মিস মুলার ও মার্গারেট কৌতূহলী জনতার দিকে প্রাণ উজাড় করা লিপস্টিকে রাঙানো ঠোঁটের মুগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন জানাতে জানাতে ওপরে উঠতে লাগল। এভাবে মানুষের হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে তাদেব মধ্যে দিয়ে হাঁটতে বেশ মজা লাগছিল তাদের।

স্বরূপানন্দ তো ভয়ে সিঁটকে ছিল। একটা ভয়ংকর কিছু হওয়ার আশঙ্কায় নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করছিল। বিস্ফারিত দু'চোখের তারায় তার ভয়, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা থমথম করছিল। ঘাটের সিঁড়ি বরাবর ওপরে উঠলেই মন্দিরের দরজা। ভুল করে পাছে তারা মন্দিবে ঢুকে পড়ে তাই স্বরূপানন্দ তাঁদের আগেই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল।

মার্গারেট সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িযে মন্দিরেব প্রবেশপথের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিযে রইল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগটা দেখছিল। দু'হাত জোড় করে ভক্তিভরে প্রণাম করতে গিয়ে থমকে গেল। হঠাৎ নিজেকেই প্রশ্ন করল কার উদ্দেশ প্রণাম করবে? ভবতারিণীকে, না তার পুরোহিত রামকৃষ্ণকে? অথবা ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাকে? রাসমণি না থাকলে ভবতারিণী কোথায় থাকত? ভবতারিণীর ভক্ত পূজারী রামকৃষ্ণ তো রাণী রাসমণির আবিষ্কার। ভবতারিণীর সৃষ্টি রামকৃষ্ণ। মার্গারেট ভেবে পায় না কার উদ্দেশে প্রণাম করবে? রাণী রাসমণি ছাড়া এঁদের অস্তিত্ব কোথায়? রাণীর শিলামূর্তিতে প্রাণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ। জাগ্রত দেবী তো

রামকৃষ্ণেরই সৃষ্টি। রাসমণি ভবতারিণী রামকৃষ্ণর সমন্বয়ে জীবন যখন মহাসঙ্গীত হয়ে ফুটে ওঠে তখন সঙ্গীত ও সাঙ্গীতিকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মত একাত্ম হয়ে 'ওঁ' প্রাপ্ত হয়। তখন যাকেই প্রণাম করা হোক না কেন তা উপাসিতের পায়ে গিয়ে পুজোর অর্ঘ্য হয়ে পৌঁছয়।

কয়েকটা মুহূর্ত দীন এক তপস্বিনীর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মার্গারেট। স্বরূপানন্দের ভয়ার্ত ডাকে সহসা আলোড়িত হল তার চেতনা। ম্যাডাম, ওদিকে দাঁড়াবেন না। যেদিকে মেলা বসেছে আমরা ঐ দিকে যাব।

সারি সারি শিবমন্দিরের পিছনে সুরকী বিছানো রাঙাপথ হাঁটার সময় বারংবার মনে হতে লাগল মধ্যদেশে ভবতারিণীর মন্দির কক্ষে গদাধর বিশ্বজননীর পদতলে উপবিষ্ট হয়ে গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেছেন। বাহ্য চেতনা লুপ্ত হয়ে জননীর পদপ্রান্তে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। আর, পরম মমতাময়ী মা তাঁর প্রিয় সন্তানের মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে সকৌতুকে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন। আর ঠাকুর আদর খেতে খেতে মায়ের হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম ভাঙলে শিশু যেমন মা'কে কোথাও দেখতে না পেয়ে মা-মা করে অস্থির হয় তেমনি ঘোর কাটলে ঠাকুরও মা মা করে ডেকে আকুল হচ্ছেন। মা অন্তরীক্ষে থেকে মৃন্ময়ী হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছেন। ঠাকুরকে নিয়ে রোজই তার মহাকৌতুক। মা ও ছেলের মান অভিমানের খেলা।

মার্গারেট ঠাকুরের কথা ভাবনায় এতই তন্ময় হয়েছিল যে, জনতার ঠেলাঠেলি এবং কৌতুকের প্রতি তার মন ছিল না। সে কল্পনায় দেখছিল ম্যাঞ্চেস্টারে সেই ছোট্ট বাড়িতে মা ইসাবেল নোবল নিজের ঘরকন্নার কাজ করছে আর মার্গারেট নিজের মনে তার সঙ্গে বকর বকর করে যাচ্ছে। কতরকমের কথা। তার কোনো কথাই শুনছিল না মা, নিজের কাজেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত। তবু ঐভাবে মার সঙ্গে একা একা কথা বলতে তার ক্লান্তি লাগছিল না। কিন্তু একবারও হাঁ-হুঁ না করার জন্য হঠাৎই মায়ের ওপর রাগ ও অভিমান হল খুব। গলার স্বরটা হঠাৎ মার্গারেটের ভারি হয়ে যায়। গদ গদ হয়ে বলল: তোমার সঙ্গে আড়ি। আর কথা বলব না। মুখ গোঁজ করে বসে থাকত ঘরের এক কোণে। যেই মাকে খেতে দেখত অমনি সব অভিমান ত্যাগ করে গুটি গুটি মা'র ডিস থেকে খাবার তুলে নিজের মুখে দিত। পরক্ষণে মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের হাতে তাকেও খাইয়ে দিত। অমনি মা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে ডুবিয়ে দিত। রামকৃষ্ণ ভবতারিণীকে তেমনি এক জীবন্ত মা করে তুলেছিল। মার সঙ্গে অজস্র কথা বলে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু ভবতারিণী যখন তাঁর একটা কথারও উত্তর দিচ্ছেন না, তখন রাগে অভিমানে মা'কে গালমন্দ করে ঝগড়া করছেন। আবার, প্রসাদের থালা থেকে মা'র মুখে খাবার দিচ্ছেন, মা খাচ্ছে না বলে লোভী ছেলের মত নিজেই তা খেয়ে ফেলছেন। ঠাকুরের সঙ্গে মা ও সন্তানের এমন অভূতপূর্ব জীবন্ত

সম্পর্ক আর কোনো ধর্মের সাধকরা জীবন্ত ও বাস্তব করে তুলতে পারেনি। রামকৃষ্ণের সাধনার সেই অপূর্ব লীলাস্থলে খৃস্টান বলে তার প্রবেশাধিকার নেই। মার্গারেটের চোখ ফেটে জল এল। অথচ, কত কৌতূহল ছিল ঠাকুরের সাধনক্ষেত্র দেখার।

আশ্চর্য, ঠাকুরের নিজের কোনো সংকীর্ণতা ছিল না। খোলা মনের উদার এই মহান মানুষটির নিজের কোনো ভেদজ্ঞান ছিল না। সকলকে বুকে টেনে নিয়েছেন। তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় পাপী-অধম বলে কেউ ছিল না। সকলেই মহামায়ার সন্তান। মায়ের কাছে সন্তানের কোনো জাত নেই। তাই তিনি জাত-ধর্ম মানতেন না। সব ধর্মে সত্য আছে। সব পথই একজায়গায় গিয়ে মিশেছে। যে পথেই যাও না কেন, তার কাছে ঠিক পৌঁছবে। তাই ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য বলেছেন শিবজ্ঞানে জীব সেবা করা। সব জীবের মধ্যে তিনি আছেন। এই মহাজ্ঞান তো ঠাকুর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। মায়ের সেই কোমলকান্ত বরাভয় মূর্তি দর্শন করতে না পারার জন্য মার্গারেটের বুকটা ব্যথায় টনটন করে। এতবড় একটা শাস্তির বোঝা বহন করে মন্দিরের বহির্দেশ দিয়ে যেতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সে হাঁটছিল না, কেউ ভিড়ের মধ্যে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বুকের মধ্যে চাপা কান্না নিয়ে সে হাঁটতে লাগল। রাস্তার বাঁকে রামকৃষ্ণের বাসভবনটিকে ডাইনে রেখে তারা অধ্যাত্ম সাধনায় পীঠস্থান পঞ্চবটীর দিকে গেল।

পঞ্চবটীর বেদি গঙ্গাতীরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটি নিরালা সিদ্ধিলাভের পুণ্যভূমি। ছোট্ট, অনাড়ম্বর। পঞ্চবটের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের রূপালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে পঞ্চবটীর বেদির ওপর। মনে হচ্ছিল : বেদি থেকেই জ্যোতিপুঞ্জ ঠিকরে বেরোচ্ছে।

মার্গারেট তন্ময় হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, কী নিশ্চিত নীরবতায় মগ্ন হয়ে আছে পঞ্চবটীর চারপাশ। এদিকটা বড় লোকজন আসে না। উৎসবের কোলাহলও এখনকার স্তব্ধতায় খুব একটা ব্যাঘাত ঘটায় না। মার্গারেট মনে মনে স্থান নির্বাচনের জন্য তাঁকে তারিফ করলেন। কারণ তিনি শুধু মহাযোগী অধ্যাত্মবাদী, দার্শনিক, দুরূহ বিশ্বসত্তার সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ছিলেন না। সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি একজন কবি, মহাকবি ছিলেন। কবি না হলে কি এমন প্রকৃতিময় পরিবেশে সাধনার জন্য বেছে নিতে পারতেন? মহাশিল্পী মহাসাধক হয়ে ধ্যানের রাজ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

মার্গারেটের আশ্চর্য লাগল, এই মহাপ্রাজ্ঞ মানুষটি কোনো শাস্ত্র পাঠ করেননি। কিন্তু সব শাস্ত্র গুলে খেয়েছেন। কোনো কিছুই অবিদিত ছিল না তাঁর। জীবনের কত কঠিন, জটিল সমস্যার কত সহজ প্রাণবন্ত ভাষায় সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারতেন। তাঁর কথাগুলো মনের গভীরে দাগ রেখে যেত। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সারা ভারত থেকে ছুটে আসত

বড় বড় সাধকেরা। বিস্ময়ের কথা, এই দক্ষিণেশ্বরে বসেই সারা ভারতের মানুষকে একাত্মতার নিবিড় বন্ধনে পরমাত্মীয় করে গড়ে তুলেছেন তিনি। দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠল সব মহাসন্ন্যাসীর পরম প্রিয় ও চিরন্তন অধ্যাত্ম সাধনার মহাক্ষেত্র। তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন মানুষের জন্য, মানবিকতার জন্য, বিশ্বের সবাইকার জন্য ভারতের আত্মাকে চিরঞ্জয়ী করে রাখতে। তাই বোধ হয় তাঁর হয়ে মন্ত্রশিষ্য নরেন প্রব্রজ্যা নিয়ে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছে। রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মদর্শন, সেবার আদর্শ চিরঞ্জয়ী করে রাখলেন ভারতবাসীর মনে, বিশ্বমানবের মনে। সারা ভারত ঘুরে ঘুরে শিষ্যবর স্বামীজি প্রচার করেছেন তাঁর গুরুর জীবনদর্শনের বাণী। ভারতের চিরন্তনী অধ্যাত্ম সাধনার ধারায় এনে দিলেন তিনি আরেক নতুন প্রাণাবেগ।

মিস মুলার এবং মার্গারেট বেশ কিছুক্ষণ একা একা ঘুরে জায়গাটা দেখতে লাগল। যতদূর চোখ যায় আম, জাম, কাঁঠাল, কলা গাছের বাগান, দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ফসলের খেত আর তার পাশ দিয়ে টলটল করে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা নদী। মাথার ওপর দিয়ে টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। কখনও এক পাখি অন্য পাখিকে ডেকে, চমকে দিয়ে দ্রুত অতিক্রম করে যায় তাকে। বাতাসে আনন্দক্ষরণ হতে থাকে। আধ্যাত্মিক শ্রীতে সব কিছু আশ্চর্য সুন্দর দেখায়।

একসময় রোদের তাপ গায়ে মেখে বসন্তের ঠাণ্ডা সকালটা হারিয়ে যায়। রোদ চড়ে, বেলা বাড়ে, দ্বিপ্রহর হয়। সব কিছুর মধ্যে অনড় দাঁড়িয়ে তারা এসব দেখছিল। কেমন একটা থমথমে গম্ভীর ভাব মার্গারেটকে এক অন্য মানবীতে রূপান্তরিত করল।

পঞ্চবটীর পাশে দু'জন যাযাবর সন্ন্যাসী জায়গা নিল। কম্বলের ঝাপটা দিয়ে ধুলো আর শুকনো পাতা উড়িয়ে জায়গাটা বসবাসের যোগ্য করে তুলল। ত্রিশূল আর কাপড়ের দুটো ঝোলা বটগাছের গোড়ায় রেখে ওরা দু'খানা আসন বিছিয়ে বসল। কৃষ্ণবর্ণ সাধুদ্বয়ের কাপড়ের গেরুয়া রঙ ফিকে হয়ে গেছে। গা ভর্তি লোম, মুখভরা দাড়ি, চুলও বড় এলোমেলো। সব মিলিয়ে ওদের দেখতে লাগছিল বনমানুষের মত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে ওরা একেবারে প্রাকৃত হয়ে গেছিল। নদীর ধারে বাঁধানো বেদিতে বসে মার্গারেট দলছুট অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ দুটিকে নিরীক্ষণ করছিল।

সাধু দেখে দু'জন ধোপদুরস্ত মধ্যবয়সী লোক ওদের দিকে এগিয়ে এল। উৎসুক চোখে ওরা সাধু দেখতে লাগল। মার্গারেটও কৌতূহলী হয়ে ওদের কাছাকাছি দাঁড়াল। একজন লোক সাহস করে জিগ্যেস করল : আচ্ছা, সাধুবাবা, একটা প্রশ্ন করব।

সাধুদ্বয় বেশ উল্লসিত হয়ে বলল : করবে বৈকি বাবা।

আচ্ছা, তোমরা তো বহু তীর্থ করে বেড়াও। তীর্থে কি দেবদর্শন মেলে?

সাধু সহাস্যে বলল : তাজ্জব প্রশ্ন। বহুৎ বড়িয়া বাত্ হায়।

অন্য সাধু বলল : দেবদর্শন না হলেও সমদর্শন মেলে। সাম্যভাব আসে। অহঙ্কারের মাত্রা কাটে। মায়া-বন্ধন শিথিল হয় বৈকি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন : আচ্ছা গঙ্গায় স্নান করলেই কী সব পাপ ধুয়ে যায়?

সাধু বলল : পুণ্য অর্জন এত সোজা হলে সব পাপী-তাপীরা গঙ্গায় এসে একটা করে ডুব দিত আর পুণ্য অর্জন করে ফিবে যেত। মানুষের সংসারে তাহলে এত পাপ-তাপ থাকত না।

অন্য সাধু বলল : স্নান করলে গায়ের ময়লা কাটে, কিন্তু মনের ময়লা যায় না। একটা দোহা বলি :

আপ আপকো খোয়া নঁহী
মন মৈলে কো ধোয়া নঁহী
গয়া নাহে তো ক্যায়া হুয়া?
করণী করে বদ কাম কি
নজর রাখে হারাম কি
দ্বার্‌কা গয়ে তো ক্যায়া হুয়া?

- অর্থাৎ, যে নিজেকে জানেনি, নিজের মনের ময়লা ধুয়ে মুছে ফেলেনি, গয়াধামে গিয়ে সে যদি স্নান করেই এল তাতেই বা এমন কি হলো? যে শুধু বদ কাজ করে আর হারামের দিকে সর্বদা যার চোখ, সে যদি দ্বারকায় তীর্থদর্শনে যায় তা-হলেই বা এমন কি এসে যায়?

মার্গারেট অবাক হয়ে যায় গেঁয়ো কবির গেঁয়ো কথা, কিন্তু কী গভীর তার মর্মার্থ! সত্যিই তো শত দান-দক্ষিণা, তীর্থভ্রমণে কোনো ফল নেই। যদি না মনের অনুভূতিতে রূপান্তর ঘটে। মার্গারেট হঠাৎ কেমন হয়ে যায়।

মিস মুলার মার্গারেটের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। ওর বুকে যে একটা গভীরভাব পাথরের মত চেপে আছে সেটা বুঝেই মুলার স্নেহময় হাতখানা তার গায়ে রাখল। ভারাক্রান্ত গলায় নিজের মনে বলল : উৎসবে, মন্দির প্রাঙ্গণে ছত্রিশ জাতির ভিড়। অথচ কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। সকলের সঙ্গে সকলে আছে। সর্বত্র একটা সাম্যভাব।

নীল সাগরের মত দুটি নীল চোখ মেলে মার্গারেট তাঁর দিকে তাকাল। বলল : এ সবই গঙ্গার মহিমা। ভারতের সাধকেরা গঙ্গাবিধৌত জনপদ ও সমভূমির ধারে ধারে পরমাত্মার সাধনপীঠ গড়ে তুলেছেন। মন্দির মহিমা রচনা করেছেন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে সন্ধান করেছেন অতিপ্রাকৃতকে। এখানে এলে কী ফল লাভ হল জানি না। শুধু এটুকুই জেনেছি, প্রকৃতির উন্মুক্ত পটে রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির মহিমা অনুভব না করলে দক্ষিণেশ্বর দর্শন পূর্ণ হয় না।

মিস মুলার শশব্যস্ত হয়ে বললেন : মার্গারেট, বড় দেরি করে ফেললাম এখানে। এবার যেতে হবে।

এমন একটা সুন্দর জায়গা ছেড়ে যেতে পা উঠছিল না মার্গারেটের। তবু যেতে হবে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল : যাওয়ার আগে একবার শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বাসগৃহ দর্শন করব। তাঁর পাদপদ্মে আমার শ্রদ্ধার ভক্তির অঞ্জলি দিয়ে বেলুড়ে ফিরব।

মিস মুলার বলল : দ্যাখ এই নিয়ে আমি তিনবার ভারতে এলাম। এখানকার ধর্মের গোঁড়ামি, সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আমি খুব ভাল করে জানি। কাজ নেই ঠাকুরের বাসগৃহ দেখার। মনে মনে শ্রদ্ধা ভক্তির পূজাঞ্জলি নিবেদন করলেই হবে। ঐ পূজাঞ্জলি তাঁর পায়ে পুজোর অর্ঘ্য হয়ে পৌঁছবে।

মার্গারেট অসহায়ের মত বলল : জ্যান্ত দেবতার প্রতিকৃতি, পদচিহ্ন এবং তাঁর বাসগৃহ দেখার এতবড় সৌভাগ্য হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেব? না, কিছুতেই না। ঠাকুর আমাকে টানছেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

ওরা দু'জন হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটছিল। দু'একজন করে কৌতূহলী লোক তাদের সঙ্গে চলেছিল। লোভীর মত দেখছিল তারা। দু'চোখের চাহনিতে তাদের অব্যক্ত জিজ্ঞাসা। কেউ কারো ভাষা বোঝে না বলে তাদের সঙ্গে আলাপটা মার্গারেট কিছুতে জমাতে পারল না। সদ্যশেখা ভাঙা বাংলায় ধীরে ধীরে বলল : ঠাকুরের গরে আমাকে ডুকিতে দিবে?

লোকগুলো অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে সোল্লাসে একসঙ্গে রামকৃষ্ণের ঘর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিগলিত খুশি নিয়ে তাদের সঙ্গেই আম জনতার দল মজা করতে করতে চলল। বিদেশিনীদ্বয় যে ঠাকুরকে চেনে জানে এবং তাঁর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি আছে জেনে তাদের আনন্দ, গর্ব এবং শ্রদ্ধা হয়। মনে হল, ঠাকুরের ঘর দেখে তাদের ধন্য করে দেবে। বেশ হৈ-হৈ করে মার্গারেটকে তারা রামকৃষ্ণের বাসভবনে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল।

রামকৃষ্ণের বাসভবনে সামনে এসেই গোলমালের সূত্রপাত হল। বেশ কিছু ধোপ-দুবস্ত লোক তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। মেমেরা অসহায় বোধ করে। কেউ কারো ভাষা বোঝে না বলেই কলহটা জমে উঠল। ভাঙা বাঙলায় তাদের ভালো করে বোঝাতেও পারল না। সব কথা মুখে আটকে যায়। মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

দুই বিদেশিনী যত অনুরোধ এবং কাকুতি মিনতি করে ততই ওরা উগ্র হয়ে ওঠে। মজা দেখার জন্য লোকে ভিড় করল। স্বরূপানন্দ এসে ব্যাপারটা সামলানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কার কথা কে শোনে? জনতার মধ্যে গুটি কয়েক মানুষ সাহস করে তেড়ে এল। সেই সময় কোথা থেকে রাখাল মহারাজ সেখানে এল। সে এসে না পড়লে ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারত। এই মানুষটা যে রামকৃষ্ণের মানসপুত্র অনেকেই তা জানত। তাই তাঁর উপস্থিতিতে গোটা ব্যাপারটা একটু থমকে গেল। জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রাখাল মহারাজ চিৎকার করে বলল : আরে তোমরা করছ কি? ওঁরা আমাদের অতিথি। ঠাকুরের ভক্ত শিষ্য। মূর্খেরা শাস্ত্র বোঝ না। অথচ

শাস্ত্রের ধুয়ো তুলে মানুষের ভগবানকে অপমান কবছ। ঠাকুর যে এঁদের ডেকে এনেছে তা তোমরা জান?

এধবনের অদ্ভুত তিবস্কারে জনতা থমকে গেল। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মোক্ষম জবাব দেবার জন্য কথা খুঁজছিল। বাখাল তাদেব সে সুযোগ দিল না। তার আগেই চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে শাস্ত্রবচন আওরাল : মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ।

সংস্কৃতে শ্লোকেব মাথামুণ্ডু জনতা কিছুই বুঝল না, তবু তারা একটু শান্ত এবং সংযত হল। রাখাল জানে সংস্কৃত স্তোত্রের কত সুধা। কত তার বলবতী ধারা, কী তীব্র তার বেগ, কত বড় ভয়ঙ্করকে সে আঘাত করতে পারে বজ্রের মত, আর সেই জানার অভিজ্ঞতা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত জনতাকে মুহূর্তে বশীভূত করে ফেলল।

জনতার চোখে চোখ রেখে রাখাল বলল : ভগবান তিনটি বড় বড় জিনিস আমাদের দিয়েছেন। এক, মনুষ্যজন্ম, দুই ঈশ্বরকে জানবার জন্য ব্যাকুলতা, তিন মহাপুরুষের সঙ্গ। এঁরা মহাপুরুষকে জানবাব জন্য বাকুল। এঁদের বাধা দেবার কী অধিকার আমাদের আছে? ঠাকুর বলতেন আদর্শ-ধর্ম যা মানুষকে বাঁচতে শেখায়, এবং মানুষকে পথ দেখায়।

রাখাল মহারাজার কথায় আগুনে জল পড়ার অবস্থা হল। জনতা স্তব্ধ। তাদের উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত। রাখাল জনতার মুখ নিবীক্ষণ করে ঠাকুরের এক একটা কথা বসাতে লাগল। বলল : ঠাকুরের স্বপ্নে দেখা সাদা সাদা মানুষের দেশ থেকে এই মেয়েরা এসেছেন। এঁরা কেউ অচ্ছুৎ নয়। ঠাকুরই ওখান থেকে ওঁদের ডেকে এনেছেন। ওঁরা এসেছেন ঠাকুরের কাজ করতে। ঠাকুরের ভক্ত ওঁরা। তোমরা যেমন ঠাকুরের কাছে আদরেব, ওরা তেমনি সমাদরের পাত্রী। তোমরা যেমন ভক্তিতে ভালোবাসায় এ কক্ষে প্রবেশ কর, ওঁদেরও তেমনি প্রবেশাধিকার আছে এখানে। ঠাকুর ওঁদের হৃদয়ের মধ্যে আছেন, ওঁদের ভালোবাসার মধ্যে আছেন। আমরা সবাই ঠাকুরের ভক্ত। ভবতারিণীর সন্তান। যদি ঠাকুরকে ভালোবাসতে চাও, তাঁর ভক্ত হতে চাও তা-হলে তোমার সংকীর্ণতার পুঁটুলিটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে ঘরে ঢোক, অন্যদেরও ঢুকতে দাও।

রাখাল মহারাজের কথায় কাজ হল। বিনাতর্কেই তারা দুয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। মার্গারেট আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, এটা রাখাল মহারাজের শাস্ত্রবচন উদ্ধৃতির ফল, না জনতার অন্তরে ঠাকুরের প্রতি যে অসীম, ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা আছে তারই ফলশ্রুতি। না, ঠাকুরের মাহাত্ম্য। ঠাকুরই বাখাল মহারাজকে পাঠিয়েছেন জনতা বশীকরণের মন্ত্র দিয়ে। নইলে জনতা ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়।

মার্গারেটের হাত ধবে মিস মুলারও সন্তর্পণে কক্ষে পা রাখল। কক্ষের ভিতর সর্বত্র সযত্ন হস্তের পরিচর্যার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি যেভাবে তিনি রেখে গেছেন সেইভাবেই আছে। বিছানাটি তুষারশুভ্র সাদা চাদরে মোড়া। শয্যার মধ্যস্থলে একটি ঠাকুরেব প্রতিকৃতি। সুবাসিত চন্দন ধূপেব সৌরভে ঘরটা সুগন্ধযুক্ত

হয়ে আছে। মার্গারেট অবাক হয়ে দেখল, দেয়ালে টাঙানো দেবদেবীর চিত্রের মধ্যে অন্যতম চিত্র মেরি ম্যাজডলেনের। নির্জন, পরিত্যক্ত স্থানে ক্রুশবিদ্ধ ভগবানের পদতলে সে প্রার্থনারত। মার্গারেটের হৃদয় মন জুড়িয়ে গেল। সুন্দরের এক পরম অনুভূতি হল। মনে হল, সে মন্দিরে প্রবেশ করেছে।

ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে গড় হয়ে প্রণাম করল। অনেকক্ষণ ধরে সে প্রণাম করল। নিজের অন্তরের সব শ্রদ্ধাটুকু উজাড় করে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে তবে সে ধীরে ধীরে মাথা তুলল। দ্বারপ্রান্তে উৎসুক জনতার কৌতূহলী চোখগুলি তার ওপর স্থির। জনতা আশ্চর্য হয়ে দেখল কী স্নিগ্ধ, শান্ত, স্বপ্নালু ওর আঁখি দুটো। এক অপরূপ অনুভূতিতে অনুপম হয়ে উঠেছে তার মুখখানি। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা তদগত প্রশান্তির ভাব। যেন এমন একটা কিছু পেয়ে গেছে যার পরে আর কোনো উদ্বেগ নেই তারা হারানোর।

বেলুড়ের ঘাটে পৌঁছতে মার্গারেটের বেশ বিলম্ব হল। কিন্তু সেজন্য তার কোনো অনুশোচনা ছিল না। কিংবা সত্যমিথ্যে মেশানো কতগুলো কৈফিয়ত মনের মধ্যে রচনা করল না। কারণ ওসব ভাবার মনই ছিল না তখন। বরং যাঁর নামে উৎসব অনুষ্ঠান তাঁর সাধনক্ষেত্র দর্শনের পরিতৃপ্তির সুখে মন ভরপুর। সর্বক্ষণ তাঁর ভাবনাই মনকে ছেয়ে ছিল। ফুলের সুবাসের মত সমস্ত চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল।

মার্গারেটের বিলম্ব স্বামীজিকে চঞ্চল করেছিল। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে সর্বক্ষণ তার পথের দিকে চেয়ে রইলেন। এ হেন উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতায় তিনি একটু অবাক হন। নিজেকেই প্রশ্ন করেন, মার্গারেট তো আর ছেলেমানুষ নয়, সে একাও নেই, তার সঙ্গে মিস মুলার ও স্বরূপানন্দ আছে। তাহলে তাকে নিয়ে এত ভাবার কী আছে? তিনি সন্ন্যাসী মানুষ। কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের জন্য তাঁর এরূপ ব্যাকুলতা শোভা পায় মা। বিশেষ করে তিনি একজন মহিলা! উৎসবে নিমন্ত্রিত অন্য কোনো মহিলার জন্য তাঁর কোনো প্রতীক্ষা নেই। কেবল মার্গারেটের জন্যই তাঁর যত ব্যাকুলতা। সন্ন্যাসীর এ ধরনের হৃদয় দৌর্বল্য শোভা পায় না। নিজেও সে কথা জানেন। তবু মন থাকলেই তার নিজস্ব কিছু দুর্বলতা থাকে। তার ওপর কোনো নিষেধ, শাসন চলে না। চেষ্টা করেও বাগ মানাতে পারছেন না কিছুতে। সব কাজের মধ্যে থেকেও অন্যমনস্ক। ভেতরটা কার জন্য আকুল হয়ে আছে যেন।

বেশ অনুভব করতে পারছেন, তাঁর সন্ধানী চোখ দুটো মার্গারেটকেই খুঁজছে। তার বিলম্ব যত বাড়ছে মনের মধ্যে ততই নানারকম কু-গাইছিল। নদীপথ বলেই ভাবনা হয়। তুফানের কোনো আভাস নেই, তবু দুঃসহ একটা ভয় ও উৎকণ্ঠায় তাঁর ভেতর টনটন করছিল। একজন মানুষকে শুধু চোখের দেখা দেখার জন্য বিধাতা মানুষের প্রাণে এত আকুলতা দিয়েছেন? ঈশ্বরের জন্য যেমন হৃদয় আকুল হয়, তেমনি একজন মানুষের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় তাঁর ভেতরটা কাতর হয়। এই

আকুলতার নাম কি? প্রশ্নটা স্বামীজি নিজেকেই করে চমকালেন। তিনি সন্ন্যাসী। এসব কৌতূহল তাঁকে মানায় না। তবু বৈদান্তিক মনটি এক বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হয়ে মনের মধ্যে তার স্বরূপ আবিষ্কার করল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নিরুচ্চারে বললেন : এর নাম প্রেম। এই প্রেমের স্রষ্টা ঈশ্বর। সব প্রেমই ঈশ্বরের পূজা। প্রেমের কবির ভাষায় - প্রিয় জনে যাহা দিতে পারি তাই দিই দেবতারে, দেবতারে যাহা দিতে পারি তাই দিই প্রিয়জনে।

সুন্দর ভগবান তাঁর সুন্দর সৃষ্টির সৌন্দর্য রস পান করছেন প্রেমের মধ্য দিয়ে। "যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি তাহারি অভিসারে।" উপনিষদেও আছে অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনিও একা হয়ে একা থাকতে চাইলেন না। একা থাকলে নিজেকে জানা যায় না, উপলব্ধি করা হয় না। কারণ রস পান না বলে, আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না বলে 'স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ—তিনি দ্বিতীয় সত্তাকে ইচ্ছে করলেন। নিজেকে দুই করলেন। তখন রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ দিয়ে তৈরি হল এক নতুন ভুবন। আনন্দ রূপমৃতং যদ্ বিভাতি। রসো বৈ সঃ- তিনি রসিক, রসলোভী, রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। রস তো আর একা অনুভব করা যায় না। তার জন্য চাই আরো একজন। দুয়ের জানাজানিতে পরিচয়, প্রীতি—এ না হলে রসের ধারা বইবে কি করে? কবি বলেছেন, আপনারে তুমি রচিছ মধুররসে, আমাব মাঝারে নিজেকে করিয়া দান। ঠাকুরও সারদা মায়ের মধ্য দিয়ে আরাধ্যা দেবী মহামায়া ভবতারিনীকে পূজো করেছেন। জীবজ্ঞানে যে শিব পূজা করা হয় সেখানে উপাসকের মানবপ্রেম পুজোর ফুল হয়ে উপাসিতের পায়ে গিয়ে পৌঁছয়।

কিন্তু এসব ভাবনার সঙ্গে মার্গারেটের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক ছাড়া কি চিন্তাভাবনা হয়? একটা সম্পর্ক কোথাও আছে। হঠাৎই মনে হ'ল, মার্গারেটের জন্য তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষা না থাকলে কোথায় পেতেন এ উপলব্ধি। কার্যত মার্গারেটেই এই উপলব্ধির স্রষ্টা। বোধ হয় তার জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞান। এই গভীর সত্যতা জানানোর জন্যই কি তাঁর ধ্যানের ঠাকুর রামকৃষ্ণ মার্গারেটকে নিয়ে এক নতুন খেলা খেলছেন তাঁর সঙ্গে। ঠাকুরের স্বপ্নে দেখা সাদা সাদা মানুষের দেশের মেয়ের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্যকে, বুকের নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করাটা হয়তো ঠাকুরের সহ্য হল না। তাই হয়তো তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে মার্গারেট আছে তাঁর মর্মের গভীরে। যেমন রাতের সব তারা থাকে দিনের গভীরে তেমনি মনের অভ্যন্তরে মার্গারেটের এক দীর্ঘ ছায়া টের পান। মনের মধ্যে সে আছে, ভীষণভাবে আছে। সেজন্যই বড় ভয়ে ভয়ে থাকেন। মানুষের মন তো। পাছে দুর্বল হয়, তাই দূরে দূরে রাখেন নিজেকে।

বেলুড়ে মার্গারেটের বিলম্বে আসাটা তাঁর কাছে একটা আশ্চর্য ঘটনা হয়ে উঠতে পারে কখনও, মনে হয়নি কোনোদিন। গুরুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে মনের মধ্যে এক অন্য মনকে আবিষ্কার করলেন বিবেকানন্দ। মার্গারেট তাঁর সমস্ত ভাবনাকে আচ্ছন্ন

করে আছে। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেও পারছে না তাঁর দুই চোখে ভেসে ওঠে মার্গারেটের মুখ, তার বড় বড় নীলাভ দুই চোখ, একঝাঁকড়া সোনালী চুল, খাপখোলা তলোয়ারের মত দীর্ঘ ধারালো তনুরেখা। পশ্চিম থেকে এসে এই মেয়েটা হঠাৎ তাঁর এতদিনের জানাটাকেই বদলে দিল। এই প্রথম প্রশ্ন জাগল, মানুষ হয়ে জন্মেছি সে কি শুধু ঈশ্বর পাওয়া আর ঈশ্বর হওয়ার জন্য। না, আরো কিছু অনুভব করার জন্য! সে বোধ এত প্রগাঢ়, যে হাত দিয়ে ধরা যায়, মন দিনে ছোঁয়া যায়, কান দিয়ে শোনা যায় তার অব্যক্ত মর্মরধ্বনি। এরকম একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে বিভোর হয়ে কতক্ষণ যে কাটল নিজেও জানেন না।

পূর্ণচন্দ্র দাঁ-র ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশের বহু আগে থেকেই জনতার কোলাহল, মৃদঙ্গ, কর্তাল এবং মুখরিত সঙ্গীতের ধ্বনি শুনতে পচ্ছিল। মার্গারেট চোখ দুটো সেই বিস্তৃত দেবভূমির বিশাল প্রান্তরের দিকে ছড়িয়ে হাঁটছিল। সজ্জিত উৎসব মণ্ডপ পার হয়ে যেখানে বিবেকানন্দ ছিলেন সেখানে এক দীন অনুগ্রহ প্রার্থীর মত সসঙ্কোচে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখামাত্র বিবেকানন্দের দুটি চোখ যেন হেসে উঠল। দ্রুততর হয়ে উঠল তাঁর হৃদস্পন্দনের গতি। বুকের ভেতর তাঁর সাগরের কলোচ্ছ্বাস। মনে হল, মনের ঘরে ঘরে কে যেন দীপ জ্বালিয়ে দিল। পাওয়ার ঘর ভরে উঠলে যেমন একটা মানুষকে ভীষণ প্রসন্ন আর সুখী মনে হয়, বিবেকানন্দকে সেরকম আনন্দিত দেখাল। এক অভূতপূর্ব প্রফুল্লতায় জ্বলজ্বল করছিল তাঁর মুখশ্রী।

মার্গারেট মুগ্ধ হয়ে দেখছিল স্বামীজির দেবদূতের মত দিব্যকান্ত শ্রীময় মুখ। কলকাতায় এই মুখ তার দেখা হয়নি। অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল এ মানুষটার সঙ্গে তার জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। নইলে তাঁকে দেখলে এত মনটা ভরে ওঠে কেন? নিজেকে বড় পরিপূর্ণ এবং সার্থক মনে হয়। তিনি ছাড়া আর সমস্তই দুঃখের। তাঁকেই মনে হয় তার আত্মা, তার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন। কেমন একটা বিভোর বিহ্বলতার ঘোর লাগল তার দুই চোখে। করমর্দনের জন্য কোমল পেলব হাতখানা স্বামীজির দিকে বাড়িয়ে দিল। সেই মুহূর্তে স্বামীজির ভেতরটা কেমন যেন হয়ে গেল। হাতখানি তার ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। তাঁর মুখে কথা ছিল না। কথা কোনো আছে কিনা সংসারে তাও তিনি ভেবে পেলেন না। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। অধরে স্ফুরিত হাসির আভা। স্বামীজির সেই স্পর্শে অনুভব করল কাকে বলে পবিত্রতা, কাকে বলে মহত্ত্ব। তাঁর মুঠোর মধ্যে হাত রেখে মনে হল সে আকাশকে ছুঁলো, না সমুদ্রের হৃদয়কে জানল। পাছে সেই স্পর্শের স্বাদ চলে যায়, সেই ভয়ে তাঁর মুঠো থেকে হাতখানা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল না।

বিচিত্র এক পুলকিত অনুভূতিতে স্বামীজির মনটাও অগ্নিদগ্ধ মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। কিন্তু তার ক্ষরণ স্বামীজি ছাড়া আর কেউ জানল না। নিজের

মনে নিরুচ্চারে বলল : মার্গো, তুমি জান না, আমার মধ্যে যে চেতনার ঝঙ্কার চলছিল তা তোমার স্পর্শে থেমে গেল। আমি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলাম। এও এক আমার নতুন আবিষ্কার!

গভীর এক মমতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে স্বামীজি মার্গারেটের হাত ধরে পাশে বসার জায়গা করে দিলেন। বললেন : মার্গো, তুমি কিন্তু বড় দেরি করে এলে। আমার উৎকণ্ঠায় রেখে তুমি কি খুব সুখ পাও।

মার্গারেট একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। যেন অপরাধ রাখার জায়গা নেই তার। অপ্রতিভভাবে বলল : দেরি হয়েছে বুঝি?

তুমি বুঝতে পারছ না!

সময়মতই নৌকো বেলুড়ে পৌঁছেছিল।

তার মানে?

একটু দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম।

দক্ষিণেশ্বর!

হ্যাঁ। দক্ষিণেশ্বর দেখার বড় সাধ হল। যাঁর পুণ্য চরণস্পর্শে দক্ষিণেশ্বরে মহামানবের তীর্থক্ষেত্র হয়েছে সেখানে আগে না গিয়ে বেলুড়ে আসি কেমন করে? যাঁকে নিয়ে এত আয়োজন এবং সমারোহ দক্ষিণেশ্বর ছাড়া কোথায় পাব তাঁকে? দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে, বাতাসে, গঙ্গার ঘাটে, ইট, কাঠের মধ্যেই তো তিনি আছেন। ভবতারিণীর মন্দির চূড়ো দূর থেকে চুম্বকের মত আমাকে টানতে লাগল। না গিয়ে পারি? চাঁদনীর ঘাটে পা রাখতে মনে হল কার নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। ফিস ফিস করে অলৌকিক গলায় কে যেন বলল : তুই সংকল্প করে এয়েছিস, তোকে কে ফেরাবে? শিশুর সারল্য এবং বিশ্বাসে ভরপুর সে কণ্ঠস্বর। আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হল, ঠাকুর আমার সঙ্গে আছেন। পঞ্চবটীর ছায়ার নিচে বসে কী আনন্দই না পেয়েছি। তারপর, হাত ধরে ঠাকুর তাঁর ঘরে পৌঁছে দিলেন আমাদের দু'জনকে। বাধা যা পেয়েছি, সমাদর পেয়েছি তার চেয়ে অনেক।

স্বামীজি স্তম্ভিত। আনন্দ ও বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত হল। বিগলিত খুশির ভাব ফুটে উঠল তাঁর হাসি হাসি সরলতা মাখানো চাঁদের মত গোল মুখে। অভিভূত গলায় বললেন: তুমি করেছ কী? যে কাজ করতে আমার সাহস হয়নি, সে কাজ কত সহজে এবং অনায়াসে তুমি করলে? তুমি তো এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছ। ঠাকুর তোমার মধ্যে কেল্টিক জেদ দেখেছেন, দেখেছেন তোমার অনুরাগ, সাহস, ভালোবাসা তোমার তপস্যা করার শক্তি। সিদ্ধ সাধিকাকে খুঁজে পেয়েছেন তোমার মধ্যে। তাই প্রীত হয়ে বরণ করেছেন নিজেব শয়নকক্ষে। মার্গো, দক্ষিণেশ্বর থেকে ভারতসেবার ছাড়পত্র নিয়ে এসেছ। এযে কত বড় জয় তুমি জান না। সবচেয়ে মজার কথা, ঠাকুর নিজের হাতে জয়পত্র লিখে দিয়েছেন তোমাকে। ঠাকুরের কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে তুমি বেলুড়ে এসেছ। কী ভালো যে লাগছে।

মার্গারেট তন্ময় হয়ে স্বামীজির কথাগুলো শুনতে শুনতে গভীর বিস্ময়ে ভাবছিল, সত্যিই কী ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়েছে? প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মনে বলল : তা-হলে আপনার সব অভিযোগ অনুযোগ ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত করুন।

স্বামীজি উৎফুল্ল হয়ে বলল : নিশ্চয়ই। আমার ঘাট হয়েছে। কিন্তু দেরি হওয়ার জন্য সত্যিই চিন্তা তো হয়।

মার্গারেট মুখ তুলে একটুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। বিবেকানন্দ ঝটিতে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : মার্গো, এঁদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই। জয়া, আই মিন্ ম্যাকলাউডকে তুমি আগে থাকতেই চেন। ওঁর সম্পর্কে বলার কিছু নেই। ওকে আমি জো বলেও ডাকি। ও ভারতকে ভালোবাসতে এবং ভালোবাসা দিতে এসেছে। বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাতে সেবামূলক কাজের জন্য প্রতিমাসে পঞ্চাশ ডলার করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর উনি হলেন আমার ধীরা মা মিসেস সারা বুল। নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলি বুলের স্ত্রী। বস্টনে থাকতে আমি ওঁর গৃহে আতিথ্য নিয়েছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে মিস মুলারের মত উনিও নিয়মিত অর্থ দান করছেন। আর, ইনি হলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, ভারতবর্ষকে ভালোবেসে উনি যোগিনী হয়েছেন। স্বদেশ, আত্মীয়-পরিজন সবাইকে ত্যাগ করে ভারতবর্ষকেই নিজের দেশ মনে করে সর্বস্ব নিবেদন করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছেন। আর মিস্ মুলারের নাম তো বেলুড়ের মঠ-মন্দিরের সঙ্গে চিরদিন লেখা থাকবে। এখানকার বাইশ বিঘা জমি ওঁর অর্থানুকূল্যেই কেনা সম্ভব হয়েছে। রামকৃষ্ণের স্বপ্নে দেখা সাদা সাদা মানুষের দেশের মানুষ না পেলে সর্বজাতি-বর্ণ, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সমন্বয়ের এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত না। বলতে বাধা নেই তোমরাই এর স্থপতি।

বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা আগন্তুক নারী-পুরুষ দর্শকের চোখ চারজন শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশিনী মহিলাদের ওপর স্থির হয়ে রইল। তারা তাদের সাজপোশাক, আদব-কায়দা দেখছিল। বিবেকানন্দ অপেক্ষা তারাই ছিল তাদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। মার্গারেট ওদের উৎসুক দৃষ্টি ও কৌতূহলের মধ্যে তাদের অন্তরের সুগভীর ভালোলাগা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা অনুরাগ এবং নিবিড় মমতাময় এক স্নেহবন্ধনকে আবিষ্কার করল। কৃতজ্ঞতার আনন্দে তার বুকখানা ভরে গেল। হাসি হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। কথাবার্তায় না হলেও তারা উভয়ে যেন পরস্পরের হৃদয়ের কথা মন দিয়ে ছুঁতে পারছিল। মনে হতে লাগল এই মানুষগুলোর সঙ্গে তার অনেককালের সম্পর্ক। ওরা তার ভাই, ভগ্নী, আত্মীয়। এদের সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা অনুভব করল। স্বামীজি এদের ভালোবাসতে বলেছেন। এই অর্ধনগ্ন দরিদ্র ভারতবাসীকে ভালোবাসা মানে তাঁকে ভালোবাসা। অমনি আলোয় ধোয়ায় এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তার হৃদয়-মন পুলকিত হল। হঠাৎই সকলকে চমকে দিয়ে সে অগণিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কোনো মহিলার অনাবৃত পিঠে হাত রাখল, কারো গালে ঠোনা দিয়ে কিংবা

মুখটা একটু টিপে ধরে আদর করল। লাজুক অপ্রতিভ এবং জড়সড় ভাবটা দূর করার জন্য মুখখানা তার দিকে তুলে ধরল। ভাঙা ভাঙা বাঙলায় বলল : আমার দিকে তাকাও। আমাকে লজ্জা করছ কেন? আমিও তোমার মতই একটি মেয়ে। স্বামীজির দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল : রাজা ওরা আমাদের ঠাকুরের মেয়ে (our woman)। মেলার সব মানুষ আমাদের ঠাকুরের লোক (our people)?

বিবেকানন্দ অবাক হয়ে দেখল মার্গারেটের সঙ্গে আম জনতার ভাব হয়ে গেছে। মেমের গা স্পর্শ করার সাহস হল ওদের। অসংকোচে ওর ত্বকের কমনীয়তা, শুভ্রতা এবং সৌন্দর্য পরখ করল। ওর পাশে দাঁড়িয়ে অনেক মেয়ে রঙের তফাত দেখল। কেউ ওর হাতের তালু দুটি গালের ওপব রাখল। মেয়েদের মুখগুলো ঝলমল করেছিল খুশিতে। কৌতুকের নিবিড়তায় ওদেব সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ-সরল হয়ে গেল। প্রাণের পরশে গলে গ্ললে পড়ছিল অন্য মেয়েদের গায়ের ওপর। ওদের কাণ্ড দেখে মার্গারেটের ভীষণ মজা লাগছিল। মৃদু মৃদু হাসছিল আর উৎফুল্ল হয়ে রাজাকে ডেকে বারংবাব বলতে লাগল : আউব পিপলের কাণ্ড দেখ। ওরা হাসছে। ওদের চোখে আমি আর খ্রীস্টান নই। আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছে না। আবার ছুঁয়ে ফেলে অপবিত্রও ভাবছে না। জাত-ধর্ম কিছু খোয়া গেছে বলে মনে করছে না। আমি ওদের লোক হয়ে গেছি। গঙ্গার পবিত্র হাওয়ার স্পর্শে ওদের মন পবিত্র হয়ে গেছে। পুরুষেরা করমর্দনের জন্য হাত বাডিয়ে দিচ্ছে। রাজা, ঠাকুবের মুক্ত মনের হাওযা লেগেছে বেলুড়ে। সর্বত্র মুক্তির স্বাদ। আমরা সবাই ভবতারিণীর সন্তান হয়ে গেছি।

বিবেকানন্দের বুকের মধ্যে খুশির স্রোত বয়ে গেল। বারবার মনে হতে লাগল, মানুষকে মুগ্ধ করার এক আশ্চর্য শক্তি আছে মার্গারেটের। সে আপন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান। কথাটা মনে হতে প্রাণের মধ্যে কেমন করে উঠল। নানা ঘটনার ঢেউ এসে লাগল হৃদয়তটে। মুহূর্তে নানা চিন্তার উদয়-অস্ত ঘটে গেল। মনটা খুব দ্রুত ইংলন্ডের দিনগুলোর পাতা খুলে বসল। মনপ্রাণ জুড়ে সেদিন মার্গারেটকেই ভীষণভাবে চেয়েছিল। এই মেয়েই পারে তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করতে। তাঁর সব অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে। মার্গারেটকেই এ জীবনে তাঁর সবচেয়ে দরকার। তাকে না পেলে সম্পূর্ণ হবে না তাঁর রামকৃষ্ণ পূজা। মুগ্ধ করার মন্ত্র নিয়ে মার্গারেট পাশ্চাত্য থেকে এসেছে। ঠাকুরেরই পছন্দ করা মেযে সে। তাই, যে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাতে তাঁর ভয় ছিল প্রাণে, ঠাকুর নিজেই সেই দক্ষিণেশ্বরে টেনে আনল তাকে নিজের জোরে। অযাচিতভাবে একজন বিধর্মী বিদেশিনীকে নিজের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে দিলেন। দুটো গালভরা কথা, শাস্ত্রীয় বুলিতে যদি জন্মার্জিত সংস্কার মানুষের ভেঙে যেত তা-হলে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত। আসলে, অন্তরীক্ষে থেকে ঠাকুরই সর্বাগ্রে গ্রহণ করে কৃপা করেছেন তাকে। ঠাকুর ওর অন্তরের মধ্যেই আছেন বলে ওর সমগ্র সত্তা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

বিবেকানন্দের ভেতরটা কবিত্বময় হয়ে উঠল। কত কথা, ছবি, কত শব্দের সুমধুর

বাণীর লালিত্য ছন্দে কল্লোলিত হল বুকের গভীরে। নাড়া খেল স্মৃতির ঘর। মহাশ্বেতার রূপ জেগে উঠল। কার লেখা কবিতা মনে নেই। কয়েকটা ছত্র মনে পড়ল। মার্গারেটের দিকে চেয়ে নিজের মনে নিরুচ্চারে আবৃত্তি করল :

স্বর্ণকমল হাতে
আসিলে যখন রাতের গগনে শুকতারা ছিল সাথে
তখন মগ্ন সবে
নিশীথস্বপন জড়িত ভুবন সুপ্তি অতলে যবে।
যুগের প্রভাত সম
চারিদিক করি উজ্জ্বল মনোরম
ধরণীর শির চুমি,
যাত্রার পথে নামিয়া হেলায় এলে বল কোন্ পথের পথিক তুমি।
কণ্ঠে ভরিয়া গান
যেন কোন্ আহ্বান-
গাহিয়া জাগালে জীবনের নব প্রাণ।
রাত হোল অবসান।
ভোরের আলোতে দিয়ে গেল কারে ডাক :
এলো সেই দিন-
সুরের জ্যোৎস্না দিয়েছ বিছায়ে বিশ্বের আঙিনায়।

মিসেস ওলি বুলের ডাকে স্বামীজির তন্ময়তার ঘোর কাটল। ওলি বুল বলল : স্বামী, তোমার এই বিদেশিনী মেয়েটি ভারি মিষ্টি স্বভাবের। ওর সান্নিধ্য বড় মধুর ; ব্যবহারটি বড় সুন্দর। দ্যাখ কত অল্পে মেলার মানুষজনদের আপন করে নিয়েছে। ওঁর সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে মানুষরা জেগে উঠেছে। এতক্ষণ কতকগুলো নিষ্প্রাণ মানুষ ছায়ার মত ঘোরাঘুরি করছিল, কিন্তু যেই মার্গারেটকে পেয়েছে অমনি ওদের চোখে মুখে প্রাণের লাবণ্য, হর্ষের তৃপ্তি ফুটে উঠল। মার্গারেট ওদের মরা প্রাণের মধ্যে নতুন প্রাণের সাড়া জাগাল। একে মেম দেখার হ্যাংলামি বলে মানুষগুলোকে ছোট করলেও করা যেতে পারে কিন্তু ঐ হ্যাংলামি তো আমাদের কাউকে দেখে হচ্ছে না। আসলে মার্গারেটের হৃদয়ের ঔদার্য, মহত্ত্ব আমাদের কারো মধ্যে নেই। প্রাণের ঐশ্বর্যে আমাদের চেয়ে ও অনেক বড় স্বামীজি; একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই।

মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হল স্বামীজির মুখমণ্ডল। স্মিত হেসে বললেন : তুমি যে আমার ধীরা মা। মায়েরাই এমন কথা বলতে পারে। হৃদয়টা তোমার ওই গঙ্গার মতই স্নেহ মমতায় ভালোবাসায় টলটল করছে। ওর সান্নিধ্যই মনোরম। ওর ছিটেফোঁটা লাগলে সেই মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। তোমার গৃহ যেমন আগাগোড়া

ভালোবাসায় মোড়া ; ওর হৃদয়খানা তেমনি এক বিশাল প্রান্তর। সবটাই খোলা। অফুরন্ত মুক্তির স্বাদে ভরা।

মিসেস সারা বুলের কণ্ঠস্বরে সহসা অনুযোগ ফুটে বেরোল। বলল : সোয়ামি, অনেকদিন আমরা এখানে আছি। তুমি কিন্তু ওকে আমাদের কাছে ঘেঁসতে দাওনি। এ তোমার ভারি অন্যায়।

সহাস্যে বিবেকানন্দ অভিযোগটা একেবারে লঘু করে দিয়ে বললেন : দ্যাখ মাদার, সব কিছুর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। সেই সময় না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই হয় না। আমার সঙ্গে তোমাদের দেখাসাক্ষাৎ হওয়া কিংবা এদেশে তোমাদের আসাটা সবই নির্দিষ্ট হয়েছিল। তুমি যে আমার আর একটা মা হবে, কিংবা ম্যাকলাউডের মত একজন মরমী বন্ধু পাব এসব ভেবে তো আমি আমেরিকায় যাইনি। তবু স্বপ্নের মত সব হয়ে গেল। পাওয়ার ঘর ভরে উঠল। তোমাদের না পেলে বেলুড়ে এই মঠ মন্দির নির্মাণ হত না। সবই বিধি নির্দিষ্ট থাকে। সেই সময়ে পৌঁছলে আপনা আপনি হয়ে যায়। এই হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মিথ্যে দেমাক করে মরি আমরা। মার্গারেটের সঙ্গে তোমাদের দেখা সাক্ষাৎটা হয়েছে নির্দিষ্ট সময় মেনে। ম্যাকলাউডের সঙ্গে তো মার্গারেটের অনেককালের সম্পর্ক, তবু তাদের দেখা সাক্ষাৎটা সঙ্গে সঙ্গেই হল না। সময়ের পথ ধরেই তা হল।

মিসেস ওলি বুল অসহায়ের মত বোকা বোকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল : তা তো ঠিকই।

বিবেকানন্দ বলল : শৈশব থেকেই মার্গারেট ভারত নামের সঙ্গে পরিচিত। নিজের অজান্তে ভারতকে ভালোবেসে ফেলেছে। তাই ভারতের নাম শোনামাত্র ও আর থাকতে পারেনি। নিজের বলতে ওর যা কিছু ছিল ত্যাগ করে ভারতবর্ষের টানেই এদেশে এসেছে। ভারতকে নিজের মত করে নেয়ার দায়িত্ব তারই। এবং ও তা আপ্রাণ করছেও। বলতে কি এদেশের জন্য ও মনপ্রাণ নিবেদন করে বসে আছে। আমার বিদেশী শিষ্য ও শিষ্যদের মধ্যে ও একেবারে আলাদা। ভীষণ ভালো মেয়ে। মনের দিক দিয়ে ও তোমাদের খুব কাছের। ওর সঙ্গে কথা বললে, ওর কাছে থাকলে কথাগুলো একটুও অনুরঞ্জিত মনে হবে না। বরং কমই মনে হবে।

কৌতুক হাস্যে ম্যাকলাউডের ভুরু কুঞ্চিত হল। বলল : মার্গারেট ভাগ্যবতী। ওর সম্পর্কে কত ভাবেন আপনি। ভীষণ ঈর্ষা হচ্ছে ওর ওপর।

মানুষের ভিড় ঠেলে যেতে যেতে বিবেকানন্দ বলল : ভাবতে হয় ম্যাকলাউড। নির্বান্ধব দেশে সব দিক থেকে ও একা। ওর পাশে দাঁড়ানোর মানুষ কোথায়? শুধু আমাকে বিশ্বাস করে আর ভরসা করে এসেছে। একটু উদ্বেগ তো থাকবেই। আমার অবহেলা উপেক্ষায় ওর মূল্যবান জীবনটা যেন ব্যর্থ না হয়। এখনও পর্যন্ত ওর নিজের কাজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। একটা বিরাট উদ্যম প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে

যাচ্ছে সেটা আমি দেখতে পারছি না। আমার সেই কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারি না। মার্গারেটকে আমার অসুবিধেগুলো যে কোথায়, কতরকম বলতে পারি না। বলেই-বা হবে কি? ও তো কিছু করতে পারবে না। অথচ একটা বিরাট জগদ্দল পাথর না নড়ানো পর্যন্ত কিছু হবে না। একথাটা গভীর করে ওর জানা নেই। আমার ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস।

বিবেকানন্দের কথায় ম্যাকলাউড বেশ অবাক হল। অভিভূত গলায় বলল : স্বামী আপনার বাইরেটা কত কঠোর, কিন্তু ভেতরটা ভারতীয় নারীর মতই নরম।

বিবেকানন্দ ওর কথায় স্মিত হাসলেন। বললেন : আমার বলার কারণ হল ওর বাসস্থানটি আমার খুব পছন্দ নয়। মিস মুলার খুব ভাল মহিলা কিন্তু বড় খিটখিটে স্বভাবের। সব সময় কর্তৃত্ব করতে ভালোবাসেন। কথায় কথায় টাকার দেমাক দেখান। এটা যাদের নেই তাদের আত্মগরিমায় লাগে। মার্গারেট মুখে কিছু বলে না, কিন্তু ওর কষ্ট এবং অসুবিধেটা কোথায় এবং কত ধরনের আমি অনুভব করতে পারি। মিস মুলারের কাছে আমার অনেক ঋণ এবং কৃতজ্ঞতা জমা হয়ে আছে। তবু মার্গারেটকে ওঁর কাছ থেকে অন্য কোথাও সরানো খুবই দরকার। কিন্তু - বলে থামলেন স্বামীজি।

জো ওর বলার ভঙ্গি শুনে মুখ টিপে হাসল। বলল : তবু, আসল কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না তো? বেশ, আমি না হয় বলছি, মার্গারেট আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে।

মিসেস বুল তৎক্ষণাৎ ওকে সমর্থন করে বলল : হাঁ, মার্গারেট আমাদের সঙ্গে থাকবে এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব কী হতে পারে?

বিবেকানন্দে চমকে তাকাল দু'জনের মুখের দিকে। মনে মনে মার্গারেটকে ভীষণভাবে বেলুড়ে এনে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কথাটা বলতে তাঁর শরম হচ্ছিল। ম্যাকলাউড (জো) তাঁর মুখ রক্ষা করার জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অভিভূত গলায় বললেন : জো, তুমি বন্ধুর কাজ করলে।

জো বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বলল : বারে, আমি আর কি করলাম? এতে আমার ভূমিকা কতটুকু? সব আপনার ঠাকুর করেছেন।

বিবেকানন্দ ওর দিকে অভিভূতের মত কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। কথা বলতে বলতে তাঁরা তিনজন পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নিচে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি যেখানে ছিল সেখানে এসে পৌঁছল। মার্গারেটকে নিবিষ্ট মনে বাঁশের একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ম্যাকলাউড দেখতে পেয়েই তার কাছে একা চলে গেল। পিছন থেকে কাঁধ স্পর্শ করল। চমকে উঠতেই বলল : মার্গো, তোমার কী হয়েছে? আমরা তোমাকে খুঁজছি। আচ্ছা তোমার ঘন নিবিড় দু'চোখের চাহনিতে ও কিসের ঘোর। মনে হচ্ছিল, তুমি যেন এই পৃথিবীতেই ছিলে না।

মার্গারেট থমথমে গলায় বলল : ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে অত্যন্ত মলিন

স্বল্পমূল্যের কাপড় পরিহিত ঐ বৃদ্ধা কে? একখানা কাপড় ছাড়া অন্য কোনো বসন ওঁর গায়ে নেই। অথচ, ওঁর মত সুখী মানুষ এই উৎসব প্রাঙ্গণে আর একজনও আছে কিনা জানা নেই।

ম্যাকলাউড বললেন : ওঁকে সবাই গোপালের মা বলে। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মধ্যে ওঁর আরাধ্য হামাগুড়ি দেওয়া নাড়ু হস্তে ক্রীড়ারত কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন। নিজেকে ঈশ্বর জননী ভেবে শিশুকৃষ্ণকে নাড়ু হাতে আহ্বান করেন। নিজেকে মায়ের ভূমিকায় ভাবার পবিত্র অনুভূতি মাতৃত্বের পবিত্রতায় মহিমান্বিত করেছে।

তাই বুঝি প্রতিকৃতির সামনে একটা নাড়ু মেলে ধরে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের মনেই বলে চলেছেন 'হাত ঘুরোলে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব।' - হাতটা যেন ঢেউয়ের দোলায় দুলছিল। দুঃখিনী জননীর মত এক বুক অভিমান নিয়ে বাল গোপালের সঙ্গে কথা বলছিল। হাতে তো দিচ্ছি সোনা তবু হাত পেতে নিচ্ছ কৈ? রাগ করে আছ কেন? আমি তো নন্দরানী; তুমি আমার নন্দদুলাল। মার ওপর রাগ করতে আছে?

মার বুঝি কষ্ট হয় না?

কথাগুলো বলছে আর হাপুস হুপুস নয়নে কাঁদছে। অন্তরের স্নেহসিন্ধু নয়নের অশ্রুবারি হয়ে অঝোরে ঝরছে। ছেলে ভুলোনোর জন্য নৃত্য করে তার সঙ্গে খেলা করতে লাগল। নেচে নেচে করতালি দিয়ে বলতে থাকল : আয়রে গোপাল বেরিয়ে আয়, আয়রে আমার কঠিন কোলে।

এই জগতে তাঁর কামনার ধন ওই গোপাল। মন উজাড় করা স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা দিয়ে ঐ প্রতিকৃতিকে ঈশ্বরত্ব দিয়েছেন। নিজেকে ঈশ্বরের জননী ভেবে ভাবে বিভোর হয়ে আছেন এসব গল্প স্বামীজিই শুনিয়েছেন তাদের।

অদ্ভুত একটা ভাবাবেশে মার্গারেট বলল : সত্যই কী অপরূপ দৃশ্য। এমন জীবন্ত মাতৃমূর্তি আমি দেখিনি। এ যেন মাতৃত্বের এক মহাকাব্য। এর প্রতি পংক্তিতে মা ও শিশু। খ্রীস্টীয় শিল্পে শিশু ও জননীর মাতৃত্বের অপরূপ শিল্পকীর্তি অনেক আছে। সেই সব শিল্পে জননীর ক্রোড়ে শিশুর নিটোল মাধুর্য থেকে আমরা তার বিগলিত মাতৃত্বের মহিমাময় সম্পদ অনুভব করতে পারি- এর থেকে বেশি কিছু পাই না। অথচ এই শ্রদ্ধেয়া জননী কত শীর্ণ, তবু কী লাবণ্যময়ী। অঙ্গে অঙ্গে স্নেহের নির্ঝর। সিস্টাইন চ্যাপেলের কোনো ম্যাডোনা মূর্তিতে পাওয়া যাবে না ঐ রমণীর ব্যাকুল আর্তি, স্নেহ ও সৌকুমার্যের মহিমাময়ী পবিত্রতা। মায়ের, কাছে সবাই চিরদিন শিশু। দেবশিশু হলেও সে তাঁর মানব শিশু গোপাল। মা তার খেলায় সঙ্গী। এ হল মাতৃত্বের মহাকাব্য।

ম্যাকলাউড বলল : এমন গভীর করে ভাবিনি আমি। তোমার অনুভূতির স্বর্গীয় আলো পড়ে আমার মনটাও বড় হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে অনুভূতির গভীরে

পৌঁছলে তবেই এ ধরনের ভাবাবেশ সৃষ্টি হয়।

তন্ময় হয়ে মার্গারেট ঠাকুরের প্রতিকৃতি দেখছিল। চিন্তার বাণী আহরণ করে এনে মার্গারেট বলল : ঠাকুরের প্রতিকৃতি যেন দুষ্টু ছেলের মত গোপালের দিকে তাকিয়ে পিট পিট করে হাসছে। ঠাকুরের কোটরগত ছোট ছোট দুটি চোখ ও ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত। কিন্তু অপরূপ দ্যুতিময়। শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত সরল নিষ্পাপ মুখে উন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের অস্ফুট হাসি বিষাদের, না প্রসন্ন কৌতুকের, না জীবন রহস্য বোঝার মহাকৌতুকে রোমাঞ্চকর! ঐ চোখ আর হাসির গবেষণা একবার আরম্ভ করলে শেষ হবে না আর।

ম্যাকলাউড বলল : গোপালের মার কাণ্ড দেখ। কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের প্রতিকৃতিকে কি বলছে কে জানে? বিবেকানন্দ ওদের বোঝানোর জন্য ইংরেজি তর্জমা করে বললেন: বাবা আমি কাঙালিনী। ননী পাই কোথায়? মার ঘরে শাক পাতা, খুদ কুঁড়ো কুড়িয়ে খাই। লক্ষ্মী বাবা এই নাড়ু নিয়ে খুশি হও। রাগ্ করে ফেলে দিও না। আমি তো তোমার মা নন্দরানী। তুমি আমার নন্দদুলাল, আমার প্রাণের গোপাল। মার ওপর রাগ করতে আছে বাবা! টোকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে কোনোরকমে পেট চালাই। এসব জেনে বুঝেও যদি মার ওপর রাগ হয় তা-হলে আমি কোথায় দাঁড়াই বলত।

বিদেশিনীরা দেখল গোপালের মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অন্তরের স্নেহধারা নয়নের অশ্রুধারা হয়ে বেরোচ্ছে। ছেলে ভুলোনোর জন্য নৃত্য আরম্ভ করল। নৃত্যের আর বিরাম নেই। নেচে নেচে বলছে আয়রে গোপাল বেরিয়ে আয়, আয়রে আমার কঠিন কোলে।

মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বিবেকানন্দ বলল : জান মার্গারেট, অঘোরমণির বয়স বাড়ে, সে বুড়ো হয়, কিন্তু ওর গোপাল আর বড় হয় না। ছোটই থেকে যায়। চিরকাল মার বুকের আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে, মা খেতে দে, খিদে পেয়েছে।

বুকের গভীর থেকে মার্গারেটের একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। মনে হল জীবনের সব প্রাপ্তিকে এক গভীর অপ্রাপ্তিতে ভরে দিয়ে তাকে বিষণ্ণ করেছে। নিজর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো মার্গারেট ওঁর খুব কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ভাঙা বাঙলায় কোনোরকমে বলল : মা, আমি টোমার মেয়ে আছি।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল। অঘোরমণি (গোপালের মা) বিদেশিনী বিধর্মী মেয়ের ছোঁয়া বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই করল না। বিস্ময়ে তার নীল সাগরের মত গভীর দুটি চোখের ভেতর ডুবে গিয়ে কাকে যেন খুঁজল। বিভোর হয়ে তাকে দেখলেন অনেকক্ষণ। অধর কোণে হাসি ফুটল। তাঁর অন্তরের তাঁর সব ভালোলাগার গভীর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হল : তুমি আমার মেয়ে!

চোখ ফেরাতেই অঘোরমণি দেখলেন বিবেকানন্দ দুষ্টু দুষ্টু চোখে তাঁর দিকে

তাকিয়ে সকৌতুকে হাসছেন। সারল্যের হাসি। অঘোরমণি মার্গারেটের চিবুকের স্পর্শ হাতে নিয়ে চুমু খেলেন। গালের টেপো দুটো টিপে ধরে আদর করে বলল : নরেনের মেম মেয়ে বুঝি।

বিদ্যুৎ চমকানোর মত চমকাল বিবেকানন্দ। অঘোরমণিও অসংকোচে মার্গারেটকে স্বীকার করে নিল। বুকেব মধ্যে টেনে নিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধল। মার্গারেটও মলিন বসন পরিহিতা প্রৌঢ়া গোপালের মাকে আঁকড়ে ধরে স্থির হয়ে রইল। তার দু'চোখ বোজা। চোখের কোণে মুক্তার মত দু'বিন্দু অশ্রু টলটল করছিল।

ছয়

মার্গারেট সম্পর্কে বিবেকানন্দের আর উদাসীন থাকা সম্ভব হল না। যতদিন যাচ্ছে মার্গারেট ততই ভাবিয়ে তুলছে তাঁকে। কিছু একটা করার ভীষণ দরকার,—এই তাগিদটা ভিতরে ভিতরে তাঁকে ভীষণ অস্থির করছিল। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল তাঁর। নিজেকে ভীষণ ব্যর্থ লাগছিল। কারণ একটা বিরাট উদ্যমের অপচয় তিনিও ভিতরে ভিতরে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই একটা দারুণ কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল। যাবে নাই বা কেন? মার্গারেট তো আর সাধারণ মেয়ে নয়। তার ভেতর আগুন আছে। সব কাজেই ঝড়ের আগে ছোটে। তাকে দাবিয়ে রাখার শক্তি কারো নেই। স্রোতোস্বিনী ঝরনার মত নিজের পথে নিজের মত করেই ধেয়ে চলে। পথের বাধা মানে না। চলার বেগে পায়ের তলায় তার নতুন নতুন রাস্তা জেগে ওঠে।

মার্গারেট কাজ করে প্রমাণ করেছে সে থামার নয়, তাকে থামানো যায় না। আসলে কিছু একটা করার সংকল্প তার মনে। সে সংকল্প অবহেলায় অসহযোগিতায় অপচয় হোক কিংবা একটা বিরাট উদ্যমের মৃত্যু হোক একথাটা তো স্বামীজি ভাবতেই পারেন না। তবু এর পাশাপাশি কিছু করতে না পারার অক্ষমতা তাঁকে ভীষণ যন্ত্রণাবিদ্ধ করে। মনের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত অনুরণিত হয় তাঁর নিজেরই কণ্ঠস্বর।

মার্গারেট, তুমি যে সংস্কারমুক্ত এতে আমি নিঃসংশয। তোমার গভীরে আছে জগৎকে টলিয়ে দেবার বীর্য। আমরা চাই উদ্দীপ্ত বাণী, দুর্ধর্ষ কর্মশক্তি। জাগো, জাগো হে বিরাট! হাঁকো, হেঁকে চলো—ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভাঙুক, অন্তরের ঠাকুর সাড়া দিন তোমার হাঁকারে। জীবনে এছাড়া আর কী করবার আছে? কোন বড় কাজ? হ্যাঁ, আমি এগিয়ে চলেছি, আর কাজ গড়ে উঠছে আমার পিছু পিছু। আমি ছক কাটি না কোনোকালে। ছক আপনি কাটা হয়ে যায়, আপনি কাজ হয়। আমি শুধু বলে চলি, জাগো জাগো।

কলকাতায় মার্গারেট তো তাঁর জীবনবাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। হতোদ্যম হয়ে কোথাও থেমে পড়েনি। মার্গারেট যে থামতে জানে না এ প্রত্যয় বিবেকানন্দের জন্মেছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রগাঢ় হচ্ছে। কাজে তার অধিকার জন্মেছে। মার্গারেটের প্রতি আর কোনো সংশয় থাকা উচিত নয় তাঁর। কোনো কাল্পনিক কৈফিয়ত খাড়া করে কিংবা কোনো অজুহাত দেখিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মানুষ যে অমৃতের পুত্র, এই বাণী এতকাল ধরে শুনিয়ে এসেছেন তাকে। এসত্যকে কর্মের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে সফল হয়েছে মার্গারেট। ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভাঙাতে সে সক্ষম হয়েছে বলে দক্ষিণেশ্বরের মানুষ তার জয় জয়কার করতে করতে ঠাকুরের শয়নকক্ষে পৌঁছে দিয়েছে। অন্তরে ঠাকুর সাড়া দিয়েছেন বলেই বাইরের কোনো বাধাই তার পথ আগলে দাঁড়ায়নি। ঠাকুরই তাকে ডেকে নিয়েছেন নিজের ঘরে। ভালোবাসার শক্তিতে মার্গারেট বাইরের মহল থেকে একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল। তাই তো অঘোরমণির মত (গোপালের মা) রক্ষণশীল হিন্দুরমণী সব সংস্কার ভুলে জাত-পাত-ধর্মের বেড়া ভেঙে কী করে যে সন্তানজ্ঞানে মার্গারেটকে বুকে টেনে নিয়ে একেবারে নিজের ঘরের মেয়ে করে নিলেন সেটাই আশ্চর্য। উভয়ের ভেতর কোনো দূরত্বই থাকল না। মার্গারেট কোন্ ধর্মের এবং কোন্ দেশের মেয়ে সে পরিচযটা পর্যন্ত গৌণ হয়ে গেল। হিন্দু সমাজের সঙ্গে মেলামেশার পথটা অঘোরমণিই প্রথম অবারিত করে দিল। মার্গারেট আব অচ্ছ্যুৎ রইল না। হিন্দু পরিবারের অন্দরমহল পর্যন্ত তার প্রবেশের পথ প্রশস্ত হল।

মাতৃত্বের মমতামাখানো সুধাসিন্ধুর পূতবারিতে শত শত লোকচক্ষুর সামনে মার্গারেটের যে অভিষেক ঠাকুরের জন্মোৎসবে গোপালের মা করলেন তার কোনো নিন্দে কিংবা সমালোচনা হল না। বরং ভালো মনে মেনে নিল সকলে। একজন নিরক্ষর রক্ষণশীল গ্রাম্যমহিলা যে অতর্কিতে এত বড় একটা সামাজিক বিপ্লব কী করে নীরবে সম্পন্ন করলেন স্বামীজি ভেবে পান না। এরকম একটা অঘটন যদিও মনে মনে ভীষণভাবে চাইতেন তবু তাঁর নিজের ক্ষমতায় তা হল না। ঠাকুরই অলক্ষ্য থেকে তাঁর মানসপ্রতিমাকে আস্তে আস্তে সযত্নে নিজের মত করে গড়ে দিচ্ছেন।

অথচ, যে কাজের জন্য মার্গারেটের ভারতে আসা, সেই নারীশিক্ষার কোনো

ব্যবস্থাই স্বামীজি করতে পারেননি। দেখতে দেখতে তার কোলকাতায় আসা দু'মাস হয়ে গেল। তবু এই সময়ের মধ্যে মেয়েদের স্কুল তৈরি এবং তাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবেশটা পর্যন্ত স্বামীজি প্রস্তুত করতে পারেননি. কিন্তু মহিলা তাঁর প্রতিশ্রুত কাজ কারার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তার প্রতি যে ভীষণ অবহেলা বরং অবিচার করা হচ্ছে এই বোধটা বিবেকানন্দকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ জ্বালা দেয়। মার্গারেট না জানলেও তিনি তো জানেন, তার স্বতঃস্ফূর্ত ভারতসেবার ইচ্ছের আন্তরিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তার সেবার ইচ্ছেটা কতটা আন্তরিক, সত্য এবং কতটা বিলাসিতা তা পরীক্ষা করার জন্যই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তাকে নিয়ে গেছেন। কিন্তু মার্গারেট সব পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করল তার ইচ্ছেতে খাদ নেই। সমস্ত উদ্যোগটা আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। কাজ করার জন্য তাই কোনো প্রতীক্ষা ছিল না তার। কারো মুখাপেক্ষীও ছিল না সে। করণীয় যা নিজেই স্থির করে নিয়েছে। ভারতকে জানাই হল তার সবচেয়ে বড় কাজ। এদেশের সামাজিক আচার, প্রথা, সংস্কার এবং বিশ্বাসের মর্মমূলে পৌঁছে অশিক্ষিত, অর্ধসভ্য মানুষগুলির আত্মাকে আবিষ্কার করছিল। একাজের দায়িত্ব বিবেকানন্দ তাকে দেননি। কিন্তু স্বামীজি বলতেন, ভারতকে ভালোবাসলেই তাঁকে ভালোবাসা হবে। মার্গারেট প্রাণ উজাড় করে ভারতকে ভালোবেসেছে, যাতে উপচার ছাপিয়ে সে পূজা উপাসিতের পায়ে গিয়ে পৌঁছয়। এটুকু বুঝবার মত হৃদয় বিবেকানন্দের ছিল। তাই তার কাজের ওপর যত আস্থা বাড়ছিল ততই ভিতরে ভিতরে আপন অক্ষমতার আত্মগ্লানিতে তিনি নিজেই কষ্ট পাচ্ছিলেন। যে মেয়ে নিজেকে এত উজাড় করে দিতে পারে তার জন্য সত্যি কিছু করতে না পারার জ্বালাধরা অনুভূতি বিবেকানন্দের অন্তরে যন্ত্রণায় দৃঢ় হয়। নিজেকেই প্রশ্ন করেন, মার্গারেটের ওপর সত্যিই কি অবিচার করা হচ্ছে? এই অভিযোগটা বিদেশী শিষ্যরাও করেছে তাঁকে।

বেলুড়ে গঙ্গার ধারে বিদেশিনী শিষ্যদের সঙ্গে জায়গাটা ঘুরে বেড়ানোর সময় মার্গারেট মরিয়া হয়ে মিসেস সারা বুল, ম্যাকলয়েড এবং মিস মুলারের সামনেই স্বামীজিকে অনুযোগ করে বলল : স্বামীজি সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাচ্ছে, অথচ কিছুই করা হল না। এভাবে চুপচাপ বসে থাকাটা আমার কাছে যে কত বড় শাস্তি এবং যন্ত্রণার তা যদি জানতেন তা হলে এত নিষ্ঠুর হতে পারতেন না। আপনি তো জানেন, আমি কাজ করতে এসেছি। যে স্কুলের জন্য আমাকে এনেছেন, সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত একটি কথাও হয়নি। কোথায় আপনার বাধা, অসুবিধেটাই বা কি সে কথাটা জানাতে আপনার সংকোচ কেন? আমি কিছু মনে করব না। না জানার জন্যই বরং অনেক কথা মনে হয়।

স্বামীজি নিরুত্তর। ম্যাকলাউড বান্ধবীর পক্ষ সমর্থন করে বলল : স্বামীজি এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়। একটা কিছু করুন।

পায়ে হাঁটা রাস্তার দু'পাশে ফণীমনসার ঝোপ। রাস্তাও ভালো নয়। চুপ করে থাকাটা ভালো দেখায় না বলে প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য কৌতুক করে স্বামীজি বললেন: উঁচু-নিচু রাস্তা, সাবধানে চল। হাই-হিলের জুতো পরে হাঁটছ। পায়ের দিকে নজর রাখ। বাগে পেলে রাস্তা কিন্তু ছাড়বে না—হিল মচ্‌কে দেবে। তখন বাবা মাকে ডাকলেও রেহাই পাবে না।

বিদেশিনী শিষ্যারা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কি কথার কি উত্তর? ম্যাকলাউড বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল : সব তাতেই আপনার মজা করা অভ্যাস। এভাবে মূল প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে যাওয়াটা মোটেই আপনার উচিত নয়। আপনি কি করছেন সেটা জানতে চাওয়া অন্যায় নয়।

স্বামীজির অধরে অনর্গল হাসি। প্রসন্ন মুখাবয়বে কৌতুকের ছটা। দিগন্তবিস্তৃত গঙ্গার ঊর্মিমুখর মুক্ত-দৃপ্ত জীবনোল্লাস মুহূর্তে একটা মহৎ উদার পবিত্র অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় আপ্লুত করল। তীব্র একটা আবেগে তাঁর অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। তাই, ম্যাকলয়েডের অভিযোগ তাঁর বুকে কোনো ঢেউ তুলল না। নির্লিপ্তভাবেই ছাড় ছাড় গলায় বললেন: দ্যাখ দ্যাখ গঙ্গায় সাদাটে ঘোলা জলে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি ভেঙে খানখান হচ্ছে। কিন্তু তাতে সূর্যের কিছুমাত্র বিরক্তি নেই। নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে এক অভিনব রঙ্গে মেতে উঠেছে। কী ভালোই না লাগছে। এখানে এত বড় আকাশ, এত আলো, এত হাওয়া, এত মুক্তির শ্বাস যে দেখে মনে হয় জীবনের আসল মানেটা কিন্তু হওয়া উচিত ছিল মুক্তি। প্রাণভরে শুষে নাও একে। চোখ মেলে চেয়ে দেখ চারদিক, সবই কি সুন্দর। প্রাণের খুশিতে ঝলমল করছে দুনিয়া। কেবল আমরাই কষ্টে আছি। বলতে বলতে স্বামীজির দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মার্গারেট মনে মনে অধৈর্য হল। স্বামীজির ওপর রাগ হল। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। স্বামীজি তার অস্বস্তি টের পাচ্ছিলেন। আড়চোখে মার্গারেটকে দেখে জরীপ করল যেন।

মিসেস সারা বুল তিরস্কার করে বলল : সোয়ামি কথা দিয়ে প্রসঙ্গ বদলানার চেষ্টা কর না। মেয়েটা তো খারাপ কিছু বলছে না।

মিস মুলার শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বলল : স্কুল করতে যা টাকা-পয়সা লাগবে আমি দেব। ওর একটা কাজের জায়গা করে দাও।

স্বামীজি হাসলেন। ইচ্ছে হল মিস মুলারের মুখের ওপর বলেন, অর্থ কোনো সমস্যা নয়। কাজে নামলে অর্থ আপনিই আসবে। খুব কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে কৌতুক করে বললেন : দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে এসেছ তোমরা। দীন-দরিদ্রের অন্তরের সম্পদকে গ্রহণ করার মত প্রশান্ত কর হৃদয়কে। ওরা বড় অভাগা, বড় অসহায়। ওরা মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ওরা চায় একটু ভালোবাসা,

একটু মমতা, একটু সেবা। ওদের সান্নিধ্যই পরমার্থকে এনে দেবে তোমাদের হাতের মুঠোয়। কেননা তোমাদের মধ্যেই তাদের পুজোর ঠাকুরকে তারা দেখতে পাবে। এই কাজটা বাইরে থেকে যত সহজ মনে হয়, ততটা সহজ নয়।

এরপরে আর কথা এগোয় না। সব কথা ফুরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বিবেকানন্দ বললেন : মার্গারেট যে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত আমাদের সমাজ পরিকাঠামোয় তার কানাকড়ির দাম নেই। এদেশের নারীশিক্ষায় ওই কেতাবী বিদ্যা কোনো কাজে লাগবে না। এদেশের মেয়েদের মনের গড়ন, প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কারের প্রতি তাদের আনুগত্য ও পরিবারকেন্দ্রিক জীবনসূত্রে তাদের মনের উৎকর্ষ বিধান করাই হবে নারী শিক্ষার প্রথম কাজ। এজন্য চাই অনুভূতিপ্রবণ সুন্দর একটা মন এবং রক্ষণশীল হিন্দুরমণীর সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। এদেশের মেয়েদের মনোযোগ সারাদিন ছড়িয়ে থাকে স্বামী, সংসার, ছেলে-পুলে, আত্মীয়স্বজন, রান্নাঘর, গোয়ালঘর এবং মন্দিরে। একাজে ভালোবাসা ও সেবার সবটুকু মাধুর্য ঢেলে দেখার শিক্ষা তারা ছোটবেলা পেয়ে থাকে। শিক্ষার সঙ্গে এই আবেগ এবং স্মৃতি যেমন যুক্ত হবে তেমনি তার আত্মমর্যাদা ব্যক্তিগত রুচি ও কল্পনা বিকাশের জন্য ভারতীয় পুরাণ, গল্প, গাথা, ইতিহাসের গল্প থেকে তার সত্যমূর্তি তুলে ধরে তাদের নারীসত্তার ঘুম ভাঙানোই হবে এদেশের নারীশিক্ষার প্রথম সোপান। শিক্ষা দেওয়ার সেই অধিকার মার্গারেট এখনও অর্জন করেনি। এদেশের নারীদের অন্দরমহলে সে ঢুকতেই পারেনি।

কথাটা মার্গারেটের অন্তরের বিশ্বাসকে আঘাতে আঘাতে একবারে গুঁড়িয়ে দিল। এ আঘাতে যে মার্গারেট ভেঙে পড়বে না বরং সংকল্পে আরো দৃঢ় হবে এটা স্বামীজি জানতেন। তাই আহত মনের ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার জন্য একটু থেমে বললেন: তবে আশার কথা মার্গারেট নিজেই নারীমনের অন্দবমহলে ঢোকার রাস্তাটা করে ফেলেছে বেলুড়ের মাটিতে। এটা তার কাজের একটা বড় কমপ্লিমেন্ট।

হঠাৎই বিবেকানন্দ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন : মার্গারেট আজ আমার সবচেয়ে খুশির দিন। আমার জয়ের দিন। তুমি আমার বিজয়পথের পতাকা। তুমি ধর এব দণ্ড, আমি উড়িয়ে দিই আকাশে এর কেতন। আর তাতে লিখে দিই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম।

মার্গারেট যে সত্যিকারের এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে ভারতে এসেছে এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের আর কোনো সংশয় নেই। বরং এবার তাঁর নিজের দায়িত্বই বেড়ে গেছে। মার্গারেট সম্পর্কে কোলকাতার শিক্ষিত সমাজের এবং অভিজাত মহলের আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করার জন্য এঁদের সঙ্গে তার একটা পরিচয় করানো প্রয়োজন মনে হল। মার্গারেটের ভাবমূর্তি তাঁদের মনের অভ্যন্তরে গেঁথে

দেওয়ার কথা মাথায় রেখে একটি সাধারণ সভা ডাকার সিদ্ধান্ত করলেন বিবেকানন্দ। মার্গারেটকে সভাস্থ করলে লোকে জানতে পারবে তার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা কী ধরনের। সে যে কত বড় আবিষ্কার তাঁর এই সত্যটা জানান দেওয়ার জন্য কোলকাতায় অভিজাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্টার থিয়েটারে সভা ডাকার সিদ্ধান্ত করলেন।

দিন যত এগিয়ে আসে ততই উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় তাঁর মনটা ভার হয়। মার্গারেট নিঃসন্দেহে বড় বাগ্মী ; তবু তাকে নিয়ে মনের ভেতর কতরকম প্রশ্ন। কেমন ভাষণ দেবে, কি বলবে, একজন বিধর্মীর কথা লোকে কতখানি শুনবে - এই সব চিন্তায় তাঁর ভেতরটা অস্থির হল। বিবেকানন্দ ভালো করেই জানেন যে, তিনি অজাতশত্রু নন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেকে পছন্দ করে না তাঁকে। এই সুযোগে মার্গারেটকে অপদস্থ করে তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে তারা। হিন্দুশাস্ত্র কিংবা হিন্দু দেব-দেবীর আলোচনায় মার্গারেটের অধিকারের বৈধতা নিয়ে কেউ যদি প্রশ্ন করে কিংবা একজন বিধর্মীর মুখে শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ শুনতে রাজি নয় বলে দর্শকদের যদি যদি কেউ প্রতিবাদ করে তাহলে কোন যুক্তি-তর্ক দিয়ে মার্গারেট সামলাবে তাঁদের? এই ভাবনাটা বিবেকানন্দর মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখল।

ফিস ফিস করে মনের গভীরে কে যেন প্রশ্ন করল - মার্গারেট ছাড়াও তো আরো তিনজন বিদেশিনী আছেন। তারাও তো মার্গারেটের মত ভারতের কাজ করতে এসেছে। কৈ; কোলকাতার এলিট পিপলদের সঙ্গে তাদের তো পরিচয় করে দিচ্ছ না? মার্গারেটের একার কথা ভাবছ কেন? ওদের থেকে মার্গারেটকে আলাদা করে দেখা ও রাখার কি কোনো দরকার আছে? প্রশ্নটা তাঁর মর্মে গিয়ে বিঁধল। একটু বিরতির পর হঠাৎ বুকের অভ্যন্তরে কে যেন তর্জনী নির্দেশ করে ভর্ৎসনা করে বলল: নিজেকেও ছলনা তোমার? মার্গারেট তোমার কে? মার্গারেট সম্পর্কে তুমি এত ভাব কেন? তার কাছে তোমার এত প্রত্যাশা কেন? অন্য বিদেশিনীদের কাছে তোমার কোনো দাবি নেই। অথচ মার্গারেট যা করতে পারে অন্যেরাও তা পারে। হয়তো বেশি পারে। কারণ তারা ধনী। নিজের দেশে ও সমাজে তারা প্রভাবশালী। তাদের সঙ্গে মার্গারেটের কোনো তুলনাই হয় না। তাহলে মার্গারেট, মার্গারেট করে তুমি অস্থির হচ্ছ কেন? তার প্রতি তোমার এই পক্ষপাতিত্বের রন্ধ্রপথ ধরে তীব্র সন্দেহের তীর যদি তোমার দিকে নিক্ষেপ করে কেউ তা-হলে তাদের দোষটা কোথায়?

একা একা নিজের মনে হেসে নিরুচ্চারে বললেন : দোষটা আমার কপালের। মনে আমার পাপ নেই। আমি সন্ন্যাসী। আমার অতীত বর্তমান বলে কিছু নেই। আমার কোনো সংসারবন্ধন নেই। তাই হারানোর কিছু নেই। মার্গারেট যেহেতু আমার ডাকে সাড়া দিতে এসেছে, সেহেতু তার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে। কিন্তু অন্য বিদেশিনীদের ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নেই। তাঁরা এসেছেন নিজের খেয়ালে। খেয়াল চরিতার্থ হয়ে গেলে ফিরে যাবেন নিজের দেশে। কিন্তু মার্গারেট ফিরে যেতে

আসেনি। সে থাকতে এসেছে। এদেশ তারও দেশ হয়ে গেছে। তাছাড়া, অন্য বিদেশিনীদের অন্তর মার্গারেটের মত ভারতের জন্য ব্যাকুল হয় না। মার্গারেট এদেশের কল্যাণের জন্য যা হতে চাইছে, তা হওয়ার ইচ্ছে ওদের কারো নেই। তাদের ভারতসেবা বিলাসিতা, আর মার্গারেটের কাছে তা আত্মোৎসর্গ। গুরুর ইচ্ছুক কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে যতক্ষণ না তাকে নিবেদিত করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি, শান্তি কিছু নেই। ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে জনসভায় মার্গারেটের অগ্নিপরীক্ষা ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মনটা নিরুদ্বিগ্ন হয় কী করে?

টানটান উত্তেজনার মধ্যে ১১ই মার্চ এসে পড়ল। স্টার থিয়েটার হল লোকে লোকারণ্য। সভাপতির আসনে মঞ্চে উপবিষ্ট বিবেকানন্দ স্বয়ং। মধ্যস্থলে মঞ্চ আলো করে বসে আছে মার্গারেট। এই অধিবেশনে মূল বক্তা সে। তার পাশে আছে মিস মুলার।

স্বামীজির দীপ্ত দুই চোখের তারা দর্শক গ্যালারিতে নিবদ্ধ। কর্মের গৌরব তৃপ্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। কোনো উদ্বেগের ছাপ নেই সেখানে। সভার কাজ শুরু হয়নি। সভাপতির আসনে বসে বিবেকানন্দ নিজের সঙ্গে কৌতুক করার জন্য নিজেকেই জিগ্যেস করলেন এখন তাঁর মনে কোন্ পালা চলেছে? জয়, না পরাজয়? এই সভাই স্থির করে দেবে মার্গারেটের ভাগ্য। তার সাফল্য ও বিজয়ের ওপরেই নির্ভর করছে পরবর্তী কার্যক্রম। কিন্তু তাই কি? মার্গারেট কাজের অধিকার নিয়ে জন্মেছে। কোন্ কাজ কি করলে সম্পন্ন হয় সহজাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে তা পূর্বাহ্নেই টের পায়। তাকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। একটু একটু করে নিঃশব্দে তার অনুকূল অবস্থা তৈরি করে নিতে জানে। সে কারো মুখাপেক্ষী নয়। দায়িত্ব নিয়ে যে নিজের কাজ নিজে করতে পারে তাকে রুখবে কে? স্বামীজি আশ্চর্য হন এক অচেনা পরিবেশে একজন বিদেশিনী, নিজের শিক্ষা, রুচি, সংস্কার ত্যাগ করে এদেশের মত করে নিজেকে নির্ভয়ে যে তিল তিল করে প্রস্তুত করে তাকে রুখবে কে? দু'মাসের মধ্যে মার্গারেট নিজেকে দ্রুত পাল্টে একেবারে এদেশের একজন হয়ে উঠল। এদেশের সাধারণ মানুষ রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে তাকে খোলা মনেই গ্রহণ করল। আর সেইদিন থেকে বিবেকানন্দকেও ভাবতে হয়েছে এ মেয়ে উপেক্ষা করে রাখার নয়। ইতিমধ্যেই লোকের মুখে সে গল্প হয়ে উঠেছে। রোজই তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাদের সঙ্গে তার এক অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মার্গারেট যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে সমাজের এলিট পিপলের নজর কেড়ে নেবে। কাজেই মার্গারেট সম্পর্কে বিবেকানন্দের এক নতুন ভাবনাচিন্তা শুরু হল।

বেলুড়ে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু রমণী অঘোরমণির প্রাণখোলা অভ্যর্থনা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শয়নকক্ষে মার্গারেটের প্রবেশাধিকার, জনতার উষ্ণ অভিনন্দন স্বামীজির চোখ খুলে দিল। মার্গারেট উপেক্ষা করার মেয়ে নয়। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে সে শক্তিমান। মার্গারেটের কার্যকলাপই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তার সম্পর্কে মনে যে ভয়-ভীতি রয়েছে সে তাঁর আতঙ্ক বিলাস। বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এক নতুন প্রত্যয় নিয়ে মার্গারেটকে দেশের গণ্যমান্য, অভিজাত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করে তোলার উদ্দেশ্যে স্টার থিয়েটার হলে একটি সভার আয়োজন করলেন। সেখানে সর্বসাধারণের সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগ করে দিলেন। মার্গারেট যে ভারত সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় এই ঘোষণা তার মুখ থেকেই লোকে শুনুক! চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে মার্গারেটকে দেখুক, জানুক এবং বিশ্বাস করুক।

জরাজীর্ণ স্টার থিয়েটার পুরুষ ভিড়ে ঠাসা। স্বামীজি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছে পিছে মার্গারেটও মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে গেল। শ্রোতাদের সম্ভ্রম উদ্রেক করার জন্য বিনম্রভঙ্গিতে সকলের সামনে হাসি হাসি মুখে করজোড় কবে দাঁড়াল। বুক উজাড় করে ভালোবাসার আবেগে তার নীল দু'চোখের কোণে অশ্রু টলটল করছিল। জনতাও উদ্বেলিত হল তার সঙ্গে। করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল। ঠিক তখনই স্টার থিয়েটার হল্ তার কাছে ইংলন্ডের পিকাডিলির রয়্যাল সোসাইটি অব পেন্টার্স ইন ওয়াটার কালার্স ভবনে পরিণত হল। মনে হল সে আর স্টার থিয়েটার হলে নেই। দেড় বছর আগের একটি ঘটনার মধ্যে সে প্রবেশ করল। ১৮৯৬ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর। স্বামীজিকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়ার সেই দিনটির একটা ছোট্ট আনন্দের বিদ্যুৎ তার শরীর-মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল। স্টার থিয়েটারের জনসমাবেশের মধ্যে সে স্বামীজি বিদায় সম্বর্ধনার জমায়েতকে প্রত্যক্ষ করল। তিলধারণের স্থান নেই কোথাও। যারা জায়গা পায়নি তারাও ফিরে যায়নি। হলঘরের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে দেখার লোভে। পিকাডিলিতে লোক সমাগমে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না।

মার্গারেটের স্পষ্ট মনে আছে সেই সভায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছাপিয়ে বেজে উঠেছিল এক অন্তরঙ্গ সুর। স্টার থিয়েটার হলেও সেই মহৎ প্রীতির সজীব সৌরভে বাতাস উতলা হয়ে উঠল। সকলের ইচ্ছে তাকে দেখা, তার কথা শোনা। সেদিন স্বামীজির ক্ষেত্রেও অনুরূপ এক ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সভায় স্বামীজিকে কারো বিদেশী মনে হয়নি। বরং, সকলেই তাঁকে আপনজন এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ ভেবেছিল। মার্গারেটেরও বারংবার মনে হল, 'হল' ভর্তি সব মানুষের সে অত্যন্ত আপনজন। নইলে, একজন বিদেশিনী, বিধর্মী সামান্যা মহিলাকে এত সমাদর করতে তারা আসবে কেন? কী আছে তার যা দিয়ে এঁদের হৃদয় জয় করতে পারে? সে যা

দিতে পারে তা হল ভালোবাসা। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সেবা ছাড়া তার দেবার ধন কিছু নেই। এইটুকু প্রাণ উজাড় করে দিয়ে খুশিতে ভরপুর করে রেখে সুধন্য করে নিজেই কৃতার্থ হয়ে যাবে। এরকম একটা মহৎ বোধে তার ভেতরটা ভরে ওঠে।

করতালি থামল। স্বামীজি বুকের কাছে বাম হাতখানি রেখে স্থির চোখে দাঁড়ালেন নিশ্চল হয়ে। এ যেন আরেক ব্যক্তিত্ব, আরেক আবির্ভাব। তাঁর পাশে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে মার্গারেট। তার দিকে তাকিয়ে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে বললেন: বন্ধুগণ, আয়ারল্যান্ড দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ইংলন্ডে আমার বক্তৃতা সভায় ওঁকে কয়েকবার দেখেছি। ভারতবর্ষের মানুষ সম্পর্কে ওঁর আগ্রহে আমি প্রীত হয়েছি। ভারতবর্ষকে জানবার ব্যাকুলতা এবং ভারতবর্ষের মানুষের একজন হয়ে ওঠার ওঁর আন্তরিক ইচ্ছাই ওঁকে এদেশে টেনে এনেছে। আমারও মনে হয়েছে ভারতের নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ওঁর ভেতর সেই সিংহিনীকে প্রত্যক্ষ করে ভারতের নারীশিক্ষার কার্যে ব্রতী হওয়ার জন্য আহ্বান করেছি। সুখের কথা, সব পিছুটান ছিন্ন করে তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের মত ইংলন্ড আমাদের জন্য আর একটি উপহার দিয়েছে মিস মার্গারেট নোবলকে। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে ইংলন্ডকন্যা অ্যানি বেসান্ত ভারতকন্যায় পরিণত হয়েছেন তেমনি অনন্ত দাবি ও প্রত্যাশা নিয়ে আমরা মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনিও আমাদের হতাশ কিংবা নিরাশ করবেন না। ওঁর সম্পর্কে এটুকু পরিচয় বোধ হয় যথেষ্ট। আজ উনি ইংলন্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং ভাবনাচিন্তার কথা বলবেন।

মার্গারেট দু'হাত জোড় করে সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করল। অমনি দর্শকেরা হর্ষধ্বনি করে মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল তাকে। তারপর মার্গারেট বক্তৃতা শুরু করল।

ভাষণের ওপর আস্তে আস্তে কথা বসাতে লাগল মার্গারেট। দীপ্ত ভাষার কোনো বিকল্প নেই। ভাষণে শত শত শব্দের রঙ যেন ঝলসে উঠল। ভাবাবেগ অজস্র ফুল কুঁড়ি হয়ে ফুটে উঠতে লাগল যেন। মুহূর্তে ভক্তের নিবেদিত পূজাঞ্জলির পুষ্পের সৌরভে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। মনে হচ্ছিল পিঠময় চুল ছড়িয়ে দিয়ে কোনো বাঙালি মেয়ে ভক্তিভরে যেন কথক ঠাকুরের মত কথকতা শোনাচ্ছিল। তার শান্ত-সৌম্য ভাবটি পটে আঁকা প্রতিমার মতই শ্রোতাদের চোখে লেগে রইল। বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের হৃদয়ের এক আশ্চর্য যোগাযোগ হয়ে গেল মুহূর্তে। মন্ত্রমুগ্ধের মত মার্গারেটের বক্তৃতা শুনতে লাগল তারা।

বক্তৃতায় স্বামীজির আদর্শ ও সংকল্পের প্রতি অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগ

উজাড় করে দিল মার্গারেট। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে উঠল। মার্গারেট তার বক্তৃতায় পুরোপুরি সমাহিত হয়ে গেল। শ্রোতাদের হৃদয় বক্তার বক্তৃতার সঙ্গে বাধা পড়ল। অল্প কিছুদিন আগে এক যাযাবর সন্ন্যাসী যখন বন্ধু-বান্ধবহীন দরিদ্র অবস্থায় পশ্চিমের এক ধনী শক্তিশালী দেশে যাচ্ছিলেন আর তাঁর বন্ধুরা তাঁর জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইছিলেন তখনই প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধন সভা হয়েছিল। ভারতের জাতীয় জীবনে এই প্রতিষ্ঠান হল বহু আন্দোলনের এক বিরাট সমন্বয়। একটি আন্দোলন হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়টির সূত্রপাত হয়েছে।

ভাষণেব মধ্যে মার্গাবেট এমন একটা মুহূর্ত সৃষ্টি করে যে তার বেশটুকু মন থেকে ফুরিয়ে যায় না। অনেকক্ষণ হৃদয়েব আবেগ ধরে রাখে। মার্গারেট বলছিল, আপনারা জানেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শোনার এবং তা ব্যবহাব করার মত লোক ইংলন্ডে না থাকলে স্বামী বিবেকানন্দ কোনো সাফল্য অর্জন করতেন না। তাঁব কথা শোনার জন্য এরকম হাজার হাজাব লোক পশ্চিমে অপেক্ষা কবে আছে। আপনাদের প্রাচ্যের জ্ঞান ইংলন্ডে নিয়ে এল এক নতুন আলো। সেই আলো পড়ে ইংলন্ডের মানুষের অন্তরটা বড় হয়ে উঠল। সংশয়ের জায়গায় এল সেবা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস। তারা তীব্রভাবে ভ্রাতৃত্বের কথা ভাবতে লাগল। এখানেও আপনাদের প্রাচ্যের জ্ঞান নিয়ে এল নিরাসক্তির আলো।

প্রত্যেক শ্রোতাই স্তব্ধ। মনের ভেতর তাদের ভালো লাগার পায়রা শয়ে শয়ে উড়তে লাগল। ভাব-ভাষা ও কণ্ঠস্বরের মত দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ ক্ষুরধার অস্ত্র আব একটিও নেই। মার্গারেটের বুকের ভেতর থেকে সাবলীলভাবে একটির পর একটি কথা উঠে আসতে লাগল। স্বামীজির বাণীই তাদের শেখাল, সমগ্র জগতের প্রতি ভালোবাসা যদি না থাকে তা-হলে বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনেব প্রতি ভালোবাসা কিংবা দেশপ্রেমও কিছু নয়। কার সেবা করছি সেটা যদি গুরুত্বহীন হয় তাহলে সে সেবার ভেতর কোনো আন্তরিকতা নেই, ব্যবহারিক জীবনেও তার কোনো মূল্য নেই। আমাদের বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে জেনেছি, আপনারা এক রক্ষণশীল জাতি, যে জাতির রয়েছে ছ' হাজার বছবের সংরক্ষণশীলতার দক্ষতা। এই রক্ষণশীলতাতেই একটা জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্ম সম্পদকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে শুধু সেবা করার জ্বলন্ত আগ্রহেই আমি ভারতবর্ষে এসেছি।

মার্গারেটের মন আলো করে দেওয়া বক্তৃতায় শ্রোতারা উৎকর্ণ ও বোবা। বক্তৃতা শুনতে শুনতে মুখখানা হাঁ হয়ে গেছিল তাঁদের। স্বামীজিও অবাক হয়ে গেছিল। মার্গারেট তাঁর মান রেখেছে। অনির্বচনীয় ভাব ও ভাষায় এক ভেলকি দেখাল সে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগে শ্রোতাদের মুগ্ধতাকে অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্যই বলল : যে জাতি দীর্ঘদিন ধরে সমগ্র জগতের জন্য শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ সযত্নে

রক্ষা করে আসছে সে অবশ্যই বীর এবং সাহসী। সে কারণেই আমি সেবা করার জ্বলন্ত অনুরাগ নিয়ে ভারতে এসেছি। ভারতের কাজ করতে এলে ভারতের সমস্যা, প্রয়োজন, ব্যর্থতা ও ত্রুটির কথাও জানতে হবে। সব কিছুই আমায় শিশুর মত শিখতে হবে। আমার পাঠ সবে শুরু হয়েছে, আপনারা আমার সহায় হোন। এ দেশের মানুষের একজন হয়ে ওঠাই আমার স্বপ্ন। এখন থেকে আমি মনে প্রাণে একজন ভারতীয়। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের মত আমিও একজন যথার্থ হিন্দু হতে পারি। আপনাদের মমতাভরা দৃষ্টিতে সমাদরের যে ছবি আজ দেখলাম তা স্মরণ করে বুকে সাহস বাঁধব আমি। বক্তৃতা শেষ করার আগে শুধু তিনটি শব্দে বলতে চাই শ্রীরামকৃষ্ণে জয়তি।

করতালি এবং সাধুবাদে মুখরিত হল সভাকক্ষ। স্বামীজি বাক্যহীন। আত্মবিস্মৃত অবস্থায় কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। আশ্চর্য লাগল, কী অপূর্ব কৌশলে মার্গারেট তাঁর কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে নিবেদন করল। মাত্র কদিন আগেই মনে মনে বলেছিলেন তাকে। মার্গো, তুমি ধর এর দণ্ড, আমি ওর বিজয়কেতনের ওপর লিখে দিই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম। মার্গারেট নিঃশব্দে সেই কাজটাই করল। অথচ তার সেই নীরব নিবেদনের ভাষা তিনি ছাড়া আর কেউ জানল না। ভক্ত যেমন দেবতার কছে নীরবে নিঃশব্দে নিজের ভক্তি নিবেদন করে মার্গারেটও তেমনিভাবে অনুরাগ শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসার শতদল দিয়ে তার ভাষণকেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের পাদ্য অর্ঘ করে দিল। সেই নীরব নিবেদন তিনি ছাড়া আর কেউ জানল না। বিস্ময়ে, গৌরবে, আনন্দে বিবেকানন্দের ভিতরটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে তা ঘটে গেল। বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎ তিনটি কথা হৃদয়ে বাঁধা পড়ল 'শ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি'।

মার্গারেটের বক্তৃতায় কেবল একজনই অখুশি হলেন। তিনি হলেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. সালজার। একজন বিদেশিনীর মুখে ভারতের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর রক্ষণশীল মন মেনে নিতে পারেনি। বারংবার মনে হল বিদেশিনীর এতবড় অনধিকারচর্চা সভাস্থ ব্যক্তিরা অনুমোদন করল কী করে? বিধর্মী মহিলা বেদান্তের কী বোঝে। কতকগুলো শোনা কথার ওপর ভাষার দেউল নির্মাণ করে ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের হৃদয় জয় করে নেওয়ার এই খেলা বন্ধ করার জন্য তাঁর ভেতরটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। ডা. সালজারের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব হল। হাততালি থামলে দর্শকের আসন থেকে উঠে চিৎকার করে বললেন : মিস নোবলের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

সভাকক্ষ হঠাৎই নিস্তব্ধ হল। মুহূর্তে সব গুঞ্জন থেমে গেল। দর্শকের কৌতূহলিত শত শত চোখ সালজারের দিকে নিবদ্ধ।

মার্গারেট তাঁর প্রশ্নের ইচ্ছে ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল। তার শান্ত, নম্র দু'চোখের চাহনিতে গভীর প্রত্যয়। একটা নির্ভয়, অবিচলিতভাব এবং তার

দৃপ্ত দুটি চোখ যেন কৌতুকে বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে ওঠে, প্রাণ প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত দুর্জয় আর অপরূপ দেখায়। বিনম্র হেসে বললেন : বেশ তো, কী জানতে চান বলুন? আমি প্রস্তুত।

ডা. সালজারের মুখে চোখে তীব্র একটা উত্তেজনার ভাব। মার্গারেটের দিক থেকে তাঁর চোখ দুটি দর্শকের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সগৌরবে দম্ভ করে বললেন : মিস্ নোবল এতক্ষণ যা বললেন তা শুধু বিভ্রান্তিই বাড়ায়। বেদান্ত দর্শনের পেছনে যত মতবাদ আছে তার মধ্যে সমস্যা সমাধানে কোন্‌টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার আভাস তাঁর বক্তৃতার ভেতর নেই। বেদান্ত শব্দটির মূল ভাবনা কি? এর সঙ্গে অন্য আর কি কি ভাবনা যুক্ত হয়েছে সে কথাও তিনি গুছিয়ে বলেননি। বেদান্ত না বুঝেই লোকের মুখে শোনা কথাগুলো জনমনোরঞ্জনকারী ভাব ও ভাষার হৃদয়গ্রাহী করে দর্শকের চিত্ত ভরে দিয়েছেন। শূন্যে তরোয়াল ঘুরিয়ে তিনি বাহ্‌বা চেয়েছেন। এর মানে বেদে তাঁর অধিকার নেই। শুধু শ্রোতাদের চমকে দেওয়ার জন্য বেদ বিলাসিতা করেছেন। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।

ডা. সালজারের এরকম অদ্ভুত প্রশ্নে দর্শক গ্যালারিতে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। একদল দর্শক খুশি হল, আর একদল ডা. সালজারের প্রশ্নের ভাষাটাকে অত্যন্ত রূঢ় বলল। এভাবে একজন বিদেশিনীকে সর্বসমক্ষে হেনস্তা করা সালজারের উচিত হয়নি বলে অনেকে মন্তব্য করল। কিছুক্ষণ ধরে দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন চলল। সবাই মার্গারেটের বক্তৃতা শোনার জন্য উৎকর্ণ হল পুনরায়।

যাকে নিয়ে সবার এত কৌতুক এবং কৌতূহল সে কিন্তু নির্বিকার। ক্ষণকালের জন্য পরস্পরের দৃষ্টিনিবদ্ধ নির্বাক মুহূর্তগুলো মহাকালের আবর্তে মহাবেগে ব্রহ্মাণ্ডে ঘূর্ণিত হতে থাকে। নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা দর্শকের কানে শঙ্খধনির মত ধ্বনিত হল : আমি পাশ কাটাবো কেন? আমার জ্ঞানই বা কতটুকু?

কথাটা শোনামাত্র দর্শক শ্রোতাদের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল। চোখে মুখে প্রাণের লাবণ্য প্রকাশ পেল। বুকের মধ্যে কথাগুলো হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দের সঙ্গে মিশে যেন ঢাকের মত বেজে উঠল। অতি ভয়ংকর তীব্রতায় শ্রোতারা শ্রবণ করল : বিশ্বাসই বেদান্ত।

মার্গারেটের কণ্ঠস্বরে প্রতিটি শব্দই শপথ বাণীর মত ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়। বেদ হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বেদের ঋষিরা সবিস্ময়ে নিরন্তর প্রশ্ন করেছেন : কোথা থেকে এজগৎ এল? কে সৃষ্টি করল মানুষ? কোথা থেকে প্রাণ এল? পাহাড় পর্বত, নদী, বন, প্রান্তর, আকাশ কার সৃষ্টি? এই জিজ্ঞাসাসূত্রেই মনের গভীরে উপলব্ধি করল জ্ঞাত ও জ্ঞেয়র অতীত একটা বিরাট শক্তি আছে। সেই মহাশক্তি থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্মে ছিল। জগৎ ব্রহ্মময়। আমি তুমি সকলে স্বয়ং ব্রহ্ম। স্বরূপ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবছি। আমি বড়, তুমি ছোট ভেবে আমরা

বিভ্রান্ত করছি নিজেকে। একমাত্র অনন্ত সত্য - তোমাকে, আমাকে, আমাদের সকলের আত্মাতে বর্তমান। এর অর্থ তুমি আমি এক। আত্মার কোনো ভেদ নেই। সবই এক সত্তা মাত্র। বেদান্ত এই আত্মার সংবাদ দেয়। এই আত্মবিজ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি ক্ষমতা যাঁর আছে বৈদান্তিক হওয়ার স্পর্ধা তাঁকেই মানায়। বৈদান্তিক বলেন, কাউকে অভাজন বলে ত্যাগ কর না, কাউকে ভয় দেখিয়ো ধর্ম কর না। বেদান্তে শয়তান নেই। কিন্তু শয়তানের চোখ তোমার ওপর। একবার হোঁচট খেয়েছ কী তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। বেদান্ত এই আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দেয়। ভারতের এই মহাসত্যই জগতকে শেখাবে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করবে। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো পড়ে তাকে আলোকিত করে তুলবে। আশা করব, সংক্ষেপে সব প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছি।

প্রশ্নোত্তরের পরে মার্গারেট উৎসুক চোখে স্বামীজির দিকে তাকিয়ে রইল। স্বামীজির ভালোলাগাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। তবে মুখেতে একটা প্রশান্তির ভাব ছিল। আঁখি তারায় ছিল কৌতুকের ছটা। মার্গারেটের ধারণা হল তার মোক্ষম জবাব রাজাকে ভীষণ খুশি করেছে।

স্বামীজির অনুরাগী দর্শকবৃন্দ মার্গারেটের সাফল্যে-উল্লাসে আত্মহারা। ঘন ঘন করতালিতে গম গম করতে লাগল হল ঘর। অজানা আবেগে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। অপরিচিত বিদেশী শ্রোতাদের সঙ্গে তার হৃদয়ে যে যোগসূত্রটা তৈরি হয়ে গেছে সমস্ত সত্তা দিয়ে সে তা অনুভব করল। মনে হল, একদিনেই সে ভারত জয় করে ফেলেছে।

সালজারের মাথা হেঁট হয়ে গেল। কলকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে তাঁকে একজন বিদেশিনীর জন্য হেনস্তা হতে হবে ভাবতে পারেননি। পরাভবের আত্মগ্লানিতে মুখখানা তাঁর কালো হয়ে গেল।

ভাষণ দেবার সময় স্বামীজি অকপটে তাঁর খুশির কথা ব্যক্ত করলেন। বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, মিস নোবল হলেন ঠাকুরের স্বপ্নে দেখা সাদা সাদা মানুষের দেশের মেয়ে। ঠাকুরের নির্বাচিত করা কন্যা। ঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে কাজ করতে এসেছে। ওকে হারায় কার সাধ্য? ওর মতো মেয়ে সত্যই দুর্লভ। বাগ্মিতায় এবং কর্মশক্তিতে ও একদিন মিসেস বেসান্তকে ছাড়িয়ে যাবে। কারণ ও কাজের মেয়ে, কাজের কোনো বাদবিচার নেই। মানুষেরও ছোট-বড় নেই তার কাছে। ওর প্রাণ অতি মহৎ বলে অকাতরে সব মানুষকে ডেকে নিতে পারে। বিধাতা ওকে আহ্বানের শক্তি দিয়েছে। ওর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কোনো লোভ নেই। মুরুব্বিয়ানা করারও কোনো বাসনা নেই। ও শুধু অকাতরে নিজেকে বিলোতে এসেছে। কারো কাছে ওর কোনো প্রত্যাশা নেই। আপনারাও একদিন এই কথাগুলো গভীর করে টের পাবেন। ওর কথা, কাজ, সততা, মহত্ত্ব দেখে আপনারাও অভিভূত হবেন। আমি তো জানি, ওর

সবটাই আন্তরিকতাতে মোড়া। মিস নোবল প্রাণ দিতে এসেছে। আগামী দিনগুলোতে এদেশের মানুষকে ভালোবাসার অনেক মূল্য তাকে দিতে হবে। আমার সৌভাগ্য তার মত দুর্লভ এক নারীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে পেরে আমিও সুখবোধ করছি।

মার্গারেট অভিভূত। দু' চোখে তার কৃতজ্ঞতা। পূজারিণীর মত বিনম্র বিহ্বলতা নামল আঁখিতারায়। মনে হল সমস্ত হলঘরটা মুহূর্তে এক অপার্থিব আলোয় ভরে গেছে। আর সেই দিকপ্লাবী আলোর সমুদ্রে এক জ্যোতির্ময় পুরুষের মত দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ। প্রেক্ষাগৃহের স্বল্পালোক পুণ্যের আলোর মত ঝরে পড়ছে তাঁর মুখের ওপর। আর তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন বহুদূরের ওপার থেকে ভেসে আসা দৈববানীর মত ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত করছিল তাকে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। গভীর ভালোবাসা ছাড়া প্রাণ উজাড় করা এমন অকপট প্রশস্তি হয় না। প্রকৃত ভালোবাসাই মানুষকে ত্যাগ করতে শেখায়। নিজের জিনিসকে সকলের করতেই তার বেশি সুখ। স্বামীজিও যেন তাঁর অন্তরের গভীর অনুরাগ, প্রীতি, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার কথা একটা একটা করে বসিয়ে বঙ্গবাসীর হৃদয় সিংহাসনে তার অভিষেক করলেন।

কৃতজ্ঞতায় ভরে যেতে লাগল মার্গারেটের অন্তঃকরণ। ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র রোমাঞ্চ নিয়ে এক অনাগত জীবনের তীব্র উন্মাদনা ভিতরে ভিতরে তাকে আকুল করে তুলল। আর, সে সমস্ত মর্ম দিয়ে স্বামীজির আহ্বান হৃদয়ের অভ্যন্তরে কান পেতে শুনছিল।

হে প্রভু,
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি।

মার্গারেট মনে মনে তার আচার্যকে প্রণাম করল প্রভাতীসূর্যের বন্দনা মন্ত্র দিয়ে :

জবাকুসুম-সঙ্কাশং; কাস্যপেযং মহাদ্যুতিং,
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম।

আর, স্বামী বিবেকানন্দ দেখছিলেন তার মধ্যে অসামান্য দীপ্তিময়ী এক রমণীকে - কাঠিন্যে এবং দৃঢ়তায় ইস্পাতখণ্ডের মত হয়েও প্রেমে, মহত্ত্বে, ঔদার্যে একান্ত নমনীয় এক বঙ্গললনাকে; তার এক মহারূপান্তরকে। তাঁর সেই গভীর ভালোলাগার হৃদয়মধ্যস্থ কৌস্তুভমণি উদ্ভাসিত দ্যুতি যেন সহসা চারদিকে ঔজ্জ্বল্যে ঝলকে উঠল। ছিটকে বেরোল রামধনুর রঙ, আর উচ্ছ্বাস।

মন রাঙানো সেই ভালোলাগার আবেগের ওপর একটা একটা করে কথা বসিয়ে

গেঁথে তুললেন কবিতার ইমারত। বড় যত্নে, বড় শ্রদ্ধামিশ্রিত সোহাগে সোনার কলমে ছন্দিত হল তাঁর বাণী :

> মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
> দখিনের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
> বীর্যময়, পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
> অবন্ধন শিখা মেলি আর্য-বেদীতলে,
> এসব তোমারই হোক, আরও ইহা ছাড়া
> অতীতের কল্পনায় ভালো নাই যারা।
> ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
> সেবিকা, বান্ধবী, গুরু - তুমি একাধারে।

কবিতাটি লেখার অব্যবহিত পরেই ছটফটানিহীন শান্ত, ধীর, স্থির - ভাবটা তাঁর ফিরে এল। এই প্রথম মনে হল, মানুষের যা কিছু সুন্দর তা তার অনুভূতিতে পাওয়া। আকাশের তারার মত অনুভূতির মধ্যেই বিন্দু বিন্দু আলো হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে। হতে থাকবে যতক্ষণ না সাধের পাখি হয়ে সুখের আকাশে সটান উড়ে আসবে।

সাত
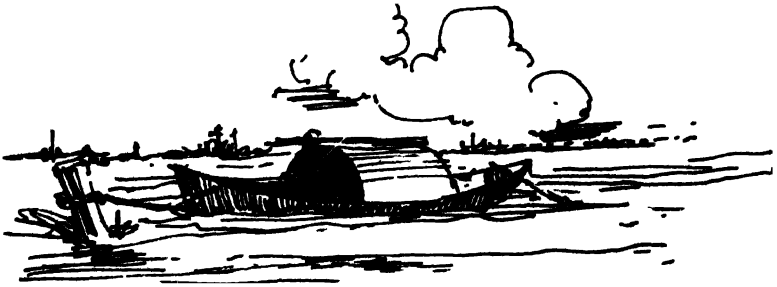
কোলকাতার শিক্ষিত জনসমাজের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় সুসম্পন্ন করার পরেও বিবেকানন্দের মনে হল তার বরণের আয়োজন এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে প্রবেশের পথে অনেক সংস্কার এবং সংকীর্ণতার দুর্গম পথ এখনও পাড়ি দিতে হবে তাকে। মার্গারেট আবাল্য যে ধর্ম, সংস্কার, বিশ্বাস এবং শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিল তার সব কিছু নিরাসক্তভাবে ত্যাগ করে মনেপ্রাণে তাকে নতুন হয়ে উঠতে হবে এবং অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে। আত্মত্যাগের সেই কঠিন অধ্যায়টা এখনও বাকি। বিবেকানন্দেরও সংশয় হয়, মার্গারেটের মত জাত্যভিমানিনী, ধর্মপ্রাণা রমণী স্বধর্ম ত্যাগে রাজি হবে কি? প্রশ্নটা নিজেকে করলেও ভালোভাবেই জানেন তার অন্তরে যে বাসনা বীজ হয়ে আছে তাকে ঠিক সময়ে অঙ্কুরিত করার অনুকূল অবস্থা তাঁকেই তৈরি করতে হবে।

মার্গারেটের ভাবভঙ্গি, ধরন ধারা লক্ষ্য করে বুঝেছেন তাঁর নির্দেশ শোনার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছে সে। শুধু ডাকটা এসে পৌঁছনোর অপেক্ষা। মার্গারেট যে তাঁকে ভীষণ ভালোবাসে এটা তাঁর অজানা নয়। ভালোবাসে বলেই দুমাসের মধ্যে কত বদলে ফেলেছে নিজেকে। ভালোবেসে পূর্ণ হওয়ার জন্য নিজের সব কিছু বলি দিতে পারে। সীতা, শৈব্যা, দময়ন্তী, পার্বতীর মত তার ভালোবাসাতেও সাধনা

আছে, ত্যাগও আছে। ভিখারীর মত সে চায় না। আপন প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী সে। অকপটে নিজেকে নিবেদন করতে পারে। কিন্তু এখনও সে কাজটা করে দেখায়নি। কারণ, তার মন এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়নি। তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই তার। মাত্র দু'মাসের মধ্যে নিজেকে যেভাবে ভারতবর্ষের জন্য তৈরি করেছে, অন্য কোনো বিদেশিনী সেভাবে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়নি। এমনকি আশ্রম জীবনের জন্য তাদের মধ্যে কোনো আকৃতিও নেই। নিজেদের মত জীবনযাপন করেছে তারা। দিব্যি আনন্দে আছে।

মার্গারেটের ব্যাপারটা স্বামীজি অনুভব করতে পারেন। তাঁর উত্তুঙ্গ অনুভবের টানাপোড়েনে ওই বিদেশিনীদের কেউ তাদের জীবনটাকে বুনতে চায় না। কেবল মার্গারেটই একটু আলাদা। তাদের মধ্যে থেকেও তাদের মত হল না সে। হতে চাইল না আর কি? নিজের মত থাকল। গূঢ় আত্মোপলব্ধির পথে তাকে নিরন্তর কে ঠেলছিল যেন। সেখান থেকে কিছুতে বেরিয়ে আসতে পারছিল না।

মার্গারেটের সব বন্ধন যে তিনি নিজেই সে কথাটা তাঁর চেয়ে ভালো কেউ জানত না। তার সমস্ত সত্তাটা আটকা পড়েছে তাঁর কাছে। সন্ন্যাসী হলেও হৃদয়ের মধ্যে তার ফল্গুপ্রবাহ অনুভব করেন। অনেকটা উমার শিবপূজার মত মার্গারেটও তাঁকে পাওয়ার জন্য সাধনা করছে। এমন কি তার নিজের অহং পর্যন্ত ত্যাগ করতে সে রাজি। কিন্তু অহং তো আর মুখের কথায় ত্যাগ করা যায় না। তার জন্য চাই প্রস্তুতি।

এসব কথা আগে মনে হয়নি বিবেকানন্দের। তাঁর ব্যক্তিত্বের গন্ধ নিজেও টের পাননি কোনোদিন। মার্গারেটের নীরব ভালোবাসা তাকে চেনাল সন্ন্যাসী হয়েও রক্তমাংসের মানুষ তিনি। তাঁরও কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা আছে। মার্গারেটের সান্নিধ্যে এলেই সেই দুর্বলতাগুলো ভীষণভাবে মনে করিয়ে দেয় কী যেন চুরি হয়ে গেছে তাঁর। মার্গারেট এসে যখন চলে যায় তখন মনে হয় তার অনেক কিছুই রেখে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে তার সুবাস থাকে। মনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মার্গারেটের চিন্তায়। আর তখনই খুব হাসি পায় তাঁর। যে মানুষটা সর্বক্ষণ আগলাতে ব্যস্ত, সে মানুষটার নিজের দুর্বলতার জায়গাটাকে পাহারায় দেয় কে? সন্ন্যাসী হলেও ভয় অনেকরকম। মানুষের মনের গুহায় যে আদিগুহামানবটি বাস করে তার হাত থেকে নিজেকে পাহারা দেওয়াও এক কঠিন কাজ। পার্বতীর তীব্র চাওয়ার সাধনার কাছে যোগীবর শিবও আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই বড় ভয়ে ভয়ে থাকেন।

এজন্যই মার্গারেটের সম্পূর্ণ অহংমুক্তি ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে তাঁর আর ভরসা হয় না। মানুষের নিজের মনের ও শরীরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে। রাজার ডাক, হঠাৎ করে সহস্র হাতে ছুরি মারে তার সংযম ও দৃঢ়তার বুকে। আচমকা এক দারুণ মুগ্ধ চমকে, চমকে ওঠে, ভেতরের বাঁধটা ভেঙে দিয়ে দুরন্ত উৎসারে বন্যার জলের মত যদি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা হলে দাঁড়ানোর মাটিটুকুও পায়ের

তলায় থাকবে না। কথাটা মনে হতেই আতঙ্কে, তাঁর হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ থমধরা বিষণ্নতায় কাটল। হঠাৎ অদৃশ্যলোক থেকে কৌতুক করে ঠাকুর যে তাকে বললেন আমি তো তোকে গেরুয়া দিয়ে গেছি। তুই তো সন্ন্যাসী। তোর ঘর-সংসার আমি নিজেই ভেঙে দিয়ে গেছি। এখন তোর জন্য আছে শুধু বিশ্ব। এ সংসারে তোর হারানোর কিছু নেই। তুই দিতে এসেছিস, নিতে নয়। তোর কাজ ভাঙা নয়, গড়া। মার্গারেটও ঐশ্বর্যের সদর দরজা দিয়ে আসেনি, এসেছে মাধুর্যের খিড়কি দিয়ে। নির্জন একাকিত্বের মধ্যে বিবেকানন্দ চমকে উঠলেন। এ কার বাণী শুনলেন? ঠাকুরের, না তার বিবেকের? তারপর নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলল, ঠিকই তো, মার্গারেটকে নিয়ে তাঁর এত ভাবার আছে কী? যে মনটাকে উঁচুতে তুলে রাখতে পারে সে মনটাকে জোর করে নিচে নামিয়ে রাখা কেন? নামিয়ে রাখার জন্যই তো এত যন্ত্রণা?

বিবেকানন্দের নিজেরও শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। মার্গারেট সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি খুব দ্রুত নিতে হল। সম্পূর্ণ অহংমুক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা কোনো মানে হয় না। অহং মুক্তির শিখা কেউ কাউকে দিতে পারে না। চন্দন ঘষে ঘষে গন্ধ বার হয়। তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানের আলো পড়লে মনটা জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ-পবিত্র হয়ে যায়। মন পবিত্র হয়ে গেলেই তাতে আলো জ্বলে। জ্ঞানের আলো। সেই আলোতে বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এ হল আচার্যের কাজ। আচার্যই দেবে তাকে পথের সন্ধান। একদিন গুরু রামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে নাস্তিক্যের অহং ভেঙে ভবতারিণীর মূর্তির সামনে তাঁকে দাঁড় করে দিয়ে মহাকৌতুক করেছিলেন। নরেনের মনে আছে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরের গর্ভগৃহে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে। চতুর্দিকে ফুল-বেলপাতা ছড়ানো। রহস্যময় আলো অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্টভাবে কালীমূর্তি দেখা যাচ্ছে। দিগম্বরী, নৃমুণ্ডমালিনী মা তাঁর দৃপ্ত দুটি চোখ মেলে নরেনের দিকে চেয়ে আছে। অধর প্রান্তে স্নিগ্ধ বাঁকা হাসি।

নরেন হাঁটু গেড়ে বসল। সে ব্রাহ্ম। হিন্দুর পুতুল প্রতিমায় তার ভক্তি নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই প্রস্তরমূর্তির সামনে তার মনটা ভীষণ দীন হয়ে গেল। মনে হল, দেবী। ঘরের কর্ত্রী। স্নেহময়ী জননী। শক্ত হাতে দুষ্টকে দমনের জন্য যেমন শাসন করছেন, তেমনি অভয়ও দিচ্ছেন। নরেনের প্রত্যয় জাগল এই মায়েরই ক্ষমতা আছে অভাব-কষ্ট এবং অর্থনৈতিক সংকট থেকে তাকে উদ্ধার করার। রামকৃষ্ণ তো মন্দিরে ঢোকার সময় বারংবার বলেছেন, মাকে বিশ্বাস করে যা চাইবি, মা তাই দেবে। সুতরাং গভীর প্রত্যয়ে নরেন মা বলে ডাকল! মা ডাকটা তার বুকের মধ্যে কী সব জিনিস টিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। ঐ ডাকে বুকখানা তার ভরে গেল। মনে হল, তার আর চাওয়ার কিছু নেই। তবু মনে হল, মায়ের কাছে অনেক কিছু চাইতে এসেছে সে। মামলায় জিতে পৈতৃক বাড়ি উদ্ধার করা, সংসারে দুবেলা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করার

কথা অকপটে মাকে বলবে। মায়ের কাছে চাইতে সন্তানের কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু ঐ একবার মা ডাকে আচমকা প্রস্তরমূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ নরেনের ভাবান্তর হল। জগজ্জননীর কাছে দীন হীনের মত সামান্য জিনিস চাওয়া যায়? কত ছোট হলে তবে কাঙালের মত চাওয়া যায় লাউ-কুমড়ো ভিক্ষে। মার করুণা কিংবা কৃপা চেয়ে নিজেকে নয়, জগজ্জননী ভবতারিণীর মহিমাকেই ছোট করে দেওয়া হয়। সে নিজেকে ছোট করতে পারে, কিন্তু মরে গেলে ভবতারিণীকে ছোট করতে পারবে না। তাই প্রস্তরমূর্তির সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। সময় তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল। নরেন্দ্র নির্বাক। মনে হল দিব্য আলোয় ভরে গেছে মন্দিরগৃহ। জ্ঞানের আলো পড়ে বিশ্বরূপ দর্শন হল। পাওয়ার ঘরগুলো দ্রুত ভরে উঠতে লাগল। তার আর অভাব নেই, দারিদ্র্য নেই। মনে মনে ঠাকুরের কাছে ব্যাকুলভাবে বলল : মা আমায় চৈতন্য দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও বৈরাগ্য দাও। আমার আর কিছু চাই না।

পুরনো কথাগুলো বিদ্যুৎচমকের মত চমকাল মনের অভ্যন্তরে। অমনি মনে হল, মার্গারেটকে সঠিক কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার গভীর ভাবনা-চিন্তার রন্ধ্রপথ ধরে একধরনের দুর্বলতা তাঁর রক্তে বাসা বাঁধছে। হয়তো একারণেই অব্যক্ত ব্যাকুলতা এবং পথ চাওয়ার একটা ব্যপার তাঁর মধ্যে আছে। কেবল মার্গারেটের কাছেই তাঁর অনন্ত দাবি, অনন্ত প্রত্যাশা মার্গারেট যেন সব পাওয়ার দেশ তাঁর। অন্য বিদেশিনী শিষ্যাদের সঙ্গে মার্গারেটকে মিলিয়ে ফেলেননি। ভারতে তারা থাকল কি না থাকল, সে নিয়ে কোনো জল্পনা-কল্পনা নেই ; তাদের ধরে রাখারও কোনো আয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু মার্গারেটকে পাকাপাকিভাবে এই ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতরকমের পরিকল্পনা তাঁর। তাকে খুব কাছের মানুষ মনে হয়, বড় আপনজন বোধ হয়। তার সঙ্গে কোথায় যেন একটা গভীর যোগসূত্র আছে। এই ভারতেই তার জন্মানো উচিত ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছেয় সে আয়ারল্যান্ডের মাটিতে জন্মেছে সিংহিনী হওয়ার জন্য। ভারতের নারীর হীনদশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন একজন প্রকৃত সিংহিনীর। ঠাকুর সেই সিংহিনীকে ধরে আনার জন্যই তাঁকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। প্রাচ্য রমণীর নমনীয়তা, কোমলতা, সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ এবং ধ্যানপরায়ণতা যেমন তার মধ্যে আছে, তেমনি আছে পাশ্চাত্যরমণীর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা এবং প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ। তাছাড়া ভারতের মত আয়ারল্যান্ড ইংরেজ শাসিত উপনিবেশ। পরাধীনতার আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতের মতই ইংল্যান্ডেব বিরুদ্ধে সে দেশের মানুষ জেহাদ ঘোষণা করেছে। এই বাহ্য ও অন্ত্যমিলই তাঁদের দু'জনকে খুব কাছের মানুষ করে তুলেছিল। দু'জন দুজনের মধ্যে মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল। তাই বলে কোনো মোহের প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে মনে করেন না।

বিবেক লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর দিকে চোরা কটাক্ষ হেনে যেন বলল : উঁহু, সত্যের অপলাপ কর না। নিজেকে লুকোনোর কিছু নেই। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে, কিন্তু

মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ খাটে না। তাকে চোখেও দেখা যায় না, তাই সব সময় টের পাওয়া যায় না তার গতি-প্রকৃতি। নিজের ওপর কড়া পাহারা বসিয়েছ। চাবুক মারছ নিজেকে। আর, তার দাগ কেটে কেটে বসছে মার্গারেটের গায়। তার দোষ কি? নিজের সঙ্গে তার তো কোনো ছলনা ছিল না। তোমাকে সে ভালোবেসেছিল। তোমাকে পাওয়ার জন্যই এখানে এসেছিল। ওর প্রেমে কোনো মিথ্যে ছিল না বলেই মুখের ওপর 'না' বলে তুমি ওকে ফিরিয়ে দাওনি। বরং তোমার চিঠিপত্রের মধ্যে তাকে আহ্বান করেছ। ভারতের কাজে তার প্রয়োজনকে অকপটে বোঝাতে নিজেকে শুধু উন্মোচন করনি, নানাভাবে নিবেদনও করেছ। তোমার ব্যাকুলতার মধ্যে হৃদয়ের ছোঁয়া ছিল। মার্গারেট তাকে প্রেম মনে করে যদি ভুল করে থাকে তা-হলে সে তো তার দোষ নয়। মার্গারেটের স্বপ্নের বিবেকানন্দকে, তার প্রিয় রাজাকে তিল তিল করে তুমি হত্যা করছ। অথচ, এত পাষণ্ড তো তুমি নও। ভারতে ডেকে এনে তার সঙ্গে বদমেজাজী পুরুষের মত রুক্ষভাষায় কথা বলতে তোমার শরম হয় না। তুমি যেন দিন দিন কীরকম হয়ে যাচ্ছ। লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে কাঁদতে তুমিও দেখেছ। মার্গারেটের কান্না সহ্য করতে না পেরে জো'ও তোমাকে ভর্ৎসনা করে বলেছে : স্বামী একটু মিষ্টি কথায় ওর কোথায় ভুল, ত্রুটিটা কী সেটা তো বলতে পার। নরম ভাষায় কেবল ওর সঙ্গেই কথা বল না। বুঝি না তোমার ব্যাপার স্যাপার। নিজেও কষ্ট ভোগ কর, ওকেও কষ্ট দাও।

পায়ের খস্ খস্ শব্দে সহসা ভাবনায় ছেদ পড়ল। দ্বারপ্রান্তে মানুষের একটা ছায়া পড়ল। আত্মবিস্মৃত অবস্থা থেকে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করতে বেশ কিছু সময় লাগল। সাদা গাউন পরিহিত মার্গারেটকে স্বর্গের পরীর মত দেখাচ্ছিল। তার হর্ষদীপ্ত প্রফুল্লিত মুখের দিকে স্বপ্নালু চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। স্বামীজির অধরে স্ফুরিত মোহন হাসির দ্যুতি মার্গারেটকে প্রগলভ করল। বিগলিত খুশিতে গদ গদ হয়ে বলল : বেলুড় থেকে বাগবাজারের ঘাট পর্যন্ত পানসী নৌকোটা যেন উড়িয়ে আনল। এতদিন যাওয়া-আসা করছি, আজই সবচেয়ে কম সময় লাগল। অথচ আমার ভয় ছিল কতই না বিলম্ব হবে। ঠাকুরের কৃপায় আগেই পৌঁছে গেছি। হাঁফ ছেড়ে একটু বসা তো যাবে।

তার পিছন পিছন ঢুকল ধীরা মা এবং জো। স্বামীজি আপন গাম্ভীর্যে অটল থেকে বললেন- মার্গো, তোমাদের এক আশ্চর্য জায়গায় নিয়ে যাব। সপ্তম আশ্চর্যের বাইরেও যে এক পরম আশ্চর্য আছে তাকে দেখবে। নবরত্নের বাইরেও যে অমূল্য রতন আছে, যার স্পর্শে সব সোনা হয়ে যায় সেই স্পর্শমণির দ্যুতি পড়ে তোমার ভেতরটা আলোয় ভরে যাবে। মনের সব মলিনতা, দীনতা ঘুচে গিয়ে প্রাণের খুশিতে গেয়ে উঠবে—বিশ্বহৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া, সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও। আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও—একথা বলতেই হবে তোমায়।

মার্গারেট স্তব্ধ হয়ে চেয়েছিল স্বামীজির অনিন্দিত সুন্দর মুখের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটে না মোটে। সব কেমন স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। একোন সুদূরের হাতছানি দিয়ে স্বামীজি ডাকছে তাকে। একী সত্য, না অলীক, না মিথ্যা মায়া।

মার্গারেটের মত মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলয়েডও চুপ করে রইল। ওদের বিভোর বিহ্বল দুই আঁখির ওপর চোখ রেখে স্বামীজি বললেন : জয়রামবাটি থেকে মা সারদা এসেছেন বাগবাজারে। ১০/২ বোসপাড়া লেনের বাড়িতে উঠেছেন। কিছুদিন থাকবেন ওখানে। তোমাদের কথা ওঁকে জানিয়েছি। মা, তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। ওঁর কাছে তোমাদের নিয়ে যেতে চাই। স্বর্গের দেবীকে চোখে দেখিনি কিন্তু মর্তের এই মানবী মাতার মধ্যে জীবন্ত দেবীকে দেখেছি। তোমরাও তাঁর মধ্যে জীবন্ত জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করবে। আমাদের মা গাঁয়ের মেয়ে। লেখাপড়া শেখেনি। পাঠশালাও যায়নি। কিন্তু মা নিজেই একখানা গ্রন্থ। আগম-নিগম-বেদের লৌকিক সংস্কার। মা, মূর্তিমতী গায়ত্রী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন সারদা মা সাক্ষাৎ আনন্দময়ী। তাঁর মধ্যে ভবতারিণীকে দেখেছেন তিনি। তাই মন্দিরের বিগ্রহকে যেমন হৃদয়ের নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা করেন তেমনি পত্নী হলেও সারদা মার মধ্যে যিনি আছেন তাঁকে বিগ্রহের মতো পূজো অর্চনা করলেন। তবে তা মন্দিরে নয়, নিজের ঘরে একান্তে এবং নির্জনে।

বিবেকানন্দ চোখ বন্ধ করলেন। মনে হল ধ্যানে সমাহিত হয়ে গেছেন। কয়েকটা মুহূর্ত কাটার পর মার্গারেট চোখের ভারিভারি পাতা দুটো অতি কষ্টে তুলে বিবেকানন্দের ওপর মেলে ধরল। বলল : স্বামীজি চুপ করে গেলেন কেন?

স্বামীজির কণ্ঠস্বর সহসা অলৌকিক হয়ে উঠল। বললেন : ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজের হাতে পুজোর সব আয়োজন করলেন। এমন কি আলপনা কাটতেও ভুল করলেন না। তারপর তাঁকে যত্ন করে ডান পাশে আলপনা দেওয়া চৌকির ওপর বসালেন। পশ্চিমমুখী হয়ে সারদাদেবীকে আসন গ্রহণ করতে বললেন, নিজে বসলেন পুবমুখ করে। একে একে সাজালেন পূজার অর্ঘ্য। সামনের মঙ্গলঘট থেকে জল নিয়ে বারে বারে তার গায়ে ছিটিয়ে যথাক্রমে শোধন ও অভিষেক করা হল। তারপর বিহিত পূজা-মন্ত্রপাঠ শুরু হল। করজোড় করে বললেন : হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী, মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এঁর (সারদামণির) শরীরমনকে পবিত্র করে ওঁর মানবী সত্তাতে আবির্ভূত হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর। সবশেষে নিজের জপমালাসহ সাধনার সর্বস্ব ফল দেবী সারদার পাদপদ্মে চিরকালের জন্য সমর্পণ করে তাঁকে প্রণাম করলেন—সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্থ সাধিকে, শরণ্যে-ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে।

শুনতে শুনতে বারংবার শিহরিত হল শ্বেতাঙ্গিনীদের কলেবর। মার্গারেট তো অভিভূত। বুকের ভেতর রক্তের কলধ্বনি আর থামতে চায় না। সারদা মাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হল সে। তার আর তর সইছিল না। বলল : তাঁর কাছে কখন যাব

আমরা?

স্বামীজি ওর সঙ্গে কৌতুক করার জন্য বলল : আজ নয়, অন্য কোনো দিন।

মার্গারেট তৎক্ষণাৎ বলল : স্বামীজি তুমি বল, শুভকাজে কালহরণ করতে নেই। তা-হলে অন্যদিনের কথা উঠছে কেন?

বিবেকানন্দ হাসি হাসি মুখ করে বলল : সব কথা সকলকে কি বলা যায়?

এমন কোনো গোপন কথা নয় যা সকলের সামনে বলা যায় না। তাছাড়া মায়ের কাছে মেয়ের যাওয়ার জন্য কোনো দিনক্ষণ দেখার দরকার হয় না। মায়ের দরজা সব সময় খোলা। গেলেই হল। মন যখন চাইছে তখন দোষ কি যেতে?

ম্যাকলয়েডও বলল : বড় ভালো দিনে তুমি আমাদের মার কাছে নিয়ে যাচ্ছ।

বিবেকানন্দ ওর কথা বলার ধরনে আশ্চর্য হয়ে অদ্ভুত চোখে তাকাল। ম্যাকলয়েড ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাহীনভাবে বলল : খৃস্টানদের বড় পবিত্র দিন আজ। সেন্ট প্যাট্রিয়টের পবিত্র জন্মদিনে আমরা মাকে দর্শন করতে যাচ্ছি। এতদিন থাকতে এই দিনটা মা তাঁর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেছে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর কোনো একটা গভীর যোগসূত্র আছে।

স্বামীজির মুখে কথা সরে না। ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন: কী আশ্চর্য! গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটার কথা আমিও ভাবিনি। সব কিছু যেন আগে থেকে ঠিক করাই আছে।

দিনটা ছিল ১৭ই মার্চ ১৮৯৮।

তিন বিদেশিনীকে সঙ্গে করে সারদার মার কাছে চললেন বিবেকানন্দ। বোসপাড়া লেন খুব বড় রাস্তা নয়। দু'পাশের বাড়ি রাস্তায় গা ঘেঁসে ওঠার জন্য খুবই সরু হয়ে গেছে রাস্তাটা। ঘরে লোকসংকুলান হয় না বলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খানিকটা রাস্তায় উথলে পড়েছে। ফুটপাত না থাকার জন্য পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওদের কৌতূহলী চোখ স্বামীজিকে নয়, শ্বেতাঙ্গিনীদেরই দেখছিল। দু'ধারে অপেক্ষামান পল্লীবাসীর দিকে উল্লসিত হয়ে হাত নাড়িয়ে তারা শুভেচ্ছা জানাতে লাগল। মিস্ ম্যাকলাউড বলল : এদেশের মানুষ বড় সরল সাদাসিধে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মহিলা পথ দিয়ে গেলেই এদেশের মানুষ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। কী যে ওঁরা দেখেন ওঁরাই জানেন।

বিবেকানন্দ বললেন : সত্যিই তাই। এঁরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অচলায়তন সমাজের মধ্যে বাস করে সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে তোমাদের জীবনযাত্রার পার্থক্য ওদের আশ্চর্য করে। তোমরা কত স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাধীন এবং মুক্ত আর ওরা কত পরাধীন এবং বন্দী। তোমাদের মত হতে পারে না কেন— এই প্রশ্ন ওদের মনকে আর্ত করে। খাঁচায় বন্দী পাখির মত সতৃষ্ণ নয়নে বাইরের পানে তাকিয়ে মুক্তির দিন গোনে। হয়তো ভাবে, তোমরাই প্রত্যাশিত মুক্তির বার্তা বহন করে আনবে

ওদের কাছে।

মিসেস বুল বললেন : আপনার কথাই যথার্থ।

মার্গারেট ওদের কথা শুনছিল না। তার মনের মধ্যে অন্য কথার আলাপ চলেছিল। সারদাদেবী উদার, মহৎ, তিনি সকলের মা, কিন্তু একজন হিন্দুর প্রতি যেমন ব্যবহার করেন, কিংবা একজন ভারতীয়কে যেভাবে সংস্কার ভেঙে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করেন, বিধর্মী বিদেশিনীদের প্রতি অনুরূপ উদারতা দেখাবেন কি? পারবেন কি তাদের বুকে টেনে নিয়ে ভেদাভেদ ভুলে নিজের করে নিতে? আজন্মলালিত সংস্কার, বিশ্বাস, আচার প্রথার বন্ধন তুচ্ছ করে নিরাবেগ চিত্তে অন্য জাতি ও ধর্মের মানুষকে নিজের সন্তান বলে ভাবা একজন রক্ষণশীল রমণীর পক্ষে খুবই দুরূহ। মাতৃত্বের এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় মাকে বিব্রত করা অপদস্থ করা রাজার উচিত হচ্ছে না। কথাটা আচমকাই মনে হল। অমনি সংকোচে সংশয়ে তার ভিতরটা প্রতিবাদ করে উঠল। থমকে দাঁড়াল পথের মধ্যে। থমথমে গম্ভীর গলায় স্বামীজিকে বলল : সোয়ামী, এভাবে আচমকা মায়ের কাছে আমাদের হাজির করা তোমার উচিত নয়। জানি সারদা মা উদার, সংস্কারমুক্ত তবু আচার-প্রথা, সংস্কার বিশ্বাসে অনুগত রমণীমনকে আমাদের সামনে বিব্রত করা বোধ করি ঠিক হচ্ছে না।

স্বামীজি বললেন : মার্গারেট তুমি তো বললে, মায়ের কাছে মেয়ের যাওয়ার দিনক্ষণ লাগে না। মায়ের দরজা সবসময় খোলা। তাহলে মায়ের প্রতি এই অবিশ্বাস কেন?

বলেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার কথার মধ্যে শুধুই আন্তরিকতা এবং আবেগ ছিল, বাস্তবতা ছিল না। বাস্তব বড় কঠিন। আবেগের এবং আন্তরিকতার ধার ধারে না। দেরিতে হলেও প্রকৃত বাস্তব পরিণামটা আমি দেখতে পাচ্ছি। তাই, বলছিলাম, মার কাছে গিয়ে কাজ নেই।

জো এবং ধীরা-মা ওর কথা শুনে অবাক হল। ধীরা মা বলল : আশ্চর্য মেয়ে। স্বামীজি না ভেবে, না জেনে কী আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন? সারদাদেবী বিব্রত হবেন, অপদস্থ হবেন, এরকম সম্ভাবনা থাকলে স্বামীজি কখনই নিয়ে যেতেন না।

জো বলল : অপ্রিয় হলেও বলব তোমার বিশ্বাসের জোর কম।

না জো। আমার বিশ্বাসের জোর দেখাতে গিয়ে পাছে অন্যের বিশ্বাসে আঘাত লাগে তাই ভেবে সংকুচিত হই। প্রত্যেক মানুষের নিজের কিছু দুর্বলতা থাকে। একজন মহামানবও দুর্বলতামুক্ত নন বলেই তিনি মানুষ। অমন যে যীশুখৃস্ট তাঁরও দুর্বলতা ছিল। মানুষের কাছে তাঁর মহত্ত্বের ভাবমূর্তি পাছে সংকীর্ণ সন্দেহে মলিন হয় তাই বিশ্বাঘাতককে চিনতে পেরেও ত্যাগ করেননি তাঁকে। সাবধানও হননি। এই দুর্বলতাটুকু না দেখলে যীশুখৃস্ট ক্রুশবিদ্ধ হতেন না। হয়তো এই দুর্বলতার কাঁটার মুকুট পরে তিনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ পুত্র হতে পেরেছেন।

স্বামীজি বললেন : জান মার্গো, একবার দক্ষিণেশ্বরে একটা ঘটনা ঘটল। আমজাদ

বলে একজন কুখ্যাত ডাকাত ছিল। জাতে বাঙালি, কিন্তু ধর্মে মুসলমান। আমজাদের ভেতরে ডাকাতের তখন মৃত্যু হয়েছে। জীবনস্রোতে ফিরতে চায়। তাই হয়তো তার মনে হয়েছিল জীবন্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গরীবিয়ানা মতে পূজা করবে। তাই ক্ষেতের কলা নিয়ে সে এল সারদা মার কাছে। ভয়ে সঙ্কোচে বলল : মা গো অধম সন্তান ঠাকুরের জন্য দুটো কলা এনেছি। এগুলো নেবে কী?

সারদা মা ওর দ্বিধা দেখে বলল : কেন নেব না? তুই কি আমার পর। ছেলে এসেছে মাকে উপহার দিতে, মা কি সে হার গলায় না পরে ধুলোয় ফেলে দেয়?

কথাটা শুনে আমজাদের বুকটা ভরে গেল। এই না হলে মা! সারদার কাছেপিঠে এক ভক্ত, মার কানে কুমন্ত্রণা দিল। বলল : মা গো ও ডাকাত। মুসলমান। ওর কলা নিও না।

মা হেসে মৃদু তিরস্কার করে বললেন : ছিঃ! আমি সব জানি। মাকে তোর ছেলের বেত্তান্ত শোনাতে হবে না। ওরে নির্বোধ, কলার কি কোনো জাত আছে? ও কলা যখন ঠাকুরের পুজোয় লাগে তখন কি একবারও ভাবিস ও কলা মুসলমানের ক্ষেতের?

বিধবা ভক্তের মুখে কথা বেরোয় না। মাথা হেঁট করে অপরাধীর মত চুপ করে থাকে। তারপর মা পালিত কন্যা রাধুকে হাঁক পাড়লেন। ওরে রাধু আমজাদকে দু'টো মুড়ি দে মা। বেচারা অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছে। মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

রাধু গজর গজর গজর করে বলল : সব তাতে আদিখ্যেতা। খাওয়ানোর আর লোক পেল না। শুধু ডাকাত না, আবার মুসলমান। বামুনের মেয়ে হয়ে একজন মুসলমানকে এত খাতির যত্ন করে খাওয়ানোর কী দরকার বাপু।

রাধু গজর গজর করতে করতে মার নির্দেশ মানল। কিন্তু মুসলমানের ছোঁয়া ও ছায়া বাঁচিয়ে অশ্রদ্ধা করে ছুড়ে ছুড়ে মুঠো মুঠো মুড়ি আর গুড় দিতে লাগল। ওভাবে দিতে দেখে সারদা মা উঠে এসে হাত থেকে পাত্রটা কেড়ে নিয়ে রাগত গলায় বললেন, ঢের হয়েছে, আর তোকে দিতে হবে না। মানুষকে অমন অশ্রদ্ধা করে দিলে কারো খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস, আমি দিচ্ছি।

যেমন কথা তেমনি কাজ। নিজের কাছে বসে যত্ন করে তাকে খাওয়ালেন। তারপর খাওয়ার জায়গাটা জল ঢেলে লেপে দিয়ে শুদ্ধ করলেন। রাধু ঝঙ্কার দিয়ে বলল : তুমি কি পাগল হলে। শেষে মুসলমানের এঁটো ছুঁয়ে জাতটা দিলে। ঠাকুর দেখলে কিন্তু খুব বকতেন।

সারদা হেসে বললেন ঠাকুর দেখলে খুশি হতেন আমজাদ আমারই ছেলে। শরৎ যেমন ছেলে আমজাদও তেমনি। মার কাছে ছেলের জাত ধর্ম আবার কি?—এই হল আমার সারদা মা! এতবড় অন্তঃকরণ পৃথিবীর কজন মায়ের আছে?

মার্গারেট থমথমে গলায় বলল : জানি। তিনি হলেন মাতৃত্বের মহাকাব্য। যে মহাকাব্যের প্রতিটি পঙক্তি বা স্তবক হল প্রতিটি মা ও শিশু। তিনি হলেন বিশ্বজননী। করুণার প্রতিমূর্তি।

এতই যখন জান তাহলে সংশয়ের মেঘ কেন মনে?

এজন্য তো আপনি দায়ী। মায়ের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে এতই নিরুৎসাহভাব দেখালেন যে মনে হল, আপনাকে জোর করে খুব অন্যায় করেছি। হয়তো সত্যি কোনো অসুবিধে ছিল, তাই আপনি দ্বিধা করছেন।

মৃদু হেসে স্বামীজি বললেন : আমি কিন্তু তোমাদের আন্তরিকতাকে বাজিয়ে দেখছিলাম।

কথা বলতে বলতে ওরা ১০/২ বোসপাড়া লেনে সারদা মার গৃহে পৌঁছে গেল। বাড়ির সদর দরজা অল্প ভেজানো ছিল। কপাটের ফাঁক দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল। ভিতর থেকে মানুষের কথাবার্তা ভেসে আসছিল। দরজার কপাটে হাত দিতেই খুলে গেল। এক ঝলক উজ্জ্বল আলো গলির মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

মার্গারেট ম্যাকলাউড এবং মিসেস বুল খুব সন্তর্পণে স্বামীজির সঙ্গে একত্রে ঐ গৃহের চত্বরে পা রাখল। তিন বিদেশিনী মহিলার চোখেমুখে কেমন একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ, ছাতা এসব নিয়ে তারা বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়ল। এসব বস্তু সঙ্গে রাখা নিয়ে যে, কোনো সমস্যা উদ্ভব হতে পারে এখানে আসার আগে মনে হয়নি। এখন তো এগুলিকে তাদের বোঝা বোধ হচ্ছিল। অসহায়ের মত ওগুলি হাতে নিয়ে স্বামীজির দিকে একটা উপায়ের আশায় তাকিয়ে রইল।

স্বামীজির আগমনের অব্যবহিত পরেই স্বামী যোগানন্দ এলেন বিদেশিনীদের অভ্যর্থনা করতে। স্বামীজির চোখের ইশারায় ওদের দুর্গতির প্রতি নজর দিতে বললেন। যোগানন্দ একটা জায়গা দেখিয়ে দিল সেখানে জুতো জোড়া এবং অন্যান্য জিনিস রেখে দিয়ে ওদের ভিতরে যেতে বলল। ওরা যখন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল তখন স্বামীজি যোগানন্দের সঙ্গে নিচেই থেকে গেলেন।

উপরতলায় উঠে তিন বিদেশিনী দেখল ঘরের দরজা খোলা। পা টিপে টিপে ওরা নিঃশব্দে খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল। ঘরের মাঝখানে মেঝেতে একখানা চাটাই পাতা আছে। তার ওপর রাজরাজেশ্বরীর মত বসে আছেন মা সারদা দেবী। গায়ের রঙ মাজা, মুখখানি অসাধারণ এমন কিছু নয়, তবু-একটা অসাধারণত্ব যেন কোথায় লুকোনো আছে। পরনে লালপেড়ে শাড়ি, আটপৌর ভাবে পরা। গোটা শরীরটাকে আলগাভাবে ঢেকে রেখেছে। কাপড়ের এক প্রান্ত মাথার ওপর ঘোমটার মত টানা। অনেকটা নানদের অবগুণ্ঠনের মত। কাঁধের পাশ দিয়ে চুলের একভাগ বুকের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে। আর এক ভাগ সারা পিঠ ছেয়ে আছে। তাতেই মাকে অসাধারণ দেখাচ্ছিল। ঘরে আর যে মেয়েরা ছিল তারা মায়ের সম্মুখে একটা আলাদা চাটাইয়ে বসেছিল। তদেরও পরনে ছিল সাদা শাড়ী, আঁচলও ছিল মাথায় তুলে দেওয়া। মুগ্ধ দুটি চোখে সারদাদেবীর মুখপদ্মে স্থির হয়ে রইল।

বিদেশিনীরা একে একে করজোড় করে প্রণাম করল। সারদা দু'হাত কপালে ছুঁয়ে প্রতিনমস্কার করলেন। কেবল মার্গারেট হাঁটু গেড়ে বসে ভক্তিমতী হিন্দু রমণীর মত

আভূমি হয়ে প্রণাম কবল মায়ের শ্রীপদ। সারদা তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ কবলেন। চিবুক ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বললেন : এস মায়েরা। তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছি। আমার মেয়েদের বসবার আসন দে রাধু।

ঘরের মেঝেয় পায়ের খস্ খস্ শব্দ করে একটি মেয়ে এসে নিঃশব্দে তিনখানি হাতের কাজ করা আসন ওদের বসার জন্য মেঝেতে পেতে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। মায়ের পাশে যাবা বসেছিল অবাক বিস্ময়ে তারা দেখতে লাগল তাদের। মনে হল তারা যেন দেখার বস্তু। সারদাদেবীও হাসি হাসি মুখ কবে তাকিয়ে আছেন তাদের দিকে। কেউ কথা বলছিল না। ভাষাটা ওদের মাঝখানে দেয়াল তুলে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার কেউ ছিল না। ঘরময় নীববতা বিরাজ করছিল। পরস্পরের দিকে বোবার মত চেয়ে ছিল। অধরে মৃদু মৃদু হাসি। ঐ হাসি যেন হৃদয়ের ভাষা হয়ে উঠল।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার অবসান ঘটানোর জন্য মিসেস সারা বুল বললেন : আমি মিসেস বুল। স্বামীজি ধীরা মা বলে ডাকেন, ইনি মিস ম্যাকলাউড স্বামীজির জয়া মা, আর উনি হলেন মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল স্বামীজির হবু শিষ্যা।

সারদা দেবী ঘাড় নেড়ে বোঝালেন যে, তিনি জানেন। একে অপবের ভাষা না বুঝেও তারা পরস্পরের খুব আপনজন হয়ে উঠল। মুখেব অনাবিল খুশির হাসি যেন ওদেরকে খুব কাছে টানল।

সারদা মার কিছু কিছু কথা মার্গারেট বুঝতে পারে। ভাঙা বাংলায দুচাব কথা বলতেও পারে। কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারে না বলে বেধে যায়। আর তখনই মনের ভাবটা স্পষ্ট করার জন্য ইংরেজি বলতে আরম্ভ করেই লজ্জা পেয়ে ফিক কবে হেসে ফেলে। সারদা মাও ওদেব সঙ্গে হাসেন। নির্মল পবিত্র সে হাসি। ঐ হাসিই হৃদয়ের ভাষা হয়ে একে অন্যকে কাছে টেনে নিল।

সবাইয়ের দৃষ্টি মার্গারেটের ওপর। তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে একটা সহজ সংকুচিতভাব মার্গারেটকে ক্রমেই আড়ষ্ট করে দিতে লাগল। নিজের বিব্রতভাবটা কাটিয়ে কিছুতে সহজ স্বভাবিক হতে পারছিল না। লজ্জায় উত্তেজনায় তার কানের পাতা তেতে উঠেছিল। বুকের ভেতব হৃৎপিণ্ডেব ধুক্-পুক, ধুক্-পুক শব্দটা দ্বিগুণ হল। মেয়েরা তাকে নিয়ে ফিস্ ফিস করে কথা বলছিল। এর মধ্যে তিনজন মহিলা এসে পিতলের রেকাবিতে করে কাটা ফল, মিষ্টি এবং গ্লাস ভরতি গরম দুধ তাদের সামনে রাখল। সারদা দেবীর জন্য সাদা পাথরের রেকাবীতে অনুরূপ ফল মিষ্টি দিয়ে গেল।

সারদা মা হেসে বললেন : মেয়েরা খেয়ে নাও। একজায়গায় বসে আমরা পংক্তি ভোজন করি।

মার্গারেট ইংরেজি তর্জমা করে অন্যসঙ্গীদের বোঝাবে কী? বিস্ময়ে আনন্দে তার বাক্যস্ফূর্তি হল না। পল্লীজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে রক্ষণশীলতা আগলে রাখার

দৃঢ়তা নিয়ে যিনি আবাল্য প্রতিপালিত, বাইরের প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে যাঁর বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই, সাধারণ শিক্ষাটুকুও যিনি পাননি তাঁর পক্ষে এত সহজে সব সংস্কার এবং বন্ধন কাটিয়ে বিদেশিনী বিধর্মী বিজাতীয় রমণীদের আপন কন্যা বলে শুধু সম্বোধন করা নয়, আন্তরিকভাবে মন-প্রাণ দিয়ে আপনার করে নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করা সত্যিই বিস্ময়কর ঘটনা। সারদা মা ওর বিস্ময় দেখে বলল : তোরা যে আমার মেয়ে। মা-মেয়েতে বসে খেতে খেতে গল্প করব। আর তুই তো সকলের ছোট। আমার আদরের খুকী।

কথাটা শুনতেই উদ্গত উচ্ছ্বাস আবেগ আনন্দকে রীতিমত নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল মার্গারেটের। অধর কোণে ফিকে হাসিতে মার্গারেটকে অন্যরকম দেখাল। প্রাণভরা খুশি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সারদা মার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর বুকে মাথা রেখে বলল, মা, মা আমার। আমার জন্মজন্মান্তরের মা। এতকাল আমাকে ফেলে কোথায় ছিলে? আর আমায় ছেড়ে থাকবে না তো?

সারদাদেবী ওর সোনালী রঙের চুলের মধ্যে সস্নেহে বিলি কেটে দিতে দিতে বললেন : পাগলী মেয়ের কথা শোন। কতকাল পরে দেখা হল বল তো? কবে এসেছিস, এর মধ্যে দেখা করার সময় হল না একদিনও। আমি যে তোর পথ চেয়ে বসে আছি।

মার্গারেটের ভেতরটা চমকাল। গর্ভধারিণী মাকে মনে পড়ল। এমন হৃদয়ভরা আন্তরিকতা নিয়ে তার নিজের মাও কখনও ডাকেনি তাকে। ছোট থেকে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব গভীর ছিল না। তাদের উভয়ের মধ্যে কোথায় একটা দূরত্ব ছিল। তার আঠাশ বছর জীবনে সেই দূরত্বকে অতিক্রম করতে পারেনি। একটা অপূর্ণতা তার ছিল। সারদা মায়ের আন্তরিকতার কোনো ফাঁক ছিল না। তাঁর মমতা-মাখানো সুধা-স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর তার চাওয়ার ঘরকে নিমেষে ভরে দিল। স্নেহময়ী মায়ের এই অকপট ডাকটা শোনার জন্য তার ভেতরটা যেন পিপাসার্ত হয়েছিল। এক স্বর্গীয় সুখানুভূতিতে তার হৃদয় টৈটম্বুর হয়ে যেতে লাগল। মনে হয় প্রথম গ্রীষ্মের পর বর্ষা নামল যেন তার বুকে।

মার্গারেট মাথা তুলে সারদার মুখের দিকে তাকাল। কী অপরূপ দেখতে তাঁকে। পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ার মুখে কী পবিত্র আর নির্মল সৌম্য প্রসন্নতার আভা। আত্মার মণিদ্যুতি যেন ঠিকরে পড়ছে তাঁর মুখে।

সারদার মার ঘর থেকে এক বুক প্রসন্নতা নিয়ে ওরা সিঁড়িতে হিল্ তোলা জুতোর খট্‌খট্ শব্দ করে নিচে নেমে এল তখন স্বামীজি ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মার্গারেট তো তাকে দেখেই ফুঁসে উঠল। বলল : আপনি ভীষণ খারাপ লোক। মার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার না থাকা খুব অন্যায় হয়েছে।

বিবেকানন্দ মিস ম্যাকলাউডের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন : তোমার কী তাই মনে হয়েছে জো?

তুমি থাকলে ভালো হত নিশ্চয়ই। কিন্তু না থেকে বোধ হয় বেশি ভালো করেছ।

মার্গারেট জো'র কথার সূত্র ধরে খুশি হয়ে বলল : আপনি থাকলে জানা হতো না—ভাবের প্রকৃত বিনিময় ঘটে হৃদয়ে। ভাষা বোধ হয় অতখানি পারে না।

তোমাদের নিজের চোখ দিয়ে সারদা মা'কে এই জানার সঙ্গে চেনাটাও কোনোদিন ফুরোবে না।

ধীরা মা উৎফুল্ল হয়ে বলল : ভালো কথাই বলেছ। ভাবতেই পারিনি, কন্যাস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে মা বলে আমাদের সম্বোধন করবেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি ওঁর সঙ্গে আমাদের ফলাহার করতে বললেন যখন।

ম্যাকলাউড মার্গারেটের দিকে দুষ্টু দুষ্টু চোখে তাকিয়ে বলল : মিস নোবলকে তো 'আমার আদরের খুকী' বলে গালটিপে আদর করলেন। বলতে কি, নোবলেরও ইচ্ছে হয়েছিল মা-মেয়ের মিলন দৃশ্যটা আপনি দেখুন। পারলে দৌড়ে গিয়ে আপনাকে ডেকে আনত।

ওদের প্রসন্ন কথাবার্তা স্বামীজিকে উৎফুল্ল করল। চোখে দুটো এক তীব্র ভালো লাগার আবেগে, আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। কিন্তু মার্গারেটকে নিয়ে ম্যাকলাউডের কৌতুক হঠাৎই বিচিত্র এক লজ্জার শিহরনে তাঁর মুখে মুঠো মুঠো আবির মাখিয়ে দিল। লজ্জাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বিবেকানন্দের মুখখানা এঁকে বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল।

সে দৃশ্য অন্যের চোখে পড়ার আগেই নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বিবেকানন্দ বললেন : যত দিন যাচ্ছে, মার্গারেট ততই আমাকে অবাক করছে। মাত্র বিশ দিনের মধ্যে তার জয়ের ভাণ্ডার বিপুল হয়ে উঠল। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ও যেন এ দেশকে জয় করতে এসেছে। যার কাছে যাচ্ছে তাকেই জয় করছে। এযেন এলুম, গেলুম আর জয় করলুম গোছের এক বিরাট ব্যাপার।

ধীরা মা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলল : মোটেই তা নয়। তুমি নোবলকে দেখলে - কিন্তু ওর ভালোবাসা, অনুরাগ শ্রদ্ধাকে দেখলে না। ভালোবাসা ঈশ্বরের সৃষ্টি। ভালোবাসার আলো পড়ে সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নোবলের ভালোবাসা মনের ঘরে দীপ জ্বেলে দিয়ে তার স্বরূপ জ্ঞাত করে। তাই গোপালের মা, কিংবা আমাদের সারদা মা তাকে দেখে চমকায়নি। একটু আশ্চর্য হয়নি। বরং মনে হল মার্গারেটের অপেক্ষায় তাঁরা কাল গুনছিলেন। আসা মাত্র তাকে চিনে নিতে কষ্ট হয়নি তাঁদের। হারানো মেয়েকে ফিরে পেলে মায়ের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দে সারদা-মা তার চিবুক ধরে দুই চোখ পেতে রইল। অনেকক্ষণ পরে একটা পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : আমার খুকী। জাত-পাত সচেতন গোপালের মা পর্যন্ত মার্গারেটকে পেয়ে তাঁর সংস্কার ভুলে গেলেন। নিজের উচ্ছ্বাস গোপন করার মত শক্তিটুকুও তাঁর ছিল না। প্রসন্ন অন্তঃকরণে বললেন : তুই আমার নরেনের মেয়ে। অন্তরের টানে অন্য কোনে বিদেশিনী নোবলের মত আত্মীয় হয়ে ওঠেনি। তোমার কথা দিয়ে বলি, যে

হয় সুপ্রাণী, তাকে ভালোবাসে মহাপ্রাণী।

বিবেকানন্দ কথা বলতে পারেন না। উচ্ছ্বাসেব বশে বেফাঁস কথা বলার জন্য অপ্রস্তুত হতে হল। বললেন : হৃদয়তীর্থে কত যাত্রীব পদচিহ্ন পড়েনি আমার অন্তঃকরণে সেটা আমি জানি। এটা আমার দোষ। তুমি আমার ধীরা মা। যেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না সেখানে রেখো তোমার অমিয় দৃষ্টি। তোমার মর্ম-মন্ত্র। আমার যা মন্ত্র, তারই মর্ম-তুমি। আমি বাক্য তুমি ব্যাখ্যা। আমি ভাষা তুমি ভাষ্য।

বাগবাজাবের ঘাট থেকে নৌকো করে ওরা বেলুড়ে রওনা হল। তখন অপরাহ্ণ। স্বামীজি ওদের সঙ্গী হলেন। বিদেশিনী শিষ্যরা চক্রাকারে ওঁকে ঘিরে বসেছিল।

স্বামীজি প্রথম থেকেই ভীষণ মৌন। তাঁর শান্ত, সৌম্য নির্বিকার ধ্যানসমাহিত ধীর-স্থির ভাবটি বড় ভাল লাগে মার্গারেটের। বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎই হৃদয়ে বাঁধা পড়ে যায়।

নৌকাতে সকলেই স্তব্ধ। নরম রোদে গাঢ় সবুজ টিয়ার ঝাঁক এপার থেকে ওপার উড়ে গিয়ে অশ্বত্থের ডালে বসল।

পাল তোলা নৌকা রাজহংসীর মত গর্বিতভাবে চলেছে। সামনে অন্তহীন জলরাশি, মাথার ওপর বিপুলব্যাপ্ত নীল আকাশ। সব মিলিয়ে সেই অনন্ত মহিমার কাছে নিজেকে নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। মনে হল অনেক অনেক দূর থেকে কে যেন তাকে দিয়ে বলাল : শ্রীমার গৃহখানি আগা-গোড়া মায়ের মমতা দিয়ে মোড়া। প্রাণটা ভরে যায়। ভেতরটা কেমন মহৎ আর শুদ্ধাত্মা হয়ে ওঠে। তখন মায়ের এই সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না।

মার্গারেট বেশি করে তার মুগ্ধতাব কথা বলতে লাগল। ম্যাকলাউড ওর কথার কাঠামোর ওপর আস্তে আস্তে কথা বসাল সাবধানে। শ্রীমার ভালোবাসা বড় স্নিগ্ধ। অসীম মাধুর্যে ভরপুর তাঁর অন্তঃকরণ।

খুশির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল মিসেস বুল। কণ্ঠস্বরে তার মুগ্ধতা। মা খুবই স্নেহশীলা, করুণাময়ী। মূর্তিমতী শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা। হাসি-খুশিতে সর্বদা ঝলমল করছেন। সারা আমেরিকা খুঁজলে এরকম একজনও মহিলা মিলবে না। উনি অনন্যা।

নিজের মনের খুশিতে ডুব দিয়ে ম্যাকলাউড বান্ধবী মার্গারেটের দিকে একবার তাকিয়ে সকৌতুকে মিসে বুলের কানে ফিস ফিস করে বলল : মার্গো তো মায়ের আদরের খুকী। মা'র সোহাগ পেয়ে তো খুকী আহ্লাদে আটখানা। মার কোলে তার আদর খাওয়ার দৃশ্যটা স্বামীজিকে দেখানোর জন্য মায়ের একজন সেবিকাকে বলল, ওঁকে একবারটি আসতে বল মা। বল না, নইলে রাগ করে আমি উঠে যাব। সেই কথা শুনে মা তো হো হো করে প্রাণ খুলে হাসলেন। সেই সরল অকৃত্রিম কৌতুকময় হাসি কী পবিত্র বল তো?

মিসেস বুল ওর হাসিতে যোগ দিয়ে জোরে জোরে সম্মতিসূচক মাথা আন্দোলিত

করতে লাগল। মার্গারেটের ফর্সা মুখখানা লজ্জায় এবং তীব্র ভালোলাগার রঙে রক্তিম হয়ে গেল। পাছে স্বামীজি ব্যাপারটা দেখে ফেলে তাই একটা বিব্রত লাজুকভাবে সে আড়ষ্ট হয়ে রইল। ম্যাকলাউডকে মৃদু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্বামীজির দিকে মুখ করে বসল। বিবেকানন্দের মুখোমুখি বসতে দীপশিখার মত কেঁপে উঠল সে। নিজেকে প্রশ্ন করল-এতে অন্যায় কী হয়েছে?

ধীরা মা স্বভাবসুন্দর ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বলল : বোকা মেয়ে। লজ্জা পাওয়ার মত কোনো কথাই নয়। মেয়েদের এ ধরনের লজ্জার মানেটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়।

মার্গারেট অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে স্বামীজিকে দেখার চেষ্টা করল। ওঁর মুখের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, যা তার চোখের মণি দুটোকে শান্ত থাকতে দেয় না। ঐ চোখ দুটোর ওপর চোখ পেতে রাখলে একটা আশ্চর্য সুখে টৈটুম্বুর হয়ে যায় তার ভেতরটা। স্বামীজির শান্ত দৃপ্ত স্থির নয়নযুগলের তীব্র আকর্ষণে যৌবনধন্য জীবনের সব কামনা বাসনাকে মিথ্যে করে দিয়ে সুদূর লন্ডন থেকে ছুটে এসেছে। প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় আর স্বপ্নে ওই নয়নদ্বয় তাকে অনুসরণ করেছে। ওঁকে ছেড়ে মার্গারেট কোথায় যাবে?

বিবেকানন্দ নৌকার পাটাতনে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। বিদেশিনীদের কোনো কথাতেই তাঁর মন ছিল না। কিছুই শুনছিলেন না তিনি। মার্গারেটের কথাই গভীর করে ভাবছিলেন। মিস নোবলের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের মধ্যে কি যে তন্ন-তন্ন করে খুঁজছিলেন তিনিও ভালো করে জানেন না। নোবলের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের মধ্যে স্মৃতির রোমন্থন চলেছিল। বারংবার মনে হচ্ছিল, তাঁর সঙ্গে মিস নোবলের দেখা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু ঘটেছে তার মধ্যে কোথাও একটা গভীর যোগসূত্র আছে। একটি সূত্রে তার মালা গাঁথা হচ্ছিল যেন।

হঠাৎই বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিবেকানন্দ নিজেও একটু চমকালেন, আর তখনই দেখলেন মার্গারেট কী উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা নিয়ে তাঁর মুখপানে চেয়ে আছে। তাঁর কিছু বলার আগেই মার্গারেট জিজ্ঞেস করল : অমন করে আপনার শ্বাস পড়ল কেন? কী হয়েছে?

বেশ একটু বিব্রত হয়ে বললেন : সন্ন্যাসীর কী একটু জোরে শ্বাস ফেলতেও নেই।

আমি কী তাই বলেছি। সাধারণ দীর্ঘশ্বাসের মত স্বাভাবিক হলে তো কথাই হত না।

আরে বাবা, সন্ন্যাসীও তো মানুষ। তাঁরও কিছু নিজস্ব দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, যন্ত্রণা হাহাকার থাকতে পারে। থাকেও। আমি তো সংসার পলাতক সন্ন্যাসী নই। সকলের মধ্যে সকলের সঙ্গে আছি। তাই তো মানুষের বিষ সন্দেহ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা থেকে মুক্ত নই। একজন নির্লোভ, স্বার্থহীন সন্ন্যাসীরও শত্রু আছে। কত সমালোচনা

কত নিন্দে, কত কুৎসা আমাকে শুনতে হয় জান? যে দেশবাসীর কাছে আমার ভালোবাসা পাওয়ার ছিল তারা আমায় গালমন্দ ছাড়া কিছুই দিল না। আর যাদের কাছে কোনো দাবি নেই, প্রত্যাশা নেই—সেই বিদেশ বিভূঁয়ের মানুষেরা আমার দুর্দিনের বন্ধু হল। তারা আমাকে সম্মান, সমাদর করে ধন্য করে দিল। হতাশায় ব্যর্থতায় যে মানুষটা একেবারে ফুরিয়ে গেছিল সেই মানুষটাকে তারা ভারতের সন্ন্যাসীর মর্যাদা দিল। দু'হাত ভরে অর্থ দিল। মার্গারেট, আমার একটা চরম সংকট সময়ে তোমাদের মত মহীয়সী মহিলাদের সান্নিধ্য, দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা না পেলে এজীবন মরুভূমি হয়ে যেত। আজকের স্বামী বিবেকানন্দ তোমাদের পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। প্রাচ্যের কোনো অবদান নেই। বরং শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে আমার সাফল্যের গৌরব তৃপ্তিকে মলিন করে দেওয়ার জন্যই ভারতীয়রা এবং বাঙালীরা আমাকে নিয়ে কত নোংরা কথা বলেছে। কুৎসার বিষ কানে ঢেলে দিয়ে আমার অনুরাগী ভক্তবৃন্দের মন বিষিয়ে দেবার এক বিচিত্র খেলা খেলেছে। সেই সময় তোমাদের দেশে সকলের চোখে আমি এক আদর্শ পুরুষ। ভারত বিদ্যার উজ্জ্বল আলো পড়ে তোমাদেব অন্তর আলোকিত হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে তোমাদের মাতামাতির অন্ত ছিল না। তোমাদের দেশ যখন ভাবের বন্যায় ভেসে গেছে তখন আমাব দেশে ভাটার টান। ওই ঢেউ একদিন পৌঁছল অনেক জল ঘোলা করে। কেন জানি না হঠাৎই সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। তোমাদের মত বড় মনের বিদেশিনীদের মহত্ত্ব, উদারতা, ভালোবাসা যদি না পেতাম, তাহলে কোথা থেকে আসত মঠ-মন্দিরের টাকা? কর্মের এত প্রেরণাই বা দিত কে? পাশ্চাত্যের কাছে আমার এ ঋণ কোনোকালে ফুরোবে না। এই মঠ-মন্দিরের সঙ্গে তোমাদের দানের মহিমা, নিঃস্বার্থ কর্মের গৌরব চিরন্তন হয়ে থাকবে।

ধীরা মা এবং জয়া উভয়েই ওঁর আবেগমথিত কণ্ঠস্বর শুনে থ হয়ে গেল। অভিভূত আচ্ছন্ন দু'চোখের চাহনিতে কেমন একটা নিবিড়তা ফুটে উঠল। জো (জয়া) থমথমে গলায় বলল : স্বামীজি এখানে এসে অবধি তোমাকে এত খুশি হতে দেখিনি। আজ মনে হচ্ছে তোমার সব চাওয়া যেন সব পেয়েছিতে পরিণত হয়েছে।

তুমি ঠিক বলেছ। আমার হাতে গোনা খুশির দিনের সংখ্যা একটা বাড়ল আজ। শ্রীমা তোমাদের আপনার করে নিয়েছেন এর চেয়ে আনন্দের খবর হয? মার্গারেটের মত মেয়েকে আদর করে 'আমার খুকী' বলে ডেকেছেন একী কম কথা? আমার নিজের মনেই কত সংশয়, ভয়, উৎকণ্ঠা ছিল জান? মা, আমার সংস্কারমুক্ত উদার, মহৎ, এক মহামানবী। তবু সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে ছিলাম।

অবোধ চোখ দুটি বিবেকানন্দের চোখের ওপর মেলে ধরে জো বলল : কিসের ভয়?

মানুষের মন তো? মনের ওপর কারো হাত নেই। নিয়ন্ত্রণ হাবিয়ে মন যে কখন কী করে বসে মানুষ নিজেও জানে না। অমন যে মহাযোগী শিব তাঁরও চিত্ত চঞ্চল

হয়। তাই যতক্ষণ জয় সম্পন্ন না হচ্ছে ততক্ষণ ভয় তো থাকেই।

মার্গারেটের কণ্ঠস্বর তিরস্কারের মত শোনাল। বলল : আপনার বিশ্বাসের সেই জোর কোথায় গেল?

হারিয়ে ফেলিনি, আমার ভেতরেই আছে। প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরেই একদিন আমেরিকায় যেতে পেরেছিলাম। বিশ্বধর্ম সভায় আমার মত অনাহূতের কণ্ঠে ভারতের নাম গৌরব নিন্দুকেরা সহ্য করতে পারল না। সবার চোখে আমাকে ছোট করার জন্য বলল : নরেনটা অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে। নিজের সাফল্যে এত গর্বিত যে গুরু রামকৃষ্ণের নামটা পর্যন্ত মুখে আনল না। বিশ্বাস কর মার্গারেট, তারা আমার মনের কথা জানত না। ঠাকুরের নামের মহিমা প্রচারের যোগ্যতা আমার কতখানি সেটা না জানা পর্যন্ত কী করে তাঁর নাম করি? সম্মান দেখাতে গিয়ে যদি অসম্মান করি, যদি তাঁকে ছোট করে ফেলি সবার চোখে এই আত্মবিশ্বাসের অভাবে আমি তাঁরে নামোচ্চারণে সাহস পাইনি। একে আমাব ভীরুতা বলবে কি? জানো মার্গারেট, জীবনে আমার কোনো কাজ সোজা পথে সহজভাবে হয়নি। অনেক বাধা-বিপত্তির নদী পাহাড়, প্রান্তর অতিক্রম করে, বহু দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণার উপল উপত্যকা পেরিয়ে যে মানুষ পায়ের তলায় একটু মাটি পেয়েছে কি পায়নি বলে নিশ্চিত হতে পারছে না সে আতঙ্কমুক্ত হবে কী করে? অদৃষ্ট আমাকে কিছুই দেয়নি। শুধুই পুরুষকার সম্বল করে কর্ণের মত কুরুক্ষেত্রের মহারণে ভাঙা রথের চাকা নিয়ে দৈবের সঙ্গে লড়ছি। এ লড়াইতে আমার ভেতরটা ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্তাক্ত। আমার শরীরের জোর কমে আসছে। মন চাইলেও শরীর পারে না। তবু স্বপ্নের নেশায়-মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছি। ঐ মরীচিকা আমার প্রাণের ঠাকুরের সৃষ্টি।

ধীরা মা বলল : স্বামী তোমার মনটা আজ ভালো নেই।

না মা, মনটা আমার ভীষণ ভালো আছে। বড় আনন্দের দিন আজ। শক্তিস্বরূপিনী শ্রীমার মত নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা তোমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে, তোমাদের সঙ্গে একসাথে বসে আহার করে যে দুঃসাহস দেখালেন সে যে কত বড় বিপ্লব, কী সাংঘাতিক বিদ্রোহ এই পচাগলা সমাজের বিরুদ্ধে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আনন্দে তা তা থৈ থৈ করে নাচছে আমার ভেতরের নটরাজ। তাঁর এক পা অতীতে এক পা বর্তমানে। গঙ্গার লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের কল্লোল মহাকালের পায়ের নূপুর হয়ে বাজছে আমার রক্তের কল্লোলে। মার্গারেট, তাঁর নির্দেশ এসে গেছে। মা তাই ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন। তাহলে আর দেরী কিসের? ভয়ই বা আমার কাকে? শীঘ্রই তোমার দীক্ষার আয়োজন করব। তুমি প্রস্তুত হও।

মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেছিল মার্গারেট। মনে হল, বুকের ভেতর দাঁড়িয়ে যেন রাজা অনেকদূর থেকে তার দিকে দু'হাত মেলে দিয়ে ডাকছে - মার্গারেট প্রস্তুত হও। সামনে-পিছনে না তাকিয়ে জয় কালী বলে ঝাঁপ দাও। মুগ্ধ-দুটি চোখে ও মুখে তার অদৃশ্য কোন দেবতার কাছে আত্মনিবেদনের এক বিনম্র আকৃতির ভাব ফুটে

উঠল। চোখ দুটো বুজে গেল গভীর ভাবাবেশে। নিজের মনে বলল : আজকের দিনটা খুবই শুভ। এই দিনে মহাত্মা সেন্ট প্যাট্রিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হয় তো বা তারই চুম্বক আকর্ষণে শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎটা সর্বাঙ্গসুন্দর হল। এক পবিত্রতা আর এক পবিত্রতা পরশ পাথর হয়ে উঠল। একি কম কথা!

উৎফুল্ল হয়ে বলল : ধীরা মা, কী কাণ্ড বলতো? জো কী আশ্চর্য সমন্বয় বলতো। এই দিনেই শ্রীমা বিপ্লবের বিদ্রোহের পতাকা তুলে দিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে।

মার্গারেটের বুকে সমুদ্রের কল্লোল। উৎসাহিত হয়ে বলল : সব মিলিয়ে একটা day of days আমার। লাল কালিতে মোটা করে লেখা থাকবে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে।

ঠিক বলেছ মার্গারেট। এই শুভদিনেই তুমিও প্রাচীন, তপোবৃদ্ধ ভারতবর্ষের কোলে আশ্রয় পেলে। এদেশের সেবাকার্যে সত্যই যদি তোমাকে আত্মোৎসর্গ করতে হয় যদি এই দীন দরিদ্র ভারতভূমিকেই একান্ত আপন বলে গ্রহণ করতে চাও — তবে সর্বতোভাবে এদেশের আচার. প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার, ঐতিহ্যের সঙ্গে অভিন্ন হযে একাত্ম হয়ে তোমাকে মিশে যেতে হবে। ভালো-মন্দ মিশিয়ে, দোষে-গুণে জড়িয়ে এদেশ ঠিক যেমনটি, তেমনটি জেনেই সমগ্র অন্তর দিয়ে, মন প্রাণ দিয়ে একে ভালোবাসতে হবে তোমাকে।

মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল মার্গারেটের চেতনা। মনে হল, বুকের ভেতর দাঁড়িয়ে রাজা যেন আহ্বান করছে তাকে। বড় বড় নীল চোখ দুটি কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে দূরাগত মন্ত্রধ্বনির মত সে শুনতে লাগল বিবেকানন্দের কথাগুলো।

মার্গারেট, ভাবে ও চিন্তায়, পোশাকে ও পরিচ্ছদে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে উঠতে হবে। সুপ্রাচীন এই বিশাল উপমহাদেশই হবে এখন থেকে তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী, জননী জন্মভূমি। আমার এদেশের নারীশিক্ষার দুর্গম পথে যদি অগ্রসর হতে চাও, তবে হিন্দুবিধবার নিষ্ঠাপুত ব্রহ্মাচারিণী জীবন তোমাকে যাপন করতে হবে। প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে হবে প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুরমণীর রক্তে যে সংস্কার, বিশ্বাস, সতীত্বের যে নির্মল আদর্শ সংস্কারগতভাবে তার মনে নিহিত, সে ভাস্বর-আদর্শটি তোমার জীবনেও দেদীপ্যমান হওয়া চাই। তবেই তাদের একান্ত আপনজন হয়ে তাদের প্রাণে আত্মদীপ জ্বালতে সমর্থ হবে। ব্রত ও দীক্ষার বাঁধনে তোমাকে বাঁধার আগে সারদা মায়ের এই আশীর্বাদটুকু পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আশা করব আমার এ প্রস্তাব সর্বন্তঃকরণে গ্রহণ করবে। তুমি প্রস্তুত তো মার্গো?

মার্গারেট নীরবে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। বিড় বিড় করে নিরুচ্চারে বলল: রাজা তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। আমাকে শুধু তোমার করে নাও। তোমার দেশে আমার নবজন্ম হোক।

প্রতিদিন সকালে বিদেশিনী তিন শিষ্যার সঙ্গে বিবেকানন্দ একবার দেখা করবেনই। বেশ কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে তারপর চলে যান। এই সময়টা মূলত ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম, ইতিহাস প্রসিদ্ধ নদ-নদী, গাছপালা প্রভৃতির সঙ্গে হিন্দুদের বিশ্বাস ও সংস্কারের সম্পর্ক নিয়ে কতরকমের গল্প বলেন স্বামীজি। কোনো সময়েই সে সব গল্প একঘেয়ে ক্লান্তিকর হয় না। বরং বলার চমক এবং এক অনাবিষ্কৃতকে জানার আকাঙক্ষায় তাদের দুই চোখ জ্বলজ্বল করত।

রোজকার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল সেদিনও। কিন্তু একেবারে অন্যভাবে গঙ্গার দিকে মুখ করে একটি ডেক চেয়ারে বসলেন বিবেকানন্দ। আর তাঁর সামনে বসেছিল মার্গারেট। প্রিয়তম নোবলের দিকে তাকিয়েই ফিক্ ফিক্ করে মজার হাসি হাসছিলেন। তাঁর হাসির কোনো কারণ ছিল না। তবু মার্গারেটের দিকে তাকিয়েই তিনি হাসছিলেন। মার্গারেট তাঁর কৌতুক বুঝতে না পেরে বেশ একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। লজ্জায় রক্তিম হল তার মুখমণ্ডল। স্বামীজি যেন তাতে আরো বেশি মজা পেলেন। মিসেস বুল ওভাবে তাঁকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে বললেন : আচ্ছা স্বামী আপনার হলোটা কী? বিনা কারণে অমন করে হাসার কী আছে? মিস নোবলের দিকে তাকিয়ে এভাবে অসংকোচে চেয়ে থাকার কোনো কারণ আছে?

তাঁর কথায় বিবেকানন্দের আত্মসচেতনতা ফিরে এল। অসংকোচে বলল : ধীরা মা, কালকের একটা কথা মনে করে শুধু হাসি পাচ্ছে। শ্রীমায়ের কাছ থেকে আসা থেকে একটা আনন্দ আমাকে পেয়ে বসল। খুক খুক করে একটা হাসি ভিতর থেকে ক্রমাগত উঠে আসছিল। এখনও তার রেশ কাটেনি। কিন্তু কেন যে পাগলের মত হাসছিলাম নিজেও জানি না। এত আনন্দ হচ্ছিল যে একসময় আমি বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে ধেই ধেই করে নাচা শুরু করে দিই। আমার সে আনন্দ আর বুকে রাখা যায় না। নটরাজের মত তা তা থৈ থৈ করে নাচছি মহানন্দে। হাসি আর আনন্দের তরঙ্গে দুলছে আমার শরীর। মনের ভিতর গুন গুন করছি — কী আনন্দ আমার!

ম্যাকলাউড বলল : আপনার আনন্দের একটা কারণ অবশ্যই ছিল।

স্বামীজি বেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল : কারণটা কী হতে পারে বলত?

কারণটা জানলে হাসির আনন্দের আর মজা থাকত না।

মজাটাই যখন মাটি হয়ে গেল তখন আর জানাতে দোষ কি?

ম্যাকলাউড এক নিঃশ্বাসে বলল : এ হল জয়ের আনন্দ। আমাদের কাউকে নয় কেবল মার্গারেটকেই ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি রামকৃষ্ণের সেবা আদর্শ ও ভক্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। বোধ হয় রামকৃষ্ণ আন্দোলনকেও এক নতুন মাত্রা দিলেন। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল নামক যে পুষ্পটি পাশ্চাত্যের বাগিচা থেকে আহরণ করে আনলেন তা গুরু রামকৃষ্ণের পদতলে অর্পণ করে আপনি ঠাকুরের দেখা স্বপ্নকে সার্থক করলেন; এহল তারই আনন্দ।

নিজের সঙ্গে নিজের মহাকৌতুক।

ম্যাকলাউডের কথাগুলো স্বামীজির ভীষণ ভালো লাগল। দু'চোখের তারায় আগ্রহের দীপ জ্বেলে বললেন : সব ঠিক আছে কিন্তু কৌতুক বলছ কেন? এর মধ্যে কৌতুকের কি দেখলে?

ঠাকুরের ইচ্ছেগুলি কোনো সত্যমূল্য পাবে কি না আপনিও জানতেন না। ঠাকুরের দেহান্ত হওযার পর তীব্র সংকটের মধ্যে আপনার দিনগুলো কেটেছে। দুঃসহ বিষাদে হতাশায়, নৈরাশ্যে নিজেকে শুধু ছিন্ন ভিন্ন করেছেন। কোনোদিন যে এ থেকে মুক্ত হয়ে একবুক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মনের আকাশে ডানা মেলে দিতে পারবেন, নিজেও বোধ হয় জানতেন না। তাই বলছিলাম, সেই অতীতের সঙ্গেই যেন আপনার সাফল্য ও প্রাপ্তি কৌতুক করছিল।

স্বামীজি অবাক হয়ে গেলেন। বিদেশিনীদের দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললেন : মহাভাগ্যবান আমি। তোমাদের মত এমন শিষ্য পাওয়া কজন সন্ন্যাসীর ভাগ্যে হয়! তোমাদের আসার বারো বছর আগে আমার গুরু দেহ রেখেছেন। তিনি নেই কিন্তু তাঁর উপস্থিতি তোমাদেব সকলের মধ্যেই আছে। একী কম বড় পাওয়া! তারপর মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে জিগ্যেস করলেন : তোমার কী মনে হয়?

মার্গারেট তার অপ্রস্তুতভাবটা দ্রুত কাটিয়ে উঠে বলল : আমার আরাধ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে আমি দেখেছি, জেনেছি এবং তাঁর কথা শুনছি। তিনি আমার পাশে সর্বদা আছেন এবং থাকবেন এই আশ্বাসে আমি প্রত্যয়বান। আমি এসেছিও তাঁর ডাকে। তাঁর কাজের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে শক্তিশালী করার ব্রত আমার। বামকৃষ্ণ যদি হন বিপ্লব, স্বামীজি হলেন তাঁর বিপ্লবী সন্তান। রামকৃষ্ণ যেখানে থেমে গেছেন, আমার গুরু বিবেকানন্দ সেখান থেকে শুরু করেছেন। আমি তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞের একজন ব্রতধারী ঋত্বিক। আমার কাজ হল আদেশ পালন করা, আদেশ করা নয়। গুরুই আমার সব।

মার্গারেটের কথায় প্রকাশ পেল স্বামীজির প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা। কিন্তু স্বামীজিব কোনো কথাই মার্গারেটের কাছে কৃতজ্ঞতা ও তার প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধাকে প্রকাশ কবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি নীরব হয়ে বইলেন। তাঁকে কিছু বলাব ছিল না যেন। প্রশ্নেরও কিছু ছিল না। তাই আস্তে আস্তে ডেক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আট

ব্রহ্মচর্যের দীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার মনের মধ্যে নানারকম ভাবনা-চিন্তার বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল। কোনো চিন্তাই দীর্ঘস্থায়ী নয়। এক চিন্তার অবসান হতে না হতে আর এক চিন্তা এসে পড়ে। এ পর্যন্ত যে সব বিদেশী শিষ্য ও শিষ্যারা এসেছে তাদের কাউকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেওয়ার কথা মনে হয়নি তাঁর। লন্ডনের সেভিয়ার দম্পতি, মিসেস মুলার অনেক আগেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বিবেকানন্দের দ্বারা দীক্ষিত নন। নিজেদের মনের প্রয়োজনে এঁরা হিন্দু হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মে কোনো সীমারেখা নেই। এর সবটাই খোলা। একেবারে আকাশের মত উন্মুক্ত, প্রকৃতির মত উদার। অন্য ধর্মমতের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। একমাত্র হিন্দুধর্মই পৃথিবীর সব জাতি, সব ধর্ম, সব সভ্যতার কাছে নির্ভয়ে, অসংকোচে নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বভারতীয় এবং সার্বভৌম জীবনদর্শন গড়ে তুলতে কোনো সন্দেহকে এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। প্রতিটি পরিস্থিতি থেকে এক নতুন উপলব্ধি ঘটেছে। পৃথিবীর কোনো ধর্ম এত সহিষ্ণু এবং প্রগতিশীল নয়। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম প্রতিদিন নতুন হয়ে উঠেছে। স্বামীজির হাতে তা এক নতুনমাত্রা পেল। যে যাগ-যজ্ঞ পূজার্চনা, দীক্ষা, উপনয়ন প্রভৃতির কাজ এতকাল ধরে ব্রাহ্মণেরা করে আসত তার অধিকার থেকে স্বামীজি বঞ্চিত করলেন তাদের। মনুর সামাজিক বিধি-বিধান ভেঙে রামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে বেলুড় মঠে কয়েকজন শূদ্রকে উপবীত দিয়ে ব্রাহ্মণত্ব দিলেন। জন্মার্জিত ব্রাহ্মণত্বের অধিকার

খারিজ করে দিল রাজা। এবার তাকে দীক্ষা দিয়ে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কাজটা আরো একধাপ এগিয়ে দেবেন। বিবেকানন্দের পৌরুষের এই অনমনীয় দৃঢ়তা এবং তেজকে মার্গারেট শ্রদ্ধা করল। এরকম একটা বীরোচিত কাজকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করার একধরনের উন্মাদনা তার মধ্যেও ছিল।

গঙ্গার ঘাটের দিক থেকে সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছিল।

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বলছেরে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই
কারু যেতে মানা নাই।
ডাকছে বাঁশী—আয় পিপাসী, জয় রাধা নাম গান করে।

গানের কথাগুলো কান খাড়া করে শুনল মার্গারেট। ভক্তির আবেগে আত্মহারা হয়ে গাইছিল গায়ক। কিন্তু ঐ কণ্ঠের স্বর, সুর সব তার চেনা। এ হল তার হৃদয়ের রাজার গান। অমনি এক অনির্বচনীয় আনন্দ শিহরনে তার বুক প্লাবিত করে গেল। এইসব গানের মধ্যে এমন একটা মাধুর্য আছে যে তার অপার্থিব ভাবরাশি তার মনেও সংক্রামিত হয়ে গেল। মনের সে অনুভূতিকে ডায়েরির পাতায় লিখল :

'One form and back and forth acros our tiny stage; one voice compassed all the players ; and the play that was acted before us was the love of the soul for God!...Till we too caught the kindling, and loved for the moment with a fire that the rushing river could not put out nor the hurricane disturb.

Shall many, waters quench love, or the floods overwhelm it?...

And before Prometheus left us, we knelt before him together and he blest us all.

আর একটা দিন মাত্র বাকি আছে। এই দিনটি ছিল তার সংযমের দিন। নিবম্বু উপবাস করে থাকতে হবে। সারাদিন মৌনব্রত পালন করতে হবে। কষ্টকর হলেও মার্গারেট খুব নিষ্ঠার সঙ্গে দিনটি উদ্‌যাপন করল।

ক্ষুধাক্লিষ্ট শরীর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে এভাবে নিজের ধর্ম-ঐতিহ্য, দেশ জাতিকে সে বিসর্জন দেবে কেন? কার জন্য এতবড় স্বার্থত্যাগ করছে? তার কাছে কী পেয়েছে সে? আগামী দিনগুলিতে তাঁর কাছে প্রত্যাশা করার কি বা থাকতে পারে তার? রাজা নিজেই সন্ন্যাসী। তার মনের সব তারগুলি সেই সুরেই বাঁধা। গুরুব সঙ্গে সত্যভঙ্গ হওয়াব মত কিছুই করবে না। তা-হলে কি জন্য সন্ন্যাসিনী হচ্ছে? সন্ন্যাসিনী হয়ে সে কী পাবে? তার লাভ কি? সব মানুষই সারা জীবন পথ চলে কোনো কিছু প্রত্যাশা নিয়ে। সমুদ্রে ভাসে তীরের প্রত্যাশা নিয়ে, পাহাড়ে চড়ে চূড়ো জয়েব উন্মাদনা নিয়ে। কিন্তু কিসের নেশায় সে সন্ন্যাসিনী হচ্ছে? তবে কি রাজার সমতলে নেমে আসার জন্য সন্ন্যাস নিচ্ছে? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা গায়ে কাঁটা দিল তাব। এক

অজ্ঞাত সুখ ও স্বস্তিতে তার হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল। হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু কী প্রার্থনা করবে, জানে না। এমন কোনো বাণী আছে যা দূরেও থাকে কাছেও থাকে? যেখানে না বলা বাণী পৌঁছয়? সেরকম কিছুই মনে করতে পারল না। কেবল নিরুচ্চারে উচ্চারণ করল যার নাম মনে হওয়া মাত্র হৃদয় চঞ্চল হয়, না জানি তার সান্নিধ্যে এই আনন্দ কত মধুর! রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : আমার গুরুর হাতে পরশপাথর দিয়েছ আমাকে জাগাবে বলে? যদি তেমন ইচ্ছে থাকে তবে দিও। আমার হাতে অরূপরতন দিও — আমাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না।

১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ। কিছুক্ষণ পরে মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেবেন বিবেকানন্দ নিজে। দীক্ষিত করার আগে মার্গারেটের অভিমতটা পরিষ্কার করে জানা দরকার মনে হয়েছিল বিবেকানন্দের। সর্বস্ব ত্যাগের জন্য মার্গারেট কতখানি প্রস্তুত, অথবা আদৌ প্রস্তুত নয় কিংবা কোনোরূপ দ্বিধাগ্রস্ততা আছে এসব জানার জন্য বিবেকানন্দ তাকে একান্তে ডেকে বললেন : মার্গারেট, তুমি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত তো?

মার্গারেট ছোট্ট করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বিবেকানন্দের মনে হল, মার্গারেট যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত নয়। অনেকটা মুখ বুজে মেনে নেওয়া গোছের একটা ব্যাপার। তাই তিনি প্রশ্নটা সরাসরি করলেন : ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা তোমার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তো!

মার্গারেটের দুটি চোখ উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসে বাঙ্ময় হল। পালটা প্রশ্ন করল, আমার বিচার বুদ্ধির ওপর আপনার সংশয় জন্মাল কেন? আমি কি একতাল মাটি যে, আমাকে ইচ্ছেমত ভাঙবেন চুরবেন।

বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর কঠিন আদেশের মত শোনাল। এখনও তুমি ভাবতে পারছ না কিন্তু দীক্ষিত হওয়ার পর তোমার নিজের বলে কিছু থাকবে না। এমন কি তোমার অতীতও মুছে যাবে। তোমার যা কিছু নিজের সবই তুলে দিতে হবে গুরুর হাতে। পারবে তো?

মার্গারেটের ভেতরটা বিদ্যুৎ চমকানোর মত চমকাল। মনটা বিদ্রোহে ফুঁসে উঠল। নিরুচ্চারে নিজেকে প্রশ্ন করল কোন দুঃখে সব হারিয়ে, সব ঘুচিয়ে গুরুর কাছে একটা পোষমানা জীব হতে যাবে? অনুগত ভৃত্যের মত জীবনযাপনের সুখ কী? মার্গারেটের সংকল্পে টান ধরে। স্বামীজির প্রশ্নের কোনো উত্তরই তার জানা নেই। নিজের মনের অতলে ডুবে গিয়ে সে উত্তর খুঁজতে লাগল।

দীক্ষিত হওয়া মানে কাজের অধিকার অর্জন করা। কোনো একটি বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে দেবতাকে সাক্ষী রেখে সংকল্প পালনের ব্রতের নামই দীক্ষা। ভারতের নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে, তাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিকাশের জন্য নিজেকে নিবেদন করতে এসেছে। তাহলে গুরুর নির্দেশ মানতে বাধা কোথায়? নির্মল

আত্মদানের স্বমহিমায় এক নতুন মার্গারেট জন্মগ্রহণ করবে দীক্ষান্তে। সে কি কম কথা! কাজে ব্রতী হলে অনেক কিছু সইতে হবে তাকে বইতে হবে একা। বিবেকানন্দ কার্যত কিছুই চাইছে না তার কাছে। শুধু মনপ্রাণ নিবেদন করে আত্মোৎসর্গ করতে বলছে। সেই আত্মোৎসর্গ যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তাহলে এতে ভয় পাওয়া কী আছে তার?

মার্গারেট কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়েছিল। তার থমথমে নীল দু'চোখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিবেকানন্দ নির্মোহ কণ্ঠে বললেন : মার্গারেট দীক্ষার পর নিজেকে তোমার শূন্য মনে হবে। অনেক কিছু হারিয়ে যেন মুহূর্তে নিঃস্ব হয়ে গেছ। তোমার হারানোর শূন্যতায় মনটা ভীষণ হাল্কা হয়ে যাবে। মনে হবে, মাটিতে তোমার পা নেই, শূন্যে ভাসছ।

লাজুক দুটি চোখ গুরুর চোখের উপর চোখ রেখে অপরাধীর মত বলল : আমার সংকল্পকে দুর্বল করে দেবেন না।

মার্গারেট, ভাবাবেগে আজ যা সত্য মনে হচ্ছে, কাল তা মিথ্যে হতে পারে। আত্মপ্রতারণার আগে নিজেকে ভালো করে যাচাই করে নাও।

মার্গারেট দৃঢ় কণ্ঠে বলল : নতুন করে বলার বা ভাবার কিছু নেই। আপনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। আমি প্রস্তুত।

বিবেকানন্দ বললেন : যদি তুমি ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ কর তবে তোমাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবেই চলতে হবে। আহারে-বিহারে পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যাবহারে কথাবার্তাতেও তোমাকে হিন্দুভাবাপন্ন হতে হবে। তোমার ওপর যখন মেয়েদের শিক্ষার ভার দেব, তখন তাদের সমতলে নেমে, তাদের ভাবনাচিন্তা ধ্যানধারণার সঙ্গে মিলিয়ে তোমার শিক্ষাপদ্ধতি স্থির করতে হবে। শুধু তাই নয়, তোমাকে হিন্দুবিধবার মতই নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হবে। এসব আগেও বলেছি। ভেবে দেখ, পারবে তো?

মার্গারেট স্থির প্রশান্ত। তাকে দিয়ে কী কঠিন পণ করিয়ে নিচ্ছেন গুরু। এতদিন গুরুর কাছ থেকে কবে কাজের নির্দেশ আসবে শুধু তারই প্রতীক্ষা করছিল। আজ সেই কাজের পূর্ণ সুযোগ এসেছে এক অভিনব শর্তে। জীবনে কোনো কাজে মার্গারেট পিছু হটেনি। একবার যা মনে হয়েছে তাকেই সম্পন্ন করে ছেড়েছে। আজ তাহলে মনের মধ্যে এত সংশয় কিসের? কেন এ দ্বিধা? মুহূর্তে আত্মসচেতনতা ফিরে এল মার্গারেটের। অকম্পিত গলায় বলল : আমি সব পারব। যেখানে ভুল হবে সেখানে গুরুই আমার পথ দেখাবেন।

সবিস্ময়ে বিবেকানন্দ বললেন : ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা গার্গী, মৈত্রেয়ী হবে তোমার জীবনের আদর্শ। তাঁদের কথা তুমি আগেই শুনেছ। কিন্তু এখন নিজের জীবনে পালন করে প্রমাণ দিতে হবে তার বাস্তবতার। দেহজ্ঞান বিরহিতা তপঃসিদ্ধ শবরীর কাহিনীও তুমি শুনেছ। গুরুর আদেশে নিজের যৌবনোচ্ছল দেহ তাপসী শর্বরী

কীভাবে বিনষ্ট করেছিল তাও তুমি জান। গুরুর নির্দেশমত রামাচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কী ধৈর্য ধরে সে অপেক্ষা করেছিল এসব তুমি জান। তারপর দর্শনলাভ যখন হল তখন নিজেকে আহুতি দিল। জন্মদুঃখিনী জনকনন্দিনী সীতার আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, শুচিতা এবং তার অকলঙ্ক চরিত্র মহিমার মধ্য দিয়েই যথার্থ ভারতবর্ষকে চেনা যায়। ভারতাত্মার পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করা যায়। অমৃতের উদাত্ত আহ্বানে ভারতীয় নারীকুল যুগেযুগে নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন—উৎসর্গ করেছেন নিজেদের। ভারতের প্রতি গৃহে তুমি তাদের দেখতে পাবে। তুমি কি তাদের মত হতে পারবে?

মার্গারেট দৃঢ় কণ্ঠে বলল : মানুষ হয়ে যদি তারা পারে আমিও পারব। নিশ্চয়ই পারব।

মার্গারেটের কণ্ঠস্বরে কোনো সংশয় কিংবা দ্বিধা ছিল না। বিবেকানন্দ একমুহূর্ত থেমে বললেন : কেল্টিকের রক্ত তোমার গায়ে। ইংরেজি শিক্ষার অহঙ্কারও তোমার আছে। এসবও তোমাকে ত্যাগ করে মনেপ্রাণে, আচরণে ব্যবহারে একজন যথার্থ ভারতীয় হয়ে উঠতে হবে। কখনও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপক্ষে কথা বলতে পারবে না। এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তোমাকে।

এতে যদি আপনার সংশয় ঘোচে, তাহলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি আমি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিকে কখনও করুণার চোখে দেখব না। এ আমার ভারতবর্ষের সম্পদ ও ঐতিহ্য। একে আমি মায়ের মত আগলে রাখব।

স্বামীজি চমৎকৃত হলেন। মৃদু হেসে বললেন : আমি জানতাম তোমাকে হারাতে পারব না। আমার শর্তে তোমার সংকল্প টলবে না। আসলে বীরের জাত তোমরা। রক্তে তোমাদের যুদ্ধ জয়ের নেশা। বাধা-বিপত্তিকে গ্রাহ্য কর না। তবু বলি, ভিক্ষুণীর মত জীবনযাপন করতে হবে তোমাকে। সেজন্য প্রয়োজন পড়লে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে হবে। এককথায় ভারতবর্ষের জন্য তোমাকে সর্বসুখ ও আনন্দ জলাঞ্জলি দিতে হবে।

মার্গারেটের দৃপ্ত দুটি চোখ ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল করে গুরুর মুখের ওপর। অকম্পিত কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল : তাই হবে।

মার্গারেটের সংকল্পের নির্ভীকতা বিবেকানন্দকে আশ্চর্য করল। তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। হঠাৎই তার সাহসের দুর্জয়তা এবং সংকল্পের একাগ্রতা তাঁকে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন: জয় হল তোমার। আমার আর কোনো সংশয় নেই। একদিন তোমার মুখের প্রতিটি রেখায় আমার ধ্যানের মানসীকে দেখেছিলাম। আজ তার হাতেই আমার স্বপ্নের ভারতকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার সব দায়িত্ব অর্পণ করলাম। আমার জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ তোমাকে নিয়েই। তুমিই এর পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে ভারতের কোণে কোণে। মার্গারেট আজ থেকে তোমার জপের মন্ত্র

হোল ভারতবর্ষ। এছাড়া আর অন্য কোনো মন্ত্র তোমার নেই।

এক দিব্য আলোয় উদ্ভাসিত হল মার্গারেটের অন্তঃকরণ। অবশেষে সত্যিই মঙ্গলদীপ হস্তে বিবেকানন্দ এসে দাঁড়ালেন তার সামনে। অমনি চারদিক মধুময় হল।

আকাশ মধুর, বাতাস মধুর
মধুময় ধরে জল
এ যে গগনে মধু, ভুবনে মধু
মধুময় ধরাতল।

১৮৯৮র ২৫ মার্চ, শুক্রবার। স্থান নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়ি। দিনটি ঐতিহাসিক। খ্রীস্টানদের কাছে The Day of Annunciation ঐদিনই দেবদূত আবির্ভূত হয়ে ঈশা জননী মেরীকে জানালেন তাঁর গর্ভেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হবে অচিরেই। সেই শুভদিনটিতে মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করলেন স্বামীজি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবজগতের সমন্বয়ের সেই ছিল উষাকাল।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল। মার্গারেট গঙ্গাস্নান করে শুচিশুভ্র বস্ত্রে ব্রহ্মচারিণীর মত গাত্র আবৃত করে পূজার আসনে বসল। বিবেকানন্দ তাকে দিয়ে প্রথমে শিবপুজো করলেন। সেই অনুষ্ঠানে তার দুই বিদেশিনী বন্ধু মিসেস সারা বুল এবং মিস ম্যাকলাউডও উপস্থিত ছিল।

মার্গারেট যখন শিবপূজা করছিলেন তখন মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীরা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করছিল।

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
রুদ্র মত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম।

এক অপার্থিব মহাপ্রেমের পরিবেশ সৃষ্টি হল সেখানে। ভাবভক্তির নিরুদ্ধ আবেশে মার্গারেটের ভেতরটা ভরে যেতে লাগল। স্বামীজির কণ্ঠনিঃসৃত মন্ত্রধ্বনি দূরাগত কোনো প্রার্থনা সঙ্গীতের মত তার কণ্ঠে অনুরণিত হতে লাগল। মার্গারেট গুরুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করতে লাগল শিবপূজার মন্ত্র। স্তোত্রপাঠের সময় তীব্র একটা আবেগে মনেব ঘরে ঘরে আরতির দীপ জ্বলে উঠল। উৎসর্গের ঘণ্টা বেজে উঠল, আত্মনিবেদনের কাঁসর বাজাতে লাগল। অন্তরটা জ্যোতির্ময় এক সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। আর কেমন একটা মহৎ, উদার পবিত্র আত্মনিবেদনের সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটল তার চোখের তারায়।

হোমাগ্নির দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে রইল মার্গারেট। মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণের সময় স্পষ্ট অনুভব কবতে পারছিল যজ্ঞাগ্নিতে সে একে একে আহুতি দিচ্ছে তার পার্থিব

কামনা-বাসনা, চোখের সামনে ছাই হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত অতীত। এমন কি তার প্রবল অহংকেও উৎসর্গ করল। শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরার মত স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকল না মার্গারেটের। গুরুই তার জীবনের সব। তিনিই তার সুখ, তার দুখ, তার জীবন মরণ, তার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব। এক অদ্ভুত আশ্চর্য সুখে আনন্দে তার হৃদয় ভরে যেতে লাগল। মনে হল, পৃথিবী কী সুন্দর, ভালোবাসা কী পবিত্র, এত সৌন্দর্যের বুকের মধ্যিখানে বাস করেও সেই সৌন্দর্যের দাবিদার না হতে পারার মধ্যে সত্যি কোনো দুঃখ নেই। দাবির চেয়ে দাবিহীনতার চৌহদ্দি অনেক বড়, কামনা বাসনায় মলিন হয় না। দিনের আলোর মত নিঃশব্দে নিজেকে শুধু ব্যাপ্ত করে যাওয়া। এই অনুভূতি তার নতুন। এ এক অভিনব ভাবের উত্তরণ তার জীবনে। নবজীবন বরণের শুভলগ্ন এল।

স্বামীজি মার্গারেটের শান্ত, সমাহিত মূর্তির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরম যত্নে তার ললাটে যজ্ঞভস্মের টীকা পরিয়ে দিয়ে বললেন : তোমার নতুন জন্ম হল। তোমার আগের নামও অর্থহীন হয়ে গেল। পুরনো নামকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে নতুন নাম গ্রহণ করতে হয়। এখন থেকে তুমি শুধুই নিবেদিতা। এ দেশ তোমার জননী। এদেশের মানুষের তুমি ভগিনী। এদেশের সনাতনধর্ম তোমার ধর্ম। এদেশের কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই তোমার একমাত্র ব্রত। রামকৃষ্ণের সেবা ধর্ম তোমার আদর্শ, তোমার পাথেয়। আগামী প্রজন্মের কাছে তুমি রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দের নিবেদিতা হয়ে থাকবে।

বিবেকানন্দের কথাগুলো তার কাছে এক নতুন কর্তব্যবোধের মানে বয়ে নিয়ে এল। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি গুরুর পার্থিব শরীর ভেদ করে বাইরের সূর্যালোকিত পৃথিবীর দিকে প্রসারিত হয়ে আম-কাঁঠাল সবুজ গাছ-গাছালির নরম স্নিগ্ধছায়া ভেদ করে পুণ্যতোয়া গঙ্গার স্রেতস্বিনীকে স্পর্শ করে রইল যেন। স্বামীজি ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন। নিবেদিতার অন্তরাজ্যে এক ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে জন্যে সহানুভূতিতে আর্দ্র হলে তো চলবে না। যে পথে তাকে নিয়ে যেতে চান, সে পথে চলার পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস শিষ্যার অন্তরে জাগিয়ে তোলা গুরুর অন্যতম কর্তব্য। তাই নিজের আত্মবিহ্বলতা সংযত করতেই যেন নিজেকে শুনিয়ে বললেন : নিবেদিতা, আমি রামকৃষ্ণের দাস। তাঁর কাজের ভার আমার ওপর অর্পণ করে গেছেন। সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি নেই। তোমারও মুক্তি নেই।

স্বামীজির কী মধুর সেই কণ্ঠস্বর! অদ্ভুত আর আশ্চর্য একটা অনুভূতিতে তার সারা শরীর আচ্ছন্ন হল। ভেতরে কোথায় যেন বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে তার। বড় বড় নীল দুই চোখে তন্ময়তার ঘোর। নিজেকে নিবেদনের সকরুণ ব্যাকুলতায় সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে স্বামীজির পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরকে যেমন প্রণাম করে তেমনি করে বিবেকানন্দের

দুই পায়ের ওপর মাথা রেখে নিশ্চল হয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত এভাবেই কাটল। নিটোল মুক্তাবিন্দুর দুফোঁটা অশ্রু পড়ল গুরুর পায়ে। বাদামী রঙের কোমল রেশমের মত চুল দিয়ে নিবেদিতা পা দুটো মুছিয়ে দিল। তার চেতনার উপর নেমে এল এক বিহ্বলতা।

স্বামীজি তার মাথায় হাত রেখে বললেন : আর সামান্য কাজ বাকি। এবার তুমি বুদ্ধের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন কর। বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব পাঁচশতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। মূর্তিমান মানবকল্যাণের পূজারী ও আর্তের সেবক মহাযোগী বুদ্ধকে প্রণাম কর। তাঁর ব্রত তোমার ব্রত হোক। তাঁর আদর্শ তোমার আদর্শ হোক। তাঁর মত ত্যাগে মহান এবং প্রেমে সুন্দর হও।

নিবেদিতার সমস্ত চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে কী যেন গলে গেল। একটা সুন্দর অপার্থিব অনুভূতি তার সমস্ত মনটাকে বদলে দিল। আগুন যেমন জলকে বদলে বাষ্প করে দেয় তেমনি একটা রূপান্তর সে টের পেল তার নিজের মধ্যে। তার কিছু বলার আগেই স্বামীজি বেলুড়ের অদূরে আঙুল দেখিয়ে বললেন : নিবেদিতা ওইখানে আমি চাই মেয়েদের জন্য একটি মঠ হোক। আর বাগবাজারে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা স্কুল হোক। মেয়েদের স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এই দুটি প্রতিষ্ঠানের আজ বড় প্রয়োজন। আকাশে উড়তে দুটি ডানা লাগে পাখির। ভারতবর্ষে উন্নতির জন্য চাই শিক্ষিত নারী ও পুরুষ দুই-ই। তুমিই পারবে নারীশিক্ষার হাল ধরতে। তোমাকে আমি তার ভার অর্পণ করলাম। আমি জানি তুমি দেবতার মেয়ে। দেবতার ক্ষমতা তোমার আছে। কেবল তুমিই পার মরা গাঙে বান বইয়ে দিতে।

নিবেদিতার সব কথা ফুরিয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তাঁর প্রত্যাশাদীপ্ত দুই চোখের দিকে। কী সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে তাঁর প্রার্থনায়। নিবেদিতা অবাক হয়ে দেখছে শিবের সাজে বিবেকানন্দকে। মনে হচ্ছে ভিখারি শিব ভিক্ষেপাত্র হাতে নিয়ে যেন অন্নপূর্ণার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কাছে কাঙালপনা করতে শিবের কোনো দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই, সম্ভ্রমহানির ভয় নেই। ভিখিরির মত শিব যখন এই সামান্য ভিক্ষে চায় তখন অন্নপূর্ণার 'না' বলতে বুক ভেঙে যায়। সত্যিই যে অন্নপূর্ণার বুক ভেঙে গেছিল তার এক আশ্চর্য অনুভূতি হল নিবেদিতার। সেই সঙ্গে খুব রাগ ও অভিমান হল বিবেকানন্দের ওপর। অবচেতনের গভীর থেকে মন্ত্রোচ্চারণের মত করে গভীর গাঢ় গলায় বলল : সাধ্যের বেশি করব। আন্তরিকতার অভাব হবে না কোনোদিন। আপনার প্রত্যাশাপূরণই হবে আমার গুরুর প্রতি আমার অচলা ভক্তি ও ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। গুরুর ইচ্ছেই নিবেদিতার জপের মন্ত্র। এছাড়া অন্য কোনো মন্ত্র নেই নিবেদিত নিবেদিতার।

কামনা-বাসনা, চোখের সামনে ছাই হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত অতীত। এমন কি তার প্রবল অহংকেও উৎসর্গ করল। শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরার মত স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকল না মার্গারেটের। গুরুই তার জীবনের সব। তিনিই তার সুখ, তার দুখ, তার জীবন মরণ, তার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব। এক অদ্ভুত আশ্চর্য সুখে আনন্দে তার হৃদয় ভরে যেতে লাগল। মনে হল, পৃথিবী কী সুন্দর, ভালোবাসা কী পবিত্র, এত সৌন্দর্যের বুকের মধ্যিখানে বাস করেও সেই সৌন্দর্যের দাবিদার না হতে পারার মধ্যে সত্যি কোনো দুঃখ নেই। দাবির চেয়ে দাবিহীনতার চৌহদ্দি অনেক বড়, কামনা বাসনায় মলিন হয় না। দিনের আলোর মত নিঃশব্দে নিজেকে শুধু ব্যাপ্ত করে যাওয়া। এই অনুভূতি তার নতুন। এ এক অভিনব ভাবের উত্তরণ তার জীবনে। নবজীবন বরণের শুভলগ্ন এল।

স্বামীজি মার্গারেটের শান্ত, সমাহিত মূর্তির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরম যত্নে তার ললাটে যজ্ঞভস্মের টীকা পরিয়ে দিয়ে বললেন : তোমার নতুন জন্ম হল। তোমার আগের নামও অর্থহীন হয়ে গেল। পুরনো নামকে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে নতুন নাম গ্রহণ করতে হয়। এখন থেকে তুমি শুধুই নিবেদিতা। এ দেশ তোমার জননী। এদেশের মানুষের তুমি ভগিনী। এদেশের সনাতনধর্ম তোমার ধর্ম। এদেশের কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই তোমার একমাত্র ব্রত। রামকৃষ্ণের সেবা ধর্ম তোমার আদর্শ, তোমার পাথেয়। আগামী প্রজন্মের কাছে তুমি রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দের নিবেদিতা হয়ে থাকবে।

বিবেকানন্দের কথাগুলো তার কাছে এক নতুন কর্তব্যবোধের মানে বয়ে নিয়ে এল। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি গুরুর পার্থিব শরীর ভেদ করে বাইরের সূর্যালোকিত পৃথিবীর দিকে প্রসারিত হয়ে আম-কাঁঠাল সবুজ গাছ-গাছালির নরম স্নিগ্ধছায়া ভেদ করে পুণ্যতোয়া গঙ্গার স্রেতস্বিনীকে স্পর্শ করে রইল যেন। স্বামীজি ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন। নিবেদিতার অন্তরাজ্যে এক ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে জন্যে সহানুভূতিতে আর্দ্র হলে তো চলবে না। যে পথে তাকে নিয়ে যেতে চান, সে পথে চলার পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস শিষ্যার অন্তরে জাগিয়ে তোলা গুরুর অন্যতম কর্তব্য। তাই নিজের আত্মবিহ্বলতা সংযত করতেই যেন নিজেকে শুনিয়ে বললেন : নিবেদিতা, আমি রামকৃষ্ণের দাস। তাঁর কাজের ভার আমার ওপর অর্পণ করে গেছেন। সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি নেই। তোমারও মুক্তি নেই।

স্বামীজির কী মধুর সেই কণ্ঠস্বর! অদ্ভুত আর আশ্চর্য একটা অনুভূতিতে তার সারা শরীর আচ্ছন্ন হল। ভেতরে কোথায় যেন বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে তার। বড় বড় নীল দুই চোখে তন্ময়তার ঘোর। নিজেকে নিবেদনের সকরুণ ব্যাকুলতায় সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে স্বামীজির পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরকে যেমন প্রণাম করে তেমনি করে বিবেকানন্দের

দুই পায়ের ওপর মাথা রেখে নিশ্চল হয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত এভাবেই কাটল। নিটোল মুক্তাবিন্দুর দুফোঁটা অশ্রু পড়ল গুরুর পায়ে। বাদামী রঙের কোমল রেশমের মত চুল দিয়ে নিবেদিতা পা দুটো মুছিয়ে দিল। তার চেতনার উপর নেমে এল এক বিহ্বলতা।

স্বামীজি তার মাথায় হাত রেখে বললেন : আর সামান্য কাজ বাকি। এবার তুমি বুদ্ধের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন কর। বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বোধিসত্ত্ব পাঁচশতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। মূর্তিমান মানবকল্যাণের পূজারী ও আর্তের সেবক মহাযোগী বুদ্ধকে প্রণাম কর। তাঁর ব্রত তোমার ব্রত হোক। তাঁর আদর্শ তোমার আদর্শ হোক। তাঁর মত ত্যাগে মহান এবং প্রেমে সুন্দর হও।

নিবেদিতার সমস্ত চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে কী যেন গলে গেল। একটা সুন্দর অপার্থিব অনুভূতি তার সমস্ত মনটাকে বদলে দিল। আগুন যেমন জলকে বদলে বাষ্প করে দেয় তেমনি একটা রূপান্তর সে টের পেল তার নিজের মধ্যে। তার কিছু বলার আগেই স্বামীজি বেলুড়ের অদূরে আঙুল দেখিয়ে বললেন : নিবেদিতা ওইখানে আমি চাই মেয়েদের জন্য একটি মঠ হোক। আর বাগবাজারে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটা স্কুল হোক। মেয়েদের স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এই দুটি প্রতিষ্ঠানের আজ বড় প্রয়োজন। আকাশে উড়তে দুটি ডানা লাগে পাখির। ভারতবর্ষে উন্নতির জন্য চাই শিক্ষিত নারী ও পুরুষ দুই-ই। তুমিই পারবে নারীশিক্ষার হাল ধরতে। তোমাকে আমি তার ভার অর্পণ করলাম। আমি জানি তুমি দেবতার মেয়ে। দেবতার ক্ষমতা তোমার আছে। কেবল তুমিই পার মরা গাঙে বান বইয়ে দিতে।

নিবেদিতার সব কথা ফুরিয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তাঁর প্রত্যাশাদীপ্ত দুই চোখের দিকে। কী সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে তাঁর প্রার্থনায়। নিবেদিতা অবাক হয়ে দেখছে শিবের সাজে বিবেকানন্দকে। মনে হচ্ছে ভিখারি শিব ভিক্ষেপাত্র হাতে নিয়ে যেন অন্নপূর্ণার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কাছে কাঙালপনা করতে শিবের কোনো দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই, সম্ভ্রমহানির ভয় নেই। ভিখিরির মত শিব যখন এই সামান্য ভিক্ষে চায় তখন অন্নপূর্ণার 'না' বলতে বুক ভেঙে যায়। সত্যিই যে অন্নপূর্ণার বুক ভেঙে গেছিল তার এক আশ্চর্য অনুভূতি হল নিবেদিতার। সেই সঙ্গে খুব রাগ ও অভিমান হল বিবেকানন্দের ওপর। অবচেতনের গভীব থেকে মন্ত্রোচ্চারণের মত করে গভীর গাঢ় গলায় বলল : সাধ্যের বেশি করব। আন্তরিকতার অভাব হবে না কোনোদিন। আপনার প্রত্যাশাপূরণই হবে আমার গুরুর প্রতি আমার অচলা ভক্তি ও ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। গুরুর ইচ্ছেই নিবেদিতার জপের মন্ত্র। এছাড়া অন্য কোনো মন্ত্র নেই নিবেদিত নিবেদিতার।